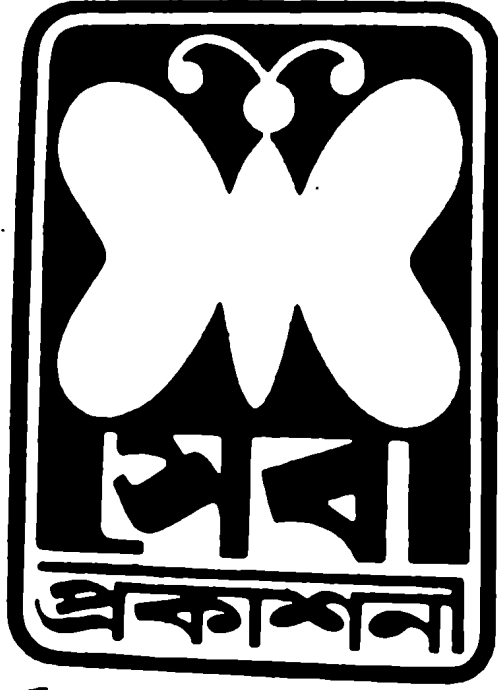


তিক্ত অবকাশ ১

মাসুদ রানা

কাজী
আনোয়ার
হোসেন





তেইশ টাকা

ISBN 984 -16 -7197- 2

প্রকাশক :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৯২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ শরাফত খান

রচনাঃ বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রাকরঃ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

দূরালোপনঃ ৪০৫৩৩২

জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো রুমঃ

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-197

TIKTO ABOKASH

Part-I

By: Qazi Anwar Husain

আসুদ বান্দা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে ।
বিচিত্র তার জীবন । অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি ।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর ।
একা ।

টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না ।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায় ।

পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি ।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই । .

সীমিত গতিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে ।
আপনি আমন্ত্রিত ।
ধন্যবাদ ।

এক

‘জানি জানি,’ হাত তুলে বাধা দিল লা ইটালিয়া ডেল পোপোলোর ক্রাইম রিপোর্টার টনি আমান্দো। ‘অত্যন্ত জরুরী একটা কাজে রোম এসেছ তুমি, হাতে একদম সময় নেই, কাজ সেরেই ছুটতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং এ-মুহূর্তে কয়েকটা ইনফরমেশন চাই তোমার। ইজিন্ট্‌ ইট?’

মুচকে হেসে এপাশ ওপাশ মাথা দোলাল মাসুদ রানা। ‘ইল না। শুধুই দেখা করতে এসেছি তোমার সাথে এবং হাতে সময়ের অভাব নেই।’

‘চাপা মের না,’ ধমকে উঠে কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল ব্যস্ত সাংবাদিক। ‘তোমার ওই চালবাজি মার্কো হাসির অর্থ আমি বুঝি না ভেবেছ? আরে, আমি মানুষ চরিয়ে খাই। তা-ও আবার যেন-তেন মানুষ নয়, ক্রিমিন্যাল, অ্যাণ্ড ইটালিয়ান্স্‌। মাইও ইট,’ চোখ পাকাল সে। কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিল। যেন রানাকে কথার অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবন করার জন্যে এই সময়টুকু না দিলেই নয়। তারপর আবার মুখ খুলল, ‘অতএব, বাজে প্যাচালে কাজ নেই। এবার বলে ফেল, কার পিছনে লেগেছ, কোন ব্যাপারে তথ্য চাই। মাফিয়া নিশ্চয়?’

‘বললাম তো, সত্যিই ছুটিতে আছি।’

একজন অ্যাটেনডেন্টকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। তার উদ্দেশ্যে দুটো আঙুল তুলল টনি আমান্দো। ‘কফি, প্লীজ,’ আবার রানার দিকে চেয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। ‘খাঁটি কথা?’ সংশয় কাটছে না তার।

‘খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি,’ বলল রানা।

‘কদিনের ছুটি?’

‘এক মাসের।’

‘বল কি? এক মাসের ছুটি! মাসুদ রানার!’ সত্যি সত্যি চোখ কপালে উঠল টনি আমান্দোর।

‘কেন, এর মধ্যেও ক্রাইমের গন্ধ পাচ্ছ না কি?’

‘না। তবে অবাস্তব মনে হচ্ছে,’ পরক্ষণেই প্রসঙ্গ পাল্টাল সে, ‘এখানেই থাকবে তো এই একমাস?’

‘উঁহুঁ। পনের দিনের মত ছুটি অলরেডি গন। বাকি ক’দিন থাকব।’

সত্যিই ছুটিতে ছিল মাসুদ রানা, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের কিংসটনে, জ্যামাইকার রাজধানীতে। বার্লিনে গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাসাইনমেন্ট সাফল্যের সাথে শেষ করামাত্র খুশি হয়ে পুরো এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করে তারবার্তা পাঠায় বুড়ো। অমনি দে ছুট। সঙ্গে লালচুলো এক জার্মান সুন্দরী জুটিয়ে নিয়েছিল ভজিয়ে ভাজিয়ে।

কিংসটন শেরাটনের কার রেন্টাল সার্ভিসের ভাড়া গাড়িতে করে যতটা সম্ভব চেষ্টা বেড়িয়েছে ওরা ক্যারিবিয়ান সাগর ও থ্রেটার অ্যানটিলিস ঘেরা খুদে দ্বীপদেশটি। দেখতে দেখতে

ফুরিয়ে গেল দুটি সপ্তাহ। ওখানে রানা এজেন্সির শাখা খোলার সম্ভাবনার ব্যাপারে সিরিয়াসলি চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছিল রানা, এই সময় ঢাকা থেকে জরুরী বার্তা আসে। অনতিবিলম্বে রোমে রিপোর্ট করতে বলা হয় ওকে।

আজই দুপুরের পর রোম পৌঁছেছে রানা হতুদন্ত হয়ে। এসে দেখে ফক্কা। আরেকটা মেসেজ অপেক্ষা করছে এখানে। তাতে বলা হয়েছে, যে-জন্যে রোম আসতে বলা হয়েছে, সে-কাজ বিশেষ কারণে স্থগিত রাখা হয়েছে। রানাকে ছুটি রিজিউম করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে তাতে।

ভেবেচিন্তে বাকি দিনগুলো এখানেই কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। এসে যখন পড়েইছে, এই সুযোগে এখানকার রানা এজেন্সির কাজকর্ম নিয়ে মোনিকা আলবিনোর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা সেরে নেয়া যাবে। সেই সাথে টনি আমান্দো, নিউ ইয়র্কের অত্যন্ত প্রভাবশালী দৈনিক, নিউ ইয়র্ক ভিশনের রোম ব্যুরো চীফ পিটার লারসেনসহ অন্যান্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ ফুটিও করা যাবে।

বহু বছর ধরেই ওর একে অপরের পরিচিত। বিপদে-আপদে এদের প্রত্যেকেই রানার সাহায্য পেয়েছে। তেমনি রানাও প্রয়োজনের সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে এদের কাছ থেকে, বিশেষ করে কুখ্যাত মাফিয়া-চক্র সম্পর্কে। ওদের ব্যাপারে বিশেষ করে টনি এবং লারসেন যত খবর রাখে, ইটালিয়ান হোম মিনিষ্ট্রিও সম্ভবত তত রাখে না।

টনি আমান্দো রানার থেকে এক ইঞ্চিমত লম্বা। মেদহীন, চওড়া হাড়ের মানুষ। ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মত লাগে দেখতে।

চেহারা অনেকটা পাওলো রসির মত ।

কফি রেখে গেল অ্যাটেনডেন্ট । যার যার কাপে চুমুক দিল দু'বন্ধু । 'সত্যি থাকবে তো?' এখনও যেন বিশ্বাস করতে বাধছে টনির ।

উত্তর না দিয়ে একের পর এক চুমুক দিয়ে চলল রানা ।

'লারসেন জানে তোমার কথা?'

'না । তোমার এখানেই প্রথম এলাম ।'

'দাঁড়াও, খবরটা জানাই ব্যাটাকে,' থাবা দিয়ে টেলিফোনটা কাছে টেনে আনল টনি আমান্দো । পরমুহূর্তে থেমে গেল কি মনে করে । 'ওহ্-হো! বাইরে কোথায় যেন যাওয়ার কথা ওর আজ । ফিরতে অনেক রাত হবে ।'

'বাইরে কোথায়?' কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল রানা । প্যাকেটটা এগিয়ে দিল টনির দিকে ।

'ঠিক জানি না, জিজ্ঞেস করিনি ।' সিগারেট ধরাল সে-ও । হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'ঘুট্টা বেজে গেছে । একটু বস, হাতের কাজটা শেষ করেই বেরুব ।'

বিখ্যাত আলফ্রেডো'স-এ ডিনার সারল ওরা । তারপর এখানে ওখানে আরও কয়েকজন বন্ধুর আস্তানায় হানা দিল । এগারটার দিকে রোমের অভিজাত আবাসিক এলাকা সান ক্যাপরিয়ানায় রানার ভাড়া করা বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে গেল ওকে টনি আমান্দো । ছোট একটা টিলার ওপর বাংলোটা । রানা রোম আসছে খবর পেয়েই ওটা এক মাসের জন্যে ভাড়া নিয়েছে মোনিকা ।

এমনিতে রোম এলে অন্যান্য জায়গার মত সব সময় এজেন্সির

ওপরতলায় নিজের বেডরুমেই থাকে রানা। কিন্তু এবারের আগমনটা একটু অসময়ে হয়ে গেছে। রোমে এজেন্সির কার্যক্রম দিনে দিনে বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে অপারেটরদের সংখ্যাও। ছোট জায়গায় স্থান সংকুলান সম্ভব হচ্ছে না এখন আর, তাই নতুন জায়গায় উঠে যাচ্ছে অফিস। শিফটিং শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই। ভীষণ এলোমেলো অবস্থা, যে-জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা এবার।

পরদিন খুব ভোরে টেলিফোনের মৃদু কির-কির কির-কির আওয়াজে ঘুম ভাঙল রানার। রিসিভার তুলতেই পিটার লারসেনের দরাজ গলা শোনা গেল। ‘ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন, রানা। জানিসনে, আমাদের বাইবেলে আছে, যে বিপদে অন্যের সাহায্য করে, তার বিপদে প্রভু যীশুও তাকে সাহায্য করেন। তুই এসেছিস, টনির মুখে শোনামাত্র অর্ধেক বিপদ কেটে গেছে আমার। রাকিটুকু গেছে তুই ফ্রি আছিস শুনে।’

‘ব্যাপার কি রে!’ একটা হাই তুলল রানা, ‘খালি পেটে বোতল টানা শুরু করলি কবে থেকে?’

‘সত্যি বলছি, দোস্তু। নিউ টেস্টামেন্টের সেই গল্পে প্রভু যীশু স্পষ্ট...’

উঠে বসল রানা। ‘কোন গল্পে?’

‘দূর ব্যাটা! অতকিছু জানলে তো তোদের... কি বলে, হাফেজ হয়ে যেতাম। সে যাক। দোস্তু, খুব বিপদে আছি। এবার যদি আর একটু ফিজিক্যাল সাহায্য না করিস, তোর বোনের সাথে আমার বিয়েটা আর কোনদিনই হবে না।’

‘ফের ফালতু কথা?’ কি এক তাড়নায় ছট ফট করছে রানা।

দু'পা নামিয়ে দিয়েছে বিছানা থেকে ।

‘যীশুর কিরে, রানা, ফালতু নয় । তোর সাহায্য পেলে আজই আইবুড়ো নামটা ঘোচাতে পারি ।’

প্রচণ্ড এক দাবড়ি লাগাল রানা । ‘আসল কথা বলবি, না রেখে দেব ফোন?’

‘রাখ । তবে বেরিয়ে পড়িসনে যেন এখনই । আমি আসছি আধ ঘন্টার মধ্যে ।’

রিসিভার ছুঁড়ে ফেলে তড়াক করে বিছানা ছাড়ল রানা, তীরবেগে ছুটল বাথরুমের দিকে । তলপেটের চাপ অসহ্য হয়ে উঠেছে, আরেকটু হলে ভিজিয়েই ফেলত কাপড় । প্রায় বিশ মিনিট পর বেরুল ও একেবারে শাওয়ার শেড সেরে ।

কিচেনে এসে বৈদ্যুতিক কেটলিতে কফির পানি চড়িয়ে টোস্টারে মোটা-মোটা চার স্লাইস পাউরুটি ঢোকাল । টিপে দিল টোস্টারের অটো সুইচ । এরপর এক হালি ডিম দিয়ে তৈরি করল প্রকাণ্ড এক ওমলেট । ওটা টেবিলে এনে সাজাতে না সাজাতেই ‘কোক’ ‘কোক’ ডাক ছাড়ল টোস্টার, পরমুহূর্তে ইজেক্টরের ধাক্কায় একসাথে লাফ দিল স্লাইসগুলো ।

মচমচে স্লাইস চারটে বের করে আরও চারটে ঢোকাল রানা । সুইচ অন করে দিয়ে খেতে বসে গেল । পেটপুরে নাশতা সেরে প্রকাণ্ড এক ঢেকুর তুলল ও । কফির কাপে দুটো চুমুক দিয়ে দিনের প্রথম সিগারেটটা ধরাল । সবে আটটা বাজে তখন ।

আরও পনের মিনিট পর বাইরে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সামনের চওড়া বারান্দায় বেরিয়ে এল সুটেড-বুটেড মাসুদ রানা । লারসেনের কুচকুচে কালো বুইকটা গেট পেয়িয়ে সাঁ করে ছুটে

এসে থেমে দাঁড়াল সামনে । লারসেনের পাশে এক সুন্দরীকে বসা দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা ।

আগে কোথাও দেখেছে ও মেয়েটিকে । কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে পড়ছে না এ মুহূর্তে । দু'জনেই নেমে এল ওরা গাড়ি থেকে । ঝাড়া ছ'ফুট চার ইঞ্চি লম্বা পিটার লারসেন । তেমনি বিশালদেহী । সেই তুলনায় মেয়েটি বেশ খাটো, পাঁচ ফুট ছয় কি সাত বড়জোর । লারসেনের গাড়ির মতই দুর্লভ কালো চুল মেয়েটির । চোখের মণির রঙ হালকা খয়েরি ।

‘হাবার মত চেয়ে আছিস যে বড়?’ বলল লারসেন । ‘নিজের বোনকেও চিনতে পারছিসনে?’ মেয়েটির কনুই জড়িয়ে ধরে বারান্দায় উঠে এল সে । ‘আরে, এ প্রিসিলা । প্রিসিলা ওয়াটসন । তোর মোনিকার...’

‘হ্যালো, হ্যালো! সরি,’ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল রানা । ‘অনেকদিন পর দেখলাম তোমাকে । চিনতে পারছিলাম না । কেমন আছ, প্রিসিলা?’

‘জ্বি, ভাল । আপনি কেমন আছেন?’

মোনিকার বান্ধবী প্রিসিলা ওয়াটসন । অনেক আগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সে ওদের । প্রিসিলা আমেরিকান । দু'পুরুষ ধরে রোমে সেটল্ড্ । একটি ইংরেজি সিনে ম্যাগাজিনের স্টাফ রিপোর্টার সে ।

ওদের ভেতরে এনে বসাল মাসুদ রানা । ‘বল, কি খাবি ।’

‘কিছু না, দোস্তু ।’ লারসেনকে বেশ অস্থির অস্থির লাগছে ।

পালা করে ওদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল ও ।

‘রানা, তোর সাহায্য প্রয়োজন আমাদের, দোস্তু । বড্ডো

বিপদে পড়ে গেছি।’

‘আর কত বিপদ-বিপদ করবি? কি হয়েছে বলে ফেল।’

পাশে বসা প্রিসিলার দিকে তাকাল লারসেন। ‘তুমি বল,’ চাপা গলায় বলল সে।

মাথা দোলাল মেয়েটি। ‘তুমিই বল।’

খানিক ইতস্তত করল লারসেন। কি ভাবে কথাটা পাড়বে ও ছিয়ে নিয়ে ফিরল রানার দিকে। ‘দোস্ত, আমি...আমরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি,’ বলেই চট করে প্রিসিলার কাঁধ বেঁটন করে ধরল, যেন এখনই ঝেড়ে দৌড় দিতে যাচ্ছে সে।

‘কংগ্রাচুলেশনস! কিন্তু বিপদটা কোথায়?’

‘বিপদটা ঘটিয়েছে ওর চাকরি, মাসুদ ভাই,’ মুখ ভার করে বলল প্রিসিলা ওয়াটসন।

‘কিরকম?’

‘আর বলিসনে।’ চেহারা করুণ হয়ে উঠল লারসেনের। ‘হেড অফিসে এক মাসের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করেছিলাম। কিন্তু ওরা জানিয়ে দিয়েছে এখন ছুটি দেয়া সম্ভব নয়। আমার রিলিভার হিসেবে কাউকে পাঠাতে পারবে না ওরা আগামী এক মাসের মধ্যে।’

‘তারপর?’

‘মুশকিল হয়েছে, আমি শিওর ছিলাম যে ছুটি পাব। সেই ভরসায় প্রিসিলাকেও ছুটি নিতে বলেছিলাম। ভেনিসে এখন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলছে, এ ধরনের অনুষ্ঠান ও-ই সব সময় কাভার করে। তবুও, এর মধ্যেও ছুটি আদায় করে নিয়েছে ও, কিন্তু আমি আটকে গেছি। এ নিয়ে হেড অফিসকে চাপাচাপিও করতে পারছি

না। গত কয়েক মাস ধরে আমার প্রমোশন ঝুলে আছে। হেড অফিসে ফরেন ডেস্কের ডেপুটি চীফের পোস্ট ওটা, এর চেয়ে অনেক-অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ। চাপ দিলে খেপে যাবেন বস। জানিসই তো, ভীষণ রাগি মানুষ। ওটাও পারছি না, আবার এদিকে প্রিসিলার ছুটিও অনর্থক বসে বসে নষ্ট হচ্ছে। এর ভেতর যদি বিয়ে করা সম্ভব না হয়, তাহলে এ বছর আর হবে না। চাইলে অবশ্য আজই বিয়ে করা যায়। কিন্তু তুই-ই বল, বিয়ে করব অথচ হানিমুন করতে পারব না, এটা কোন বিয়ে হল? তাছাড়া প্রিসিলারও মত নেই তাতে।’

‘আই সী।’

‘তুই ছুটিতে আছিস শুনে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। এখন তুই-ই পারিস এ ব্যাপারে আমাদের হেল্প করতে।’

‘কিভাবে?’

‘একটা সপ্তা আমার হয়ে একটু প্রক্সি দিবি শুধু। তাহলেই চলবে।’

‘মানে?’

‘আমার অফিসটা চালিয়ে নিবি এই ক’টা দিন। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা তোর আছে, কাজেই কোন অসুবিধে হবে না। অবশ্য তেমন কিছু তোকে করতেও হবে না, আমার পি.এ. লিজা ড্যালেষ্ট্রি-ই সব সামলে নিতে পারবে। শুধু আমার ডেস্কে বসবি তুই।’

‘সেরেছে! তা কি করে সম্ভব?’

‘অসম্ভবটা কোথায়?’

‘না, মানে, তোর হেড অফিস থেকে যদি কেউ এসে পড়ে

হঠাৎ করে? বা... আর কোন...'

'কেউ আসার প্রশ্নই আসে না। সে সব জেনেবুঝেই ঝুঁকিটা নিচ্ছি আমি, বোকচন্দর। তেমন কিছু ঘটলে ক্ষতিটা আমারই হবে, তোর কিছু হবে না। এখন বল সাহায্য করবি কি না। মাত্র সাতদিনের ব্যাপার।'

ওদের দু'জোড়া চোখ আঠার মত সঁটে আছে রানার মুখের ওপর। 'আমি আমার কথা ভাবছি না,' বলল ও। 'আমি ফ্রি আছি, তোদের উপকারে লাগতে পারলে বরং খুশিই হব। কিন্তু...'

'বললাম তো, চিন্তার কিছু নেই। ঠিক আছে, আয়, ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু আলোচনা করা যাক, তাহলে বুঝতে পারবি কাজটা কত সহজ,' বলে প্রিসিলার দিকে ফিরল লারসেন। 'ডার্লিং, দু' কাপ কফি খাওয়াবে আমাদের, প্লীজ?'

দু' কাপ নয়, চার কাপ কফি ধ্বংস করল রানা আর লারসেন। আধঘন্টা ধরে নিচু গলায় আলোচনা করল দু'বন্ধু। অবশেষে সন্তুষ্ট মনে হল রানাকে। 'বেশ, ঠিক আছে,' বলল ও। 'কিন্তু বেশি দেরি করিসনে যেন।'

'আরে না। নে, চল আমার অফিসে। সব বুঝিয়ে দেব তোকে।'

দুপুরের আগেই লারসেন-প্রিসিলার বিয়ে সুসম্পন্ন হল গির্জায়। এরপর দেড়টার রোম-ভেনিস ফ্লাইটে চড়ে উড়াল দিল হানিমুন-কাপল। আটকা পড়ল রানা।

দুই

পিটার লারসেনের চেয়ারে বসে আছে মাসুদ রানা গালে হাত দিয়ে। আনমনা। চেহারায় বেশ দুঃখ দুঃখ একটা ভাব। সাংবাদিকতার দ্বিতীয় দিন চলছে আজ ওর। বন্ধ দরজার ওপাশে মৃদু ট্যাপ ট্যাপ আওয়াজ উঠছে—সামনের রুমে কিছুর একটা টাইপ করছে লারসেনের সুন্দরী পি.এ, লিজা ভ্যালেরি।

বাইরে প্রচণ্ড গরম। মাথার ওপর গনগনে অগ্নিকুণ্ডের মত জ্বলছে সূর্য। রোমবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। এখানে অবশ্য তার বিন্দুমাত্র আভাসও নেই। বিশ তলা রোক্কো ফাউণ্ডেশনের ষোল তলায় নিউ ইয়র্ক ভিশনের রোম ব্যুরো অফিস—ছোট হলেও সেন্ট্রালি এয়ার-কন্ডিশন। জানালার টিনটেড গ্লাসের ভেতর দিয়ে অনেক দূরের টিরেনিয়ান সী পরিষ্কার দেখা যায়।

রানার নজর অবশ্য অন্যদিকে, ও চেয়ে আছে ঐতিহাসিক কলোসিয়ামের দিকে। গরম যতই পড়ুক, দেশী-বিদেশী পর্যটকদের তাতে খুব একটা আসে যায় না। অদ্ভুত দর্শন কলোসিয়ামের চারদিকে গিজ গিজ করছে প্রচুর পর্যটক। ঘুরে ফিরে দেখছে। তার দিকে পিছন ফিরে ছবি তুলছে, তারপর একসময় ফিরে যাচ্ছে সজুট মনে।

যারা শুধু দেখতেই আসে, তাদের অনেকেরই জানা নেই কত অসংখ্য রাজবন্দী, যুদ্ধবন্দী, ক্রীতদাস আর মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অসহায় আদম সন্তানের রক্তে সিক্ত ওর ভেতরের মাটি, প্রতিটি ধূলিকণা। একশো ষাট ফুট উঁচু চারতলা এই ইমারতটির প্রতিটি ইট কাঠ পাথরে মিশে আছে তাদের অন্তিম নিঃশ্বাস। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেই বীভৎস, জঘন্যতম প্রাণ সংহারী দ্বৈত-যুদ্ধের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে এই কলোসিয়াম।

রক্ত-পিপাসু খেয়ালী রোম সম্রাটদের বিকৃত আনন্দের খোরাক যোগাতে গিয়ে কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এই বধ্যভূমিতে, ইতিহাস তার সঠিক হিসেব রাখে না। শুধু মানুষই নয়, অজস্র বন্য জীব-জন্তুও আছে সেই সাথে। সম্রাটদের নির্দেশে রাজকোষের অর্থে সে সময় এক ‘বিশেষ খেলা’র জন্যে উত্তর আফ্রিকা থেকে আমদানি করা হত হাতি, নিউবিয়া থেকে গণ্ডার এবং ইরাক থেকে সিংহ—শ’য়ে শ’য়ে, হাজারে হাজারে।

৭২ খ্রিস্টাব্দে এটির নির্মাণ কাজে হাত দেন ফ্লেভিয়াস বংশের সম্রাট, ভেসপাজিয়ান। মূলত জনসভা করার জন্যেই ইমারতটি তৈরি করিয়েছিলেন তিনি—এর নাম রেখেছিলেন এমফি-থিয়েটারাম ফ্লেভিয়াম। সাত বছরে তিনতলা পর্যন্ত নির্মাণ করে আকস্মিকভাবে মারা যান ভেসপাজিয়ান।

এরপর ক্ষমতায় বসেন তাঁর পুত্র, টাইটাস। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সম্রাটদের একজন ছিলেন টাইটাস। এমফিথিয়েটারের বাকি কাজ সম্পন্ন করেন তিনি। নাম পাল্টে নতুন নাম রাখেন কলোসিয়াম। এবং জনসভাস্থলটিকে ‘বিশেষ খেলার স্থান’ হিসেবে ঘোষণা করেন। একদিন খুব জাঁকজমকের সঙ্গে শুরু হয় ‘বিশেষ খেলা’।

জীব-জন্তুর লড়াই। ভল্লকের সাথে হাতি, হাতির সাথে বুনো মোষ বা গণ্ডারের সাথে হাতির লড়াই। দেশের বিশিষ্ট নাগরিক সিনেটর নাইট সেনা অফিসার এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে সে-খেলা উপভোগ করতেন টাইটাস। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন তিনি এই একঘেঁয়ে খেলা দেখতে দেখতে। ব্যাপারটা হঠাৎ করেই সাদামাঠা হয়ে ওঠে।

এ সময় একদিন নতুন এক আইডিয়া আসে টাইটাসের মাথায়। লড়াইটা মানুষে মানুষে হলে কেমন হয়? ভাবলেন তিনি, ডুয়েল? বুদ্ধি আছে মানুষের মাথায়, রণকৌশল জানে তারা। পশুদের মত শুধুই লড়াই হবে না সেটা, আরও কিছু থাকবে তাতে।

সেই থেকে শুরু। পশুর খেলা বন্ধ হয়ে গেল, শুরু হল মানুষের খেলা। কয়েকদিন পর পর নিয়মিতভাবে চলতে লাগল এ-খেলা। রাজবন্দী যুদ্ধবন্দীদের মরণপণ লড়াই। যতক্ষণ না কোন একজনের মৃত্যু হত, ততক্ষণ পর্যন্ত চলত দ্বৈত-লড়াই। কিন্তু 'মাত্র' একশোটি খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল টাইটাসের। এরপর একদিন হঠাৎ করেই বন্ধ উন্মাদ হয়ে যান তিনি—বন্ধ হয়ে যায় খেলা।

লম্বা বিরতির পর আবার শুরু হয় তা ২৬৪ খ্রিস্টাব্দে। ক্রুটাস ভ্রাতৃত্ব চালু করেন এই 'ঐতিহ্যবাহী' খেলাটি। এঁরা চালু করেন 'গ্ল্যাডিয়াস' (খাটো তরবারি)-এর লড়াই। লড়িয়েদের বলা হত গ্ল্যাডিয়েটর। লড়াই চলাকালে কোন গ্ল্যাডিয়েটর আহত হয়ে পড়ে গেলে উল্লাসে ফেটে পড়ত কলোসিয়াম।

সে সময় মৃত্যু ভয়ে ভীত, ক্ষত-বিক্ষত গ্ল্যাডিয়েটর রেওয়াজ
২-ভিত্তি অবকাশ-১

অনুযায়ী বাঁ হাত তুলে সম্রাটের করুণা প্রার্থনা করত, প্রাণ ভিক্ষা চাইত। মঞ্জুর করা না করা সম্পূর্ণ তাঁর মন-মেজাজের ওপর নির্ভর করত। সম্রাটের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আকাশ নির্দেশ করলে অপর গ্যাডিয়েটর বুঝে নিত—তিনি বলছেন, ‘মিটি!’ অর্থাৎ ছেড়ে দাও। আর ভূমি নির্দেশ করার অর্থ, ‘জুগুলা!’—শেষ করে দাও।

জুলিয়াস সীজার এখানে তিনশো গ্যাডিয়েটরের লড়াই উপভোগ করেন। আর সম্রাট ট্রাজান উপভোগ করেন পাঁচ হাজার দ্বৈত-যুদ্ধ। অনেক ঐতিহাসিকের মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্টালিনগ্রাদে যত রক্ত ঝরেছে, তারচেয়ে অনেক বেশি রক্ত ঝরেছে রোমের এই এক চিলতে মাটিতে।

কোথায় যেন পড়েছে রানা, বহু বছর আগে খ্রিষ্টানদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়েছিল এখানে। ভ্যাটিকানের চোদ্দতম পোপ, গ্রেগরি উপস্থিত ছিলেন তাতে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে কলোসিয়ামের এক মুঠো করে মাটি উপহার দিতে চেয়েছিলেন গ্রেগরি, কিন্তু কেউ-ই তা নিতে রাজি হননি।

কারণ জানতে চাইলে একজন রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেন, ‘মহামান্য পোপ, এখনও ও-মাটিতে রক্ত লেগে আছে।’

বলেই এক মুঠো মাটি হাতে তুলে নিয়ে জোরে চাপ দিয়ে দেখালেন তিনি। দেখা গেল, তাঁর আঙুলের ফাঁক গলে টপ টপ করে তাজা রক্ত ঝরে পড়ছে।

গাঁজা, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ভেতর যে করুণ অতীত লুকিয়ে রয়েছে, তা বেশ ভালভাবেই ফুটে উঠেছে এই বানোয়াট কাহিনীর মধ্যে দিয়ে।

টেলিফোন বেলের আবছা আওয়াজ কানে এল রানার। বন্ধ দরজার ওপাশে লিজার টেলিফোন বাজছে। টাইপের শব্দ থেমে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর ঝন ঝন করে বেজে উঠল রানার সামনের ফোনটা। দু'বার রিঙ হতে রিসিভার তুলল ও। 'ইয়েস?'

'তোমার ফোন,' বলল লিজা ভ্যালেট্রি। 'আই মীন, লারসেনের ফোন। মিস্টার ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান কথা বলবেন।'

'হোয়াট!' চেয়ার উল্টে পড়ার দশা হল রানার। 'কে?'

খিক খিক করে হেসে উঠল মেয়েটি। দারুণ মজা পাচ্ছে যেন। 'ঠিক, ভুল শোনোনি। ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। নিউ ইয়র্ক ভিশনের মালিক।'

সত্যি সত্যি উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠল মাসুদ রানা। বলল, 'কি সর্বনাশ! আমার গলার স্বর চিনে ফেললেই তো বারটা বাজবে লারসেন শালার।'

'সে ভয় নেই। আগে কোনদিন টেলিফোনে লারসেনের সঙ্গে কথা হয়নি ভদ্রলোকের।'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন ওর। 'শিওর?'

'সীট টাইট, লাইন দিলাম।'

ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান সম্পর্কে আগে থেকেই অল্প অল্প জানা আছে রানার। ভদ্রলোক নিউ ইয়র্কের সংবাদপত্র জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। যদিও নিজ পত্রিকার সাংবাদিক-কর্মচারীদের কাছে রগচটা একনায়ক হিসেবে পরিচিত। যমের মত ভয় করে সবাই। মালটি মিলিওনেয়ার। পত্রিকা জগতে তো বটেই, সরকারী মহলেও ভীষণ প্রভাব ংর।

খুট খাট আওয়াজ উঠল লাইনে। পরক্ষণেই একটা শীতল, পুরস্কারী নারীকণ্ঠ শোনা গেল। ‘মিস্টার লারসেন?’

‘স্পীকিং,’ যথাসম্ভব গম্ভীরস্বরে বলল রানা আমেরিকান উচ্চারণে।

‘উইল ইউ হোল্ড অন ফর মিস্টার শেরম্যান, প্লীজ?’

‘ইয়েস, আই উইল।’ মনে মনে হাসল ও। যদি বলত, না, সম্ভব নয়, কেমন হত?

আবার নানারকম শব্দ শোনা গেল। কয়েক মুহূর্ত বিরতি। তারপর যেন কামারের হাতুড়ির বাড়ি পড়ল ওর কানের পর্দায়। ‘লারসেন?’

‘ইয়েস, মিস্টার শেরম্যান।’ কোন ব্যাপারে লারসেনের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন ভদ্রলোক, অন্তত গলা শুনে রানার তাই মনে হল। নইলে চার বছর ধরে নিউ ইয়র্ক ভিশনের রোম ব্যুরো চীফ হিসেবে আছে সে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আজই কি এমন দরকার পড়ল তাঁর ফোন করার?

‘শোন, লারসেন,’ বললেন শেরম্যান। আগের থেকে কিছুটা নরম শোনাল গলা। ‘কালকের ডিরেক্ট নিউ ইয়র্ক-রোম আলইটালিয়ার ফ্লাইটে রোম যাচ্ছে আমার মেয়ে। সোফিয়া শেরম্যান। অ্যারাইভেল ইলেভেন ফিফটিন, সকালে। আমি চাই ওকে রিসিভ করবে তুমি। তুলে দেবে একসেলশিয়র হোটেলে। ঠিক আছে? কোন আপত্তি নেই তো তোমার?’

ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন চারবার, লারসেনের কাছে শুনেছে ও। কিন্তু ছেলেমেয়ে আছে কি না জানত না। রানা উত্তর দেবার আগেই আবার বলতে শুরু করলেন তিনি। এমনভাবে বলছেন

যেন কথা বলায় অরুচি আছে তাঁর। বক্তব্যটা কোন রকমে শেষ করতে পারলে বেঁচে যান।

‘ওখানকার আর্কিটেকচারাল ভার্টিটিতে পড়তে যাচ্ছে ও। কিছু প্রয়োজন হলে সোফিয়াকে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে বলে দিয়েছি আমি। বাট, বি কেয়ারফুল, ওকে কোন টাকা-পয়সা দেবে না তুমি। ব্যাপারটা মোস্ট ইম্পরটেন্ট, খেয়াল রেখ। প্রতি সপ্তায় সোফিয়াকে আটশো ডলার করে দেই আমি। ওর জন্যে ওই টাকাই যথেষ্ট। তবে বিশেষ কোন ঠেকায় যদি পড়ে সে কথা আলাদা। সে ক্ষেত্রে টাকা দেবার আগে অবশ্যই আমাকে জানানবে তুমি। অল রাইট?’

ওরে লারসেনের বাচ্চা, ওরে শুয়োর, ওরে হাড়ে হারামজাদা, মনে মনে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের বেগে বিরতিহীন গাল পাড়ছে মাসুদ রানা। কপালে এই ছিল শেষ পর্যন্ত! তোর বসের মেয়ের খবরদারি...

‘লারসেন?’

‘ই-ইয়েস, মিস্টার শেরম্যান। আমি শুনছি। এখানে সোফিয়ার পরিচিত আর কেউ নেই?’

‘আছে। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি আমার নিজের লোক, তাই ওর ওপর একটু বিশেষ নজর রাখতে বলছি। কিছু মাইও করছ না তো?’

করছি না মানে? রিসিভারের দিকে কটমট করে তাকাল রানা।
‘না না, এতে মনে করার কি আছে? আপনি ভাববেন না। আমি দেখব এদিকে।’

‘খ্যাঙ্ক ইউ।’ একটু বিরতি দিয়ে জানতে চাইলেন শেরম্যান,
ভিক্ত অবকাশ-১

‘তোমার ওদিকে সব ঠিকঠাক তো?’

‘হ্যাঁ। মোটামুটি।’

আরেকটু বিরতি। ‘আর কদিন কষ্ট করে চালিয়ে নাও, তারপর তোমার ছুটির ব্যাপারটা দেখব আমি। তোমার বদলির ব্যাপারটাও মনে আছে আমার। ভেব না।-হয়ে যাবে।’

‘থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। আই উড লাইক দ্যাট ভেরি মাচ্।’

‘গুড বাই।’

‘ক্লিক’ করে কেটে গেল লাইন। খানিকক্ষণ বেকুবের মত রিসিভারটার দিকে চেয়ে থাকল রানা, তারপর আলতো করে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে। পয়সাওয়ালা এক মার্কিনীর যুবতী মেয়ের ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে ওকে, ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছে না এখনও। আর কি কি করতে হবে সেই সাথে?

পরক্ষণেই বুঝল রানা, কাল সকালেই সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে। টেলিফোনে না হয় ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানকে ফাঁকি দেয়া গেছে, কিন্তু তাঁর মেয়েকে কি করে ফাঁকি দেবে ও? মেয়ে যখন জানবে লারসেন নেই রোমে, তার চেয়ারে বসে আছে অন্য একজন কেউ, তখন? ব্যাপারটাকে নিশ্চয়ই হালকাভাবে নেবে না সোফিয়া শেরম্যান। কি করবে সে? জানিয়ে দেবে বাপকে? না কি বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনুরোধ করলে চেপে যাবে? আপনমনে মাথা দোলাল রানা, মনে হয় না।

দ্রুত চেয়ার ছাড়ল ও। লম্বা পায়ে সামনের রুমে চলে এল। টাইপ থামিয়ে বব্ চুল দুলিয়ে ঘুরে তাকাল লিজা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। চমৎকার হাসিখুশি মেয়ে লিজা ভ্যালেটি। চোখা চেহারা, তেমনি ফিগার। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয়। হাসলে টোল পড়ে দু’গালে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে আপন করে নেয়ার গুণ আছে মেয়েটির।

‘গেছে তোমার বসের চাকরি,’ খেঁকিয়ে উঠল রানা।

‘মানে?’ চোখ বড় বড় হয়ে গেল লিজার।

‘কাল আসছে!’ চোখ পাকাল ও, ‘সকালের নিউ ইয়র্ক-রোম সরাসরি ফ্লাইটে। হানিমুন ছুটে যাবে শালার।’

‘শেরম্যান?’ আঁতকে উঠল মেয়েটি।

‘উঁহঁ!’

‘তো?’

‘মেয়ে। সোফিয়া শেরম্যান।’

‘মেয়ে? তাই বল!’ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে।

‘তুমি খুব খুশি হয়েছে মনে হচ্ছে?’

‘হব না? বসের মেয়ে আসছে! ভালই তো,’ হাসল লিজা।
‘বিরাট বড়লোকের মেয়ে। লেগে দেখ না কিছু সুবিধে করতে পার কি না।’

‘একেই বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি!’

‘মানে?’

‘বড়লোকের মেয়ে হয়েছে বলে কি চোখ নেই তার কপালে?
লারসেনের বদলে যখন আমাকে দেখবে, তখন কি হবে ভেবে
দেখেছ?’

‘কি হবে?’ ভুরু নাচাল লিজা।

‘বা-রে মেয়ে! ওর বদলে আমাকে দেখেও চুপ থাকবে সে?
বাপকে খবরটা জানাবে না ভেবেছ?’

‘অ! এই কথা? কিন্তু সে জন্যে তাকে তো আগে লারসেনকে
তিক্ত অবকাশ-১

চিনতে হবে।’

একটু থমকাল রানা। ‘বলে কি, চেনে না?’

‘সম্ভাবনা খুবই কম।’

‘শিওর হচ্ছে কি করে?’

‘রোমে লারসেনের আগে থেকে চাকরি আমার। আমিই তো চিনি না তাকে। তাছাড়া, লারসেন নিউ ইয়র্ক ডেস্কে কাজ করেনি কখনও, পত্রিকায় যোগ দেবার পর থেকেই বিদেশে-বিদেশে আছে। অতএব, বুঝতেই পারছ।’

‘তবু...।’ অন্যমনস্কের মত কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘ঝুঁকি আছে এতে। তুমি বরং ফোন কর ভেনিসে, টাওয়ার হোটেলে। আমি কথা বলব লারসেনের সাথে।’

‘ঠিক আছে,’ টেলিফোন সেটটা কাছে টেনে আনল লিজা। ওপাশ থেকে সাড়া পেতে রিসিভার বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। ‘কথা বল।’

ইনফর্মেশন ডেস্কে জানাল রানা, পিটার লারসেনের সঙ্গে কথা বলতে চায় সে। গত পরশু সস্ত্রীক ওখানে উঠেছেন তিনি। কিন্তু ওদের বক্তব্য শুনে আহাম্মক বনে গেল রানা। জানা গেল, ইল সেনর লারসেন এবং তাঁর স্ত্রী ওখানে উঠেছিলেন ঠিকই, কিন্তু গতকাল তারা চেক আউট করেছেন। কোথায় গেছেন তার ফরোয়ার্ডিং অ্যাড্রেস রেখে যাননি।

রানার অনুরোধে আরেকবার চেক আউট রেজিস্টার পরীক্ষা করে দেখল ডেস্ক। শেষে জবাব এল, ‘ঠিকই আছে, সেনর। আমাদের কোন ভুল হয়নি। চলে গেছেন ওঁরা। সরি, সেনর।’

অনেকক্ষণ লাগল রানার বাকশক্তি ফিরে পেতে। দাঁতে দাঁত

চাপল ও। ‘শা...আ...লা!’ বিড়বিড় করে বলল। রিসিভারটা ফিরিয়ে দিল নিজার হাতে।

‘কি হল? কি বলে শালারা?’

‘আমার মুণ্ডু!’ ঝাঁঝিয়ে উঠল রানা। পা বাড়াল ভেতর দিকে। গজ গজ করছে আপনমনে। ‘শালা ধাপ্পাবাজ, জোচ্চোর! শালা সাড়ে শয়তান! পচা কাউ ডাং!’ পিছনে দরজাটা লেগে গেল দড়াম করে।

কিছুই বুঝল না নিজা ভ্যালিটি। হাঁ করে চেয়ে থাকল সে বন্ধ দরজার দিকে।

তিন

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট। রোম। সকাল এগারোটা। তাপ-মাত্রা আজ আরও তিন ডিগ্রী বেড়ে গেছে। ব্যারিয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। জায়গাটা উন্মুক্ত, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়। ঘামছে ও। সেই সাথে ঘন ঘন তেষ্ঠা পাচ্ছে।

আলইটালিয়ার ঐতিহ্য বজায় রাখল নিউ ইয়র্ক-রোম ফ্লাইট। পুরো বিশ মিনিট দেরিতে অবতরণ করল। সাদাসিধে মেয়ে সোফিয়া শেরম্যান। তেমনি অনাকর্ষণীয়—দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাবার অর্থহ জাগবে না কারও। টিলেঢালা পোশাক। পায়ে তিক্ত অবকাশ-১

সাধারণ একজোড়া ফ্ল্যাট শু । নাকের ডগায় ঝুলছে হাড়ের তৈরি মোটা ফ্রেমওয়ালা চশমা । বব্‌ ছাঁট সোনালি চুল টেনে রিবনবন্দী করেছে সে ঘাড়ের কাছে । সব মিলিয়ে কলেজ পড়ুয়া অতি বিদ্বান ছাত্রীর মত লাগছে ।

‘মিস সোফিয়া শেরম্যান?’ এগিয়ে গেল মাসুদ রানা ।

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি । তর্জনী দিয়ে বিদঘুটে ফ্রেমটা ঠেলে তুলে দিল ওপরদিকে । ‘মিস্টার পিটার লারসেন?’

যাক বাবা, হাঁপ ছাড়ল রানা, লিজা ভেলেট্রির কথাই ঠিক হল তাহলে । ‘রাইট, ম্যা’ম ।’

মাঝারি গোছের দুটো সুটকেস ছাড়া আর কোন লাগেজ নেই মেয়েটির সঙ্গে । ও দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল ওরা । হোটেল পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রায় সোফিয়ার মধ্যে কথা বলার তেমন একটা আশ্রয় দেখা গেল না । সুযোগ পেয়ে রানাও মুখে ছিপি এঁটে বসে থাকল । কথা যত কম বলা যায়, ভুলভাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ততই কম ।

হোটেল একসেলশিয়র-এর রিসেপশন ডেস্ক থেকেই বিদেয় নিল রানা । ‘প্রয়োজন হলে জানাতে দ্বিধা করবেন না,’ সোফিয়াকে বলল ও । নিজের বাংলোর ফোন নাম্বারটাও দিল সেই সাথে । ‘অফিসে না পেলেন রাত ন’টার পর এই নাম্বারে ফোন করবেন । অথবা আমার পি.এ. লিজা ভেলেট্রিকে মেসেজ দিয়ে রাখলেও চলবে ।’

‘শিওর । থ্যাঙ্ক ইউ ।’ পোর্টারের পিছন পিছন এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল সোফিয়া শেরম্যান ।

তিরিক্ষি হয়ে আছে রানার মেজাজ । কোন খবর নেই লারসেন-

প্রিসিলার। ভালা মুসিবতেই পড়া গেল! এভাবে আর কতদিন? যে কোন মুহূর্তে জরুরী কাজের ডাক আসতে পারে, ছুটতে হতে পারে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে। কি অবস্থা হবে তখন? যত দিন যাচ্ছে ততই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে রানা। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা আছে ওর, কাজ চালিয়ে নিতে অসুবিধে খুব একটা হচ্ছে না। তবুও লারসেনের এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ মেনে নিতে পারছে না ও কিছুতেই।

আরে বাবা, হানিমুন করবি কর না! কে নিষেধ করতে গেছে? তাই বলে এভাবে ডুব মারতে হবে? নিজেরা মৌজ করে বেড়াবি, আর চাঁদি গরম করাবি আমার? দাঁড়া! পেয়ে নিই হাতের কাছে, দাঁতে দাঁত চাপল রানা। রেগেমেগে কিছু একটা প্রতিজ্ঞা করতে যাচ্ছিল—বাদ সাধল টেলিফোন।

লা ইটালিয়া ডেল পোপোলোর ক্রাইম রিপোর্টার টনি আমান্দোর ফোন। রোজই একবার করে রানার দুর্দশার খবর নেয় টনি।

‘হ্যালো, দোস্তু! কি করছ?’

‘অতিরিক্ত মাছি রোমে। বসে বসে মারছি।’

হেসে উঠল আমান্দো। ‘ওদের কোন খবর নেই?’

‘নাহ্!’

‘ব্যাটা বড্ডো নাছোড়বান্দা, বুঝলে? পাক্সা তিনটে বছর ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেছে প্রিসিলার পিছন পিছন, পাস্তা পায়নি। তারপর হঠাৎ কি যে হল প্রিসিলার, আরে মেয়েমানুষের জাত, বুঝলে না? মুখে বলে এক মনের মধ্যে আরেক। কথা নেই বার্তা নেই ধুম করে বিয়েতে মত দিয়ে বসল। ও শালা তো হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

মনে হয় তিন বছর ঘোরানোর শোধ তুলছে এখন বনে-জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে,' হা হা করে হেসে উঠল টনি নিজের রসিকতায়।

টনির কথাবার্তাই অন্যরকম। না হেসে পারা যায় না। হাসি থামতে বলল রানা, 'তোমার খবর কি, বল। কেমন চলছে?'

'ভালই। বিকেলে হাতে কাজ না থাকলে চল, ঘুরে আসি এক জায়গা থেকে।'

'কোথায়?'

'আমার এক খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে যাব, পোর্টা পিনসিয়ানায়। ফিল্ম প্রডিউসার ও, গুইসেপ মেনোটি। ওর লেটেস্ট ছবিটা ভেনিস ফেস্টিভেলে প্রথম পুরস্কার পাওয়ায় পার্টি থ্রো করেছে ব্যাটা। বিরাট কারবার।'

'কিন্তু...আমি...'

'কোন চিন্তা নেই। মেনোটি অন্যরকম মানুষ। চলই না, দেখবে কেমন দু'মিনিটে আপন করে নেয়। তুমি গেলে ও বরং খুশিই হবে। ঠিক আছে? তৈরি থেক তাহলে। ঠিক আটটায় তোমার বাংলোয় আসছি। ও হ্যাঁ, লারসেনের গাড়িটা নেয়া যাবে? আমারটা ডিসটার্ব করছে খুব।'

'নেয়া যাবে।'

'ও. কে। সী ইউ অ্যাট এইট।' কেটে গেল লাইন।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। লিজা ভেলেটি এসে ঢুকল এ সময়। 'রানা, লা সেনরিনা শেরম্যান হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন,' বলল সে।

'সোফিয়া?'

‘হ্যাঁ।’

‘চলে গেছে মানে?’

‘জানি না। খোঁজ নেবার জন্যে ফোন করেছিলাম। ওরা বলল, যেদিন উঠেছিলেন, তার পরদিনই হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।’

‘কোথায় গেছে?’

‘কিছুই বলে যাননি ওদের। কি করি এখন? যদি মিস্টার শেরম্যান টেলিফোন করেন?’

‘পুলিস হেডকোয়ার্টারে ফোন করে দেখ কি বলে ওরা। যাবে আর কোথায়! একজন বৌ নিয়ে পলাতক, ওদিকে আরেকজন ভাগোয়াট,’ গজ গজ করতে লাগল রানা। ‘যাও যাও, ভাগ! ঝামেলা কোরো না। আমি ব্যস্ত।’

বেরিয়ে গেল লিজা। ফিরে এল আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। হাসিমুখে বলল, ‘পাওয়া গেছে। ভায়া ক্যাভোর-এর কাছে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে উঠে গেছেন।’

‘ডাল করেছে,’ গুরুত্ব দিচ্ছে না রানা বিষয়টাকে।

‘এই যে,’ এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল লিজা। ‘ভিলার ফোন নাম্বার। নাও, কথা বল সেনরিনার সাথে।’

‘কি কথা?’

‘কেমন আছে কি করছে এইসব আর কি! এরমধ্যে একবারও খোঁজ নেয়া হল না তার।’ রানাকে ইতস্তত করতে দেখে নিজেই ফোন করল লিজা। ও প্রান্তে রিঙের আওয়াজ উঠতে রিসিভার ধরিয়ে দিল ওর হাতে। ‘কথা বল।’

‘হ্যালো?’ সোফিয়ার চিকন গলা শোনা গেল। ঠিক যেন কোন বাচ্চা মেয়ে কথা বলছে।

‘পিটার লারসেন বলছি,’ বলল রানা।

‘কে?’ বিস্মিত মনে হল মেয়েটিকে।

আবার বলল রানা। ভাব দেখে মনে হল, সে-ও বেমানুম ভুলে বসে আছে পিটার লারসেনের কথা। ভালই আছে সোফিয়া জানা গেল। না, তেমন কোন অসুবিধে হচ্ছে না তার। হলে জানাবে লারসেনকে। আরও দুয়েকটা সাধারণ বাক্য বিনিময়ের পর ফোন রেখে দিল মাসুদ রানা। কাউকে কিছু না জানিয়ে হোটেল ছেড়ে অ্যাপার্টমেন্টে কেন, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না। লারসেনের এ ধরনের প্রশ্ন করা শোভা পায় না।

আটটা চল্লিশে পোর্টা পিনসিয়ানায় পৌঁছল রানা আর টনি আমান্দো। চারদিক বাগানঘেরা বিশাল এলাকা নিয়ে গুইসেপ মেনোটির প্রাসাদোপম বাংলো। এরই মধ্যে বাংলোর লম্বা ক্যারিজওয়ে ভরে গেছে অসংখ্য ইটালিয়ান বুগাট্রি, ব্রিটিশ রোলস আর জার্মান ক্যাডিলাকে। ওর মধ্যে কোনরকমে ঢোকাল রানা লারসেনের কালো বুইক।

গুইসেপ মেনোটি’ ছোটখাট মানুষ। চেহারা সাদামাঠা। কিন্তু চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত। পোর্চে আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল সে। একটুও বাড়িয়ে বলেনি টনি আমান্দো। রানাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চারদিকের বাতাসে প্রায় ঝড় তুলে দিল লোকটা।

‘এই হিরোটাকে আর ক’দিন আগে কেন নিয়ে এলিনে আমার কাছে?’ রানার সাথে হ্যাণ্ডশেক সেরে টনির দিকে ফিরল মেনোটি। ‘ইশ্! একে দিয়েই হিরোর রোলটা করাতে পারতাম এই ছবির!’

দশটার দিকে হৈ-হুল্লার হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঝুঁজে পেতে

দোতলায় একটা বড় ঝুল বারান্দা আবিষ্কার করল রানা। মেনোটির চাপাচাপিতে বেশি খাওয়া হয়ে গেছে—একটু হাঁটাইটি করা দরকার। চমৎকার চাঁদ রয়েছে আজ আকাশে, ঝলমল করছে চারদিক।

হঠাৎ করেই একটি মেয়ের ওপর চোখ পড়ল রানার। বারান্দার ও মাথায় সাদা ইভনিং গাউন পরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। তার নগ্ন কাঁধ আর পিঠ চাঁদের আভায় চক চক করছে পোরসেলিনের মত। রেলিঙে দু'কনুইয়ের ভর চাপিয়ে আকাশ দেখছিল উদাস মনে।

‘ভেতরের হৈ-চৈ থেকে পালিয়ে এলেন?’ কথা বলে উঠল মেয়েটি।

‘ঠিক ধরেছেন,’ হাসল রানা।

‘আমি পালিয়েছি পনের মিনিট আগেই। আমেরিকান মেয়েগুলোর চেঁচামেচিতে মাথা ধরে গেছে,’ ধীরেসুস্থে ঘুরে দাঁড়াল সে।

অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটি। ছোটখাট গড়ন, বয়স খুব বেশি হলে কুড়ি হবে, আন্দাজ করল রানা। লাল লিপস্টিক মাথা লোভনীয় ঠোট দুটো আগুন হয়ে জ্বলছে। তীব্র একটা আকর্ষণ আছে এ মেয়ের, চোখ ফেরাতে পারছে না ও। মেয়েটিও বুঝে ফেলেছে রানার মনের ডাব। সে-ও এক ভাবে দেখছে রানাকে। কয়েক মুহূর্ত পর হাসল, ঝক ঝক করে উঠল তার দুসারি সুগঠিত দাঁত। ‘আমি কি এতই বদলে গেছি যে চিনতেই পারছেন না, মিস্টার লারসেন?’

প্রায় চমকে উঠল রানা। ‘মাফ করবেন,’ মৃদু কণ্ঠে বলল।

‘আপনাকে ঠিক...’

মুখের কথা কেড়ে নিল মেয়েটি। ‘চিনতে পারছেন না, এই তো?’ আবার হাসল অঙ্গরী, ‘আমি সোফিয়া শেরম্যান।’

বেকুকের মত চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। এই মেয়ে সোফিয়া শেরম্যান? একেই সেদিন রিসিভ করেছে ও লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? বিদ্যুটে চশমা আর ফ্ল্যাট হীল শু পরা সেদিনকার সোফিয়া আর আজকের সোফিয়াকে এক ভাবতে পারছে না রানা কিছুতেই। তাই বলে মনকে এ নিয়ে বৃথা তর্কে জড়াতে দিল না।

হঠাৎ করেই নাড়ীর স্পন্দন দ্রুততর হল ওর, ঘেমে উঠতে লাগল হাতের তালু। পরিবেশটা বড্ডো রোমান্টিক লাগছে রানার। নীরবতা তাকে আরও অর্থবহ, আরও মোহনীয় করে তুলেছে। কথা বলে তা নষ্ট করতে মন চাইল না।

এক সময় সচকিত হল রানা। জোর করে চোখ ফেরাল অন্যদিকে। কিন্তু কোন অদৃশ্য শক্তি আছে এ মেয়ের পুরুষকে সম্মোহিত করার। চোখ ফেরাতে বাধ্য হল রানা আবার। ‘ইট’স কোয়াইট আ সারপ্রাইজ।’

‘রিয়েলি?’ খুশি হয়েছে মেয়েটা মনে হল।

‘অফ কোর্স!’ জোর দিয়ে বলল মাসুদ রানা।

পুরো আধ ঘন্টা ব্যয় করল রানা সোফিয়ার সাথে, নিভৃতে। নানান প্রসঙ্গে আলোচনা হল ওদের। যার বেশিরভাগই অর্থহীন—চাঁদ, স্নিগ্ধ আলো, মনোরম পরিবেশ এইসব নিয়ে।

‘সঙ্গে গাড়ি আছে আপনার?’ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

‘আছে, কেন?’

‘আমাকে পৌছে দিতে পারবেন আমার অ্যাপার্টমেন্টে?’

রীতিমত হতাশ হল রানা। ‘এখনই চলে যাবেন? পার্টি শেষ না হতেই?’

একটু চুপ করে থাকল সোফিয়া। তারপর বলল, ‘সরি। আপনার আনন্দ মাটি করতে চাই না। আমি না হয় একটা ট্যাক্সি খুঁজে নেব।’

‘না না,’ ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা। ‘আপনাকে পৌছে দিতে পারলে বরং খুশিই হব আমি। চলুন, যাওয়া যাক।’

‘গাড়িটা কোথায়?’

‘ক্যারিজ-ওয়ের শেষ মাথার দিকে। কালো বুইক।’

‘অল রাইট। আমি যাচ্ছি।’

ঘুরে দাঁড়াল সোফিয়া। পিছন পিছন রানাও এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত ইশারায় নিষেধ করল মেয়েটি। ‘এখনই নয়, একটু পরে আসুন, প্রীজ। কেউ আমাদের এক সাথে দেখে না ফেলে। কথাটা বাবার কানে যেতে পারে।’ বেরিয়ে গেল সে নিঃশব্দ পায়ে।

বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল সোফিয়া। তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরাল রানা। টের পাচ্ছে, হাত কাঁপছে ওর। ভিজে গেছে তালু। ঘন ঘন টান দিতে লাগল রানা সিগারেটে। কিন্তু কয়েকটা টান দিয়েই ফেলে দিল, পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল। বিশ্বাস লাগছে। নিচে নেমে এল ও। নারী-পুরুষের হৈ-হুল্লোড়ে কান পাতা দায়। নাচের আসর শুরু হতে যাচ্ছে।

বহু খোঁজাখুঁজি করে ওইসেপ মেনোটিকে পাওয়া গেল। তাকে জানাল রানা, হঠাৎ করে মাথা ধরেছে খুব। সে যদি কিছু মনে না

করে, তো বাসায় ফিরতে চায় ও। আসল অনুষ্ঠানে রানা থাকতে পারছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করল ফিল্ম প্রডিউসার। বলল, 'চলুন, গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে।'

আঁতকে উঠল রানা। 'কোন দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি বলল। 'একাই যেতে পারব। আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ। টনিকে বলবেন, পূজা, ও যেন অন্য কারও সাথে ফিরে যায়।' লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না ও, বেরিয়ে এল হন হন করে।

ভেতরে বসে আছে সোফিয়া মূর্তির মত। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসতেই মন পাগল করা মিষ্টি একটা সুবাস ধাক্কা মারল এসে নাকে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পাশে তাকাল রানা।

'ভায়া ক্যাভোর চলুন, পূজা।' সোজা তাকিয়ে আছে মেয়েটি।

ইচ্ছে করেই আস্তে চালাতে লাগল রানা। কি এক ঘোরে পড়েছে যেন। কিছুতেই একে কাছছাড়া করতে মন চাইছে না। যেটুকু সময় সোফিয়ার সান্নিধ্য পাওয়া যায়, যেন সেটুকুই লাভ। বাক নিয়ে ভায়া ভিটোরিও ভেনিটোয় এসে পড়ল বুইক। ট্রাফিকের চাপ এ মুহূর্তে সামান্য কমেছে।

আধ ঘন্টা লাগল ভায়া ক্যাভোর পৌঁছুতে। সোফিয়ার নির্দেশিত জায়গায় গাড়ি থামাল রানা। দুপাশে কয়েকটা আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিং। রাস্তাটা প্রায় নির্জন। নেমে পড়ল রানা। ঘুরে এপাশে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি নেমে পড়েছে আগেই।

'আসুন আমার সাথে,' মাথা ঝাঁকিয়ে সোনালি চুল দোলল সোফিয়া। 'গল্প করা যাবে খানিক।'

ভদ্রতা দেখাতে রানা-ই বা কম যায় কিসে? বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড। আজ থাক, আরেকদিন না হয় গল্প হবে।'

‘মোটাই টায়ার্ড নই । চলে আসুন ।’

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা নীরবে । একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে ভেতরে ভেতরে অবাক হল রানা । যে বিল্ডিংটার সামনে ওকে গাড়ি থামাতে বলেছে সোফিয়া, সেটায় থাকে না সে আসলে । থাকে শখানেক গজ দূরের একটা ছয়তলা টুইন অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে । এলিভেটরে করে ভবনটার চারতলায় উঠে এল রানা আর সোফিয়া ।

‘এই সাবধানতার প্রয়োজন আছে,’ যেন রানার মনের কথা বুঝতে পেরেই বলল মেয়েটি । ‘রাত-বিরেতে আমাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন আপনি, শুনলে আর যা-ই হোক, অন্তত খুশি হবেন না আমার বাবা । তাতে আমার অবশ্য কিছু আসবে যাবে না... ।’ বক্তব্য শেষ না করেই থেমে গেল সে ।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে এগোল ওরা । আট দশ পা যেতেই পালিশ করা কাঠের এক পাল্লার ভারি একটা দরজা । ওটার সামনে দাঁড়িয়ে হাতব্যাগ হাতড়ে চাবি বের করল সোফিয়া । দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল । ‘আসুন ।’

পথ দেখিয়ে রানাকে লাউঞ্জে নিয়ে এল সে । রুমটা প্রকাণ্ড । তিন-চারটে হুড পরানো পেডেস্টাল ল্যাম্প জ্বলছে এখানে ওখানে । আলোগুলো স্বপ্নিল করে তুলেছে ঘরের পরিবেশ । বুঝতে অসুবিধে হল না রানার, ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই অ্যাপার্টমেন্টে ।

একটা চেয়ারের ওপর ব্যাগটা নামিয়ে রেখে ছোট একটা ককটেল কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সোফিয়া । ‘ড্রিন্‌কস?’ বলল সে ।

‘নো, থ্যাঙ্কস ।’

একটা গ্লাসে খানিকটা জিন আর টনিক ঢেলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সোফিয়া। ‘আসুন বসা যাক।’

মুখোমুখি দুটো সোফায় বসল ওরা। কোন মেয়ের সামনে নিজেকে আগে কখনও এতটা বোকা মনে হয়নি রানার। কিছু একটা বলা দরকার, ভাবল ও। একদম চুপ মেরে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।

‘এতবড় অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকেন?’

গ্লাসে চুমুক দিল সোফিয়া শেরম্যান। পানীয়টুকু ভেতরে গড়িয়ে দিয়ে হাসল। ‘কেন? একা থাকাটা কি অন্যায়?’

‘না, তা নয়,’ অপ্রস্তুত হল রানা। ‘বলছিলাম...এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। সে যাক, আপনার পড়াশুনা কেমন চলছে?’

‘খুব খারাপ। ভাবছি পড়াশুনা করব না আর।’

‘আপনার বাবাকে জানিয়েছেন?’

‘উহঁ! তাতে মূল্যবান সময় নষ্ট করা হবে তাঁর,’ খানিকটা ক্ষোভ জড়ানো কণ্ঠে বলল সোফিয়া। ‘এসব নিয়ে ভাববার সময় কোথায় তাঁর? নিজেকে, আর আমার চেয়েও অল্পবয়সী লেটেস্ট বৌকে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি। ওঁদের দু’জনের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যেই আসলে এখানে এসেছি আর্কিটেকচারাল ভার্শিটিতে পড়ব বলে। বাবাও নিশ্চয়ই আমাকে দূর করতে পেরে বেঁচে গেছেন।’

বলে কি? ভাবল রানা। অথচ, ওর সঙ্গে আলোচনার সময় তো ভদ্রলোককে এতটা স্বার্থপর মনে হয়নি। তাঁকে বরং মেয়ের জন্যে যথেষ্ট চিন্তাগ্রস্তই মনে হয়েছে রানার।

রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে ক্ষোভটা সম্ভবত বেড়ে গেল সোফিয়ার। বাকি জিন-টনিকটুকু গলায় ঢেলে গ্লাসটা সামনের

সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখল ঠক করে। ঝাঁঝের সাথে বলতে শুরু করল, 'কিসে মেয়ে খুশি হয়, কিসে কষ্ট পায়, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আপনার বসের। দশ বছর বয়সে মা মারা যান আমার। এরপর আরও তিনবার বিয়ে করেছেন। তাদের দু'জন আমার মাত্র দু'বছরের বড় ছিল। শেষেরজন ছোট। কল্পনা করতে পারেন? সব কিছু মুখ বুজে মেনে নিয়েছি। কিন্তু দিনে দিনে পরিস্থিতি এত জটিল হয়ে উঠেছে যে আর থাকতে পারলাম না। ভাবছি এ দেশেই সেটল্ করব।'

'পাকা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন তাহলে? আরেকটু ভেবে দেখলে ভাল করতেন বোধহয়। আপনার ব্যাপারে মিস্টার শেরম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার টেলিফোনে। আমার মনে হয়, আপনাকে নিয়ে তিনি ভাবনা-চিন্তা করেন। আর...'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বলল মেয়েটি। 'তবে মুখে মুখে করেন। এই যা।'

আর কি বলা যায় ভেবে পেল না মাসুদ রানা। বেশি নাক গলানো উচিত হবে না, সোফিয়া তা পছন্দ না-ও করতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এসব শুনে নিশ্চয়ই একেবারে চুপ থাকতে পারত না লারসেন। একটু ভেবে নিয়ে বলল ও, 'মুসিবতেই ফেললেন। আমি আপনার বাবার পত্রিকায় চাকরি করি। আপনি রওনা হবার আগের দিন ফোন করেছিলেন মিস্টার শেরম্যান। আমাকে বারবার করে বলে দিয়েছেন আমি যেন আপনার খোঁজ খবর রাখি। আপনি যদি এরকম উল্টোপাল্টা করেন, চাকরিটা হয়ত হারাব আমি।'

'মিস্টার লারসেন, আমি বাচ্চা মেয়ে নই। বিশ বছর চলছে তিষ্ঠ অবকাশ-১

বয়স। আরও দুবছর আগেই সাবালিকা হয়েছি। অর্থাৎ নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ে নেবার অধিকার পেয়ে গেছি আমি আইন বলে। সেখানে আপনার বসের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। তবে, আপনি চিন্তা করবেন না। এটুকু গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, নিজে থেকে যেচে কখনও আমার খবর নিতে যাবেন না তিনি। তাঁকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আমি কি করছি*না করছি, জানতে চাইবেন না তিনি, নিশ্চিত থাকতে পারেন। আর যদি ভুল করে খোঁজ নেবার জন্যে টেলিফোন করেই বসেন, বলবেন, পড়াশুনা নিয়ে মহাব্যস্ত আমি। দরকার মনে করলে আমার এখানকার ফোন নাম্বারটা জানিয়ে দেবেন আপনার বসকে। তাতেও যদি সন্তুষ্ট হতে না পারেন, তো বলুন, আমিই না হয় তাঁকে জানিয়ে দেই ফোন করে যে দিনরাত সরাক্ষণ আমার খবরদারি করছেন আপনি।’

মিষ্টি করে হাসল সোফিয়া। দুহাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে বসল। অন্তরঙ্গ সুরে, যেন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, এমনভাবে বলল, ‘তোমাকে খুব মনে ধরেছে আমার। আমার কারণে তোমার যেন কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখব আমি। হলো?’

‘ধন্যবাদ।’ যেন আশ্বস্ত হয়েছে, এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল রানা চোখেমুখে। ভেতরে ভেতরে হার্টবিট উঠে গেছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনমতে একটা টোক গিলে হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল।

‘কি হল?’ কপাল কোঁচকাল সোফিয়া, ‘ঘড়ি দেখছ যে?’

‘রাত অনেক হল। আমাকে...’

‘কামন, লারসেন। আরেকটু অ্যাডাল্টের মত আচরণ কর,’

সিধে হল সোফিয়া। দুহাত ঘাড়ের পিছনে বেঁধে হেলান দিয়ে বসল। আধবোজা চোখে চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। কোন পুরুষকে আমন্ত্রণ জানানোর এটাই সম্ভবত মেয়েদের সবচেয়ে লোভনীয় ভঙ্গিমা।

ধপধপে সাদা নরম সিল্কের নিচে সোফিয়ার দেহটা কল্পনা করে আবার টোক গিলল মাসুদ রানা। আবছা আলোয় মেয়েটিকে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিন্তার মোড় ঘুরে গেল ওর আপনাআপনি। অ্যাপার্টমেন্টের বিশাল আকার আর সাজ-সজ্জার ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলল। শেরম্যান কি মিথ্যে বললেন ওকে? মাত্র আটশো ডলারে এত বিলাসী জীবন কি করে যাপন করা সম্ভব? রোমের যা আকাশচুম্বী বাড়িভাড়া, তাতে এই ফ্ল্যাটের ভাড়া সপ্তাহে কম করেও দেড়শো ডলার হবে। অন্য সব খরচ কি করে চালায় সোফিয়া?

‘কি এত ভাবছ?’

‘কিছু না,’ আবার হাতঘড়ি দেখল রানা। ‘রাত প্রায় দুটো। আমার যাওয়া উচিত এবার।’

উঠে এল সোফিয়া। হাত ধরে টেনে তুলল রানাকে। বাঁ হাতে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে সেন্টে এল বুকের সাথে। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকল চোখে চোখে। তার দেহের হালকা মিষ্টি সুবাস মাতাল করে তুলল রানাকে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে ও।

সোফিয়ার অন্য হাতটা এবার সাপের মত রানার গলা বেষ্টন করে ধরল। মুখটা এগিয়ে নিয়ে এল সামনে। ‘প্লীজ, লারসেন,’

ফিসফিস করে বলল মেয়েটি। 'আর একটু থেকে যাও।'

এক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই রানার নিষ্ঠুর ঠোটজোড়া নেমে এল। বামহাত জড়িয়ে ধরল সোফিয়ার ক্ষীণ কটি।

দূরের কোন গির্জায় ঢং ঢং করে দুটোর ঘন্টা পড়ল এই সময়।

চার

লাঞ্চ সেরে একটু গড়িয়ে নেয়ার জন্যে শুয়েছিল রানা। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানেও না। চোখ মেলেই মনটা খুশি হয়ে উঠল। আড়মোড়া ভেঙে কাত হয়ে গুল। জানালা দিয়ে চেয়ে থাকল বাইরের দিকে। ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে আছে রোমের আকাশ, সূর্যের চিহ্নই নেই। গাছের পাতা নড়ছে না, বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে বৃষ্টি। ভালই হবে। অসহ্য গরমে আটকে আসছিল দম।

বেড-সাইড টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল। পাশেই সুদৃশ্য একটা টেবিল ঘড়ি—তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। হাত বাড়াল রানা রিসিভারের দিকে। 'ইয়েস!'

'পিটার?' সোফিয়া শেরম্যানের গলা। 'আজ একসাথে ডিনার করব আমরা। কোথায় সারা যায় ডিনারটা, বল তো?'

'নাহ্,' অভিযোগের সুরে বলল রানা। 'আমার চাকরিটা তুমি

সত্যিই খাবে দেখছি।’

খিল খিল করে বাচ্চা মেয়ের মত হেসে উঠল সোফিয়া।
‘খাবই তো! সেই সাথে তোমাকেও খাব। এখন যা জিজ্ঞেস
করছি, তার উত্তর দাও।’

‘আমি আর কি বলব? প্রোগ্রাম যখন করেই ফেলেছ, ওটাও
তুমি ঠিক কর।’

‘ও. কে,’ একটু চিন্তা করে বলল সোফিয়া, ‘টেলি ফাউন্টেনের
উল্টোদিকে ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্ট আছে।’

‘টেলি রেস্টুরেন্ট,’ বলল রানা।’

‘হ্যাঁ। ওখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি।’

‘কটায়?’

‘ঠিক সাড়ে আটটায়। অল রাইট?’

‘অগত্যা।’

ধমকে উঠল সোফিয়া, ‘ঠাট্টা রাখ। জরুরী আলাপ আছে
তোমার সাথে। একটা প্ল্যান এসেছে মাথায়।’

‘কিসের প্ল্যান?’

‘এখন নয়, ডিনারের পর জানাব।’

‘নিশ্চয় তোমার বেডরুমে বসে?’

‘কারেষ্ট,’ আবার হাসল সে। ‘রাখলাম।’

রিসিভার রেখে নেমে পড়ল রানা। কখন শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি
খেয়াল করেনি। বড় বড় ফোঁটায় ঝম ঝম করে ঝরছে। ঝাপসা
হয়ে গেছে জানালার কাঁচ বৃষ্টির ছাঁট লেগে। বাইরে দেখা যায় না
কিছুই। জানালার একটা পাল্লা খুলে দিল ও। ঠাণ্ডা বাতাসের
ঝাপটা লাগল নাকে-মুখে। সাথে বিন্দু বিন্দু পানির কণা। লম্বা

করে দম নিল রানা, ফুসফুস ভরে টেনে নিল নির্মল, ভেজা বাতাস।

বাগানের ফুলের গাছগুলো মাথা দুলিয়ে খেলা করছে বাতাসের সাথে। বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে ছোট ছোট পাতাগুলো ঝাঁকি খাচ্ছে ঘন ঘন। আনমনে সোফিয়া শেরম্যানের কথা ভাবছে ও। বহু নারী এসেছে রানার জীবনে। কিন্তু এই মেয়েটির মত প্রথম দর্শনেই এত আলোড়ন কেউ তুলতে পেরেছে কি না ওর বুকের ভেতর, মনে পড়ে না। শুধু রূপই নয়, আরও যেন কি একটা আছে এর ভেতরে। যা কেবল অন্তর দিয়ে অনুভব করা যায়।

কিন্তু সোফিয়ার সাথে এভাবে মেলামেশা করাটা ঠিক হচ্ছে না। নিজেকে বলল রানা, আকর্ষণ যতই থাকুক, নিজেকে সামাল দেবার চেষ্টা করা উচিত। ঘটনাটা ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের কানে গেলে কপালে দুর্ভোগ আছে লারসেনের। পরক্ষণেই খাট্টা হয়ে গেল মেজাজটা। আজ আটদিন চলছে। এখনও খবর নেই ওদের। তোর হানিমুনের ইয়ে করি আমি, শা-লা! মনে মনে বলল রানা, জুতিয়ে তোর পোঁদের এক পাল্লা ছাল যদি তুলে না নিয়েছি...। বজ্রপাতের প্রচণ্ড আওয়াজে এবারও প্রতিজ্ঞাটা শেষ করতে পারল না ও।

তৈরি হয়ে পত্রিকা অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল রানা। ওখান থেকে বেরুল ঠিক সাতটায়। রানা এজেন্সিতে গিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করল মোনিকার সাথে। কিছুক্ষণ জরুরী দুয়েকটা কেসের ফাইল ওল্টাল। কি ভাবে কোন পথে ওগুলোর সহজ সমাধান পাওয়া যাবে, নোট শীটে দু'চার লাইনে খুব সংক্ষেপে তার পথ বাতলে দিল।

তারপর আবার বেরোল, তখন বাজে সোয়া আটটা। ট্রেভি
রেস্টুরেন্টের সামনে যখন গাড়ি পার্ক করল রানা, সাড়ে আটটা
বাজতে তখনও দুমিনিট বাকি। স্টার্ট বন্ধ করে বুইকের হ্যাণ্ড-ব্রেক
টেনে লক্ করল ও। ইগনিশন কী পকেটে পুরে বেরিয়ে এল গাড়ি
থেকে।

রেস্টুরেন্টটা খুবই ছোট। তবে ভেতরের সাজ-সজ্জা চমৎকার
রুচিশীল। এমনিতেই ইটালিয়ান খাবার রানার প্রিয়, তার ওপর
এদের রান্না অতুলনীয়। বহুবার এসেছে রানা এখানে। মাঝবয়সী
এক ওয়েটার পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওকে সোফিয়ার রিজার্ভ করা
টেবিলে।

আকাশী রঙের টাইট স্কার্ট এবং টকটকে লাল ব্লাউজ পরেছে
আজ মেয়েটি। কানে দুটো ছোট্ট ঘোলাটে সাদা দামি পাথর
বসানো দুল। গলায় একই পাথরের বড় লকেট এবং সরু চেইন।
শ্যাম্পু করা চুল অর্ধচন্দ্রের মত ছড়িয়ে আছে পিঠ জুড়ে। আলো
লেগে চকচক করছে। সদ্য ফোটা গোলাপের মত সতেজ স্নিগ্ধ
লাগছে মেয়েটিকে। অন্যান্য দিনের তুলনায় ওকে আজ অনেক
হাসিখুশি লাগল রানার। সামান্য কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

রানার অলক্ষ্যে একদৃষ্টে ওকে দেখছে সোফিয়া। কিছু একটা
হিসেব-নিকেশ করছে মনে হল। সাড়ে ন'টায় ট্রেভি থেকে
বেরোল ওরা। 'চল,' গাড়ির কাছে পৌছে বলল মেয়েটি। 'আমার
অ্যাপার্টমেন্টে। জরুরী কথা আছে।'

'সত্যিই জরুরী?'

'ইয়েস, স্যার। সত্যিই জরুরী।'

সোফিয়ার কথামত ওর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের একটু দূরে

অঙ্ককার মত একটা জায়গা দেখে গাড়ি থামাল রানা। ঘরের ভেতর পা রেখে বলল মেয়েটি, 'ড্রিঙ্কস?'

'স্কচ, প্লীজ।' সোফার পুরু গদিতে গা এলিয়ে দিল রানা।

নিজের জন্যে জিন আর টনিক এবং রানার জন্যে স্কচ নিয়ে ফিরে এল সোফিয়া। গ্লাস দুটো সেন্টার-টেবিলে রেখে রানার মুখোমুখি বসল পায়ের ওপর পা তুলে। ওর সুন্দর ফর্সা হাঁটুর ওপর চোখ আটকে গেল রানার। 'এবার শোনা যাক তোমার প্ল্যান।'

'আপে এটা দেখ। পরে ভুলে যেতে পারি,' উঠে গিয়ে ওপাশের একটা চেয়ারের ব্যাকে ঝোলানো বড়সড় এক চামড়ার কেস নিয়ে এল সোফিয়া। ওটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটার রিলিজ সিস্টেমটা কাজ করছে না। একটু দেখে দাও তো।'

'কি এটা?' কেসটা খুলল রানা। ভেতর থেকে বেরোল একখানা আনকোরা, ঝকঝকে সিক্সটিন এম এম পেইলার্ড বোলেক্স ক্যামেরা, সঙ্গে একটা ট্রিপল লেন্স টারেট।

'কালই কিনেছি ক্যামেরাটা। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন গুগোল আছে কোথাও, কাজ করছে না।'

ক্যামেরাটা উল্টেপাল্টে দেখল রানা। এই সিনে ক্যামেরা সম্পর্কে খুব একটা ধারণা নেই এমন কারও হাতে পড়লে অল্পেতেই বরবাদ হয়ে যেতে পারে দামি জিনিসটা। যেমন জটিল, তেমনি স্পর্শকাতর। বর্তমান বাজারে পাঁচশো ডলারের নিচে হবে না এর দাম। ভাবনাটা আবার পেয়ে বসল রানাকে, কোথায় পায় সোফিয়া এত টাকা? মাত্র আটশো ডলারে এত বিলাসবহুল জীবন কাটানো কি করে সম্ভব? কিন্তু এসব একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার

নিয়ে সোফিয়াকে কোন প্রশ্ন করতে রুচিতে বাধল রানার।

‘গুগোলটা কোথায় এর?’

‘ফিল্ম রিলিজিং সিস্টেমে। কয়েকবার শাটার টিপে দেখেছি, ফিল্ম রোল করে না।’

মুচকি হেসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল রানা ওকে। নিচের ছোট্ট একটা লিভার দেখিয়ে বলল, ‘এই জিনিসটা হচ্ছে সেফটি লিভার। এটাকে চাপ দিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে দিতে হবে প্রথমে। নইলে মোটর চলবে না। ছবি ওঠার তো প্রশ্নই আসে না।’

‘মাই গড! আরেকটু হলে দোকানে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম আমি এটা।’ ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে লিভারটা কয়েকবার অন অফ করল সে। ‘এটা দেবার কি অর্থ?’

‘অনেক সময় দুর্ঘটনাবশত ঝাঁকি লেগে চালু হয়ে যেতে পারে মোটর, পুরো রোল এক্সপোজ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু লিভারটা অন থাকলে সে ভয় আর থাকে না। তা, এত দামি সিনে ক্যামেরা কেনার কি দরকার পড়ল তোমার হঠাৎ?’ মৃদু চুমুক দিল রানা গ্যাসে। ‘কি করতে চাইছ?’

হাসল সোফিয়া। ‘আমার রোম জীবনটা সেলুলয়েডের ফিতেয় বন্দী রাখতে চাই। বুড়ো বয়সে নাতী-পুতিদের দেখাব,’ হাত তুলে এক কোণের একটা ডেস্কের ওপর সাজিয়ে রাখা দশ কার্টন ফিল্ম দেখাল সে। ‘ওগুলোও কিনেছি এর সাথে।’

‘ওড গড!’ আঁতকে উঠল রানা, ‘এত ফিল্ম? মাথা ঠিক আছে তো তোমার?’

‘নাহ!’ হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল সোফিয়া, ‘ওটার সেফটি লিভারেও গুগোল হয়ে গেছে।’

‘যাকগে । কিসের প্ল্যান এঁটেছ, বল এবার ।’

‘বলছি, সবুর । আগে বল উইক এণ্টা কোথায় কাটাচ্ছ তুমি?
রোমেই, না আর কোথাও?’

‘কেন?’

‘আহা, বলোই না ।’

‘ঠিক নেই । কাজের চাপ খুব বেশি । ও নিয়ে চিন্তাই করিনি ।’
গ্রাসটা শেষ করল রানা ।

‘আমি যদি বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসার প্রস্তাব দিই, তুমি
কি আপত্তি করবে? আমার সাথে?’

‘খুলে বল ।’

‘সরেনটো গেছ কখনও?’ দুহাত মুঠি পাকিয়ে তার ওপর
থুতনি রেখে ঝুঁকে বসল সোফিয়া । ‘নেপলস-এ?’

‘না, যাইনি । নেপলস গিয়েছি অবশ্য বার কয়েক ।’

‘সরেনটোয় মনের মত একটা জায়গা আছে, পিটার । শহর
থেকে একটু দূরে । পাহাড়ের ওপর চমৎকার, ঠিক আমার মনের
মত একটা ভিলা । জায়গাটা ছবির মত সুন্দর, অ্যাও ভেরি ভেরি
আইসোলেটেড । আমি শিওর, তোমার পছন্দ হবে । অলরেডি
তিনদিনের জন্যে ভাড়া নিয়েও ফেলেছি আমি ভিলাটা ।’

বলতে বলতে রানার পাশে এসে বসল সোফিয়া । এক হাতে
জড়িয়ে ধরল ওর গলা । আদুরে ভঙ্গিতে বলল, ‘যাবে আমার সঙ্গে,
পিটার?’

‘কিস্তু, সোফিয়া...’

‘প্লীজ,’ ওর ঠোঁটের ওপর আলতো করে একটা আঙুল রাখল
মেয়েটি । ‘প্লীজ । একটা দিন আমাকে সঙ্গ দিলে কি এমন ক্ষতি?’

শনিবার অফিস করে চলে আসবে ওখানে। আবার সোমবার
ভোরের ট্রেনে ফিরে আসবে, অফিস আওয়ারের আগেই পৌঁছে
যাবে রোম।’

‘কাজটা বোধহয় ঠিক হবে না, সোফিয়া,’ বলল বটে, কিন্তু
কেন ঠিক হবে না, তা-ও ভেবে পেল না রানা।

‘তুমি কিছু ভেব না, ডার্লিং। বাবা কিছু জানতে পারবে না।
সব প্ল্যান ভেবেচিন্তেই করেছি। কাল খুব ভোরে সরেনটো রওনা
হয়ে যাচ্ছি আমি, তুমি আসবে পরশু সাড়ে তিনটের ট্রেনে। তুমি
কল্লনাও করতে পারবে না কি চমৎকার একটা জায়গা ওটা। ভিলা
থেকে খোলা সাগর দেখা যায়, ক্যাপরি আইল্যান্ড দেখা যায়।
ওগুলো দেখবে, বোর হয়ে গেলে আমাকে দেখবে,’ শেষটুকু
ফিসফিস করে বলল সোফিয়া।

আবেগে অল্প অল্প কাঁপছে মেয়েটি। দুচোখ বুজে এসেছে।
সম্ভবত নিজের অজান্তেই রাঙা লোভনীয় ঠোটজোড়া এগিয়ে দিল
সে রানার দিকে। আলতো করে চুমু খেল রানা।

‘আমি জানি, তুমি তোমার চাকরি নিয়ে শঙ্কিত। তাই কেউ
যাতে কিছুটা টের না পায় সেজন্যে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস রবার্ট
হুইটনি নামে ভাড়া নিয়েছি ভিলা। ওরা জানে আমরা আমেরিকান
ট্যুরিস্ট। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি,’ উঠে গিয়ে বড় একটা স্কেল ম্যাপ নিয়ে
এল সোফিয়া। টেবিলের ওপর বিছাল ওটা।

‘এই দেখ, এই সেই ভিলা। বেলা ভিসটা—সুন্দর না নামটা?
চমৎকার বাগান, বাউগারি ঘিরে, কমলালেবু, আঙুর ইত্যাদি প্রচুর
আছে। ওই পাহাড়ে আর একটা ভিলা আছে অবশ্য, তবে অনেক
নিচে। সিকি মাইলেরও বেশি দূরে। বেলা ভিসটা প্রায় চুড়োয়।
তিত অবকাশ-১

গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, জায়গাটা তোমার পছন্দ না হয়েই পারে না।’

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘বুঝলাম। কিন্তু জায়গাটা আবিষ্কার করলে কবে? কবে গেলে সরেনটো?’

‘এই তো সেদিন। ট্যুরিস্ট বুক প্রথমে বেলা-ভিসটার পরিচিতি পড়ে তবে গিয়েছি। দেখে ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল, দেরি না করে বুক করে ফেললাম।’

দ্বিধায় পড়ে গেল রানা। কি বলবে বুঝতে পারছে না। মনের মধ্যে রাজি হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ষোল আনাই রয়েছে, তারপরও কেন যেন ইতস্তত ভাবটা কাটছে না। যদিও এরও কোন সঙ্গত কারণ নেই। ধুত্তোর! বিরক্ত হল রানা নিজের ওপর, এত ভাবাভাবির কি আছে? হাতে সময় আছে যখন, ঘুরে আসতে অসুবিধে কোথায়?

‘তুমি যাচ্ছ কিসে?’

‘আমার গাড়ি নিয়ে।’

এ এক নতুন খবর। ওর নিজের গাড়ি কোথেকে এল রোমে? ‘দেখি, একটু ভাবতে হবে। এখনই কথা দিতে পারছি না। যদি জরুরী কাজে আটকে না যাই...’

‘আটকাবে না,’ দৃঢ় আস্থার সাথে বলল সোফিয়া। ‘কাল সকালে চলে যাব আমি। নেপলস-সরেনটো লোকালে সরেনটো পৌঁছুতে এক ঘন্টা পনের মিনিট লাগবে। সোয়া দুটোর ট্রেন পৌঁছুবে সাড়ে তিনটেয়। বারোটায় অফিস থেকে বেরিয়ে ইজিলি নেপলস ফ্লাইট ধরতে পারবে তুমি। অথবা পুরোটা পথ ট্রেনেও যেতে পার। সেক্ষেত্রে নেপলস পৌঁছে ট্রেন বদল করতে হবে।’

লোকালে চড়তে হবে। শনিবার সাড়ে তিনটেয় সরেনটো স্টেশনে তোমার অপেক্ষায় থাকব আমি।’

‘সোফিয়া...’

আবার বাধা দিল মেয়েটি। ‘প্লী-জ! পিটার। এ প্রসঙ্গ এখন থাক। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। যদি ওই ট্রেনে তুমি না যাও...’ কাঁধ ঝাঁকাল সে, ‘যা বোঝার বুঝে নেব।’

পাঁচ

বসে আছে মাসুদ রানা। ঠিক করেছে সরেনটো যাবে ও। সাপ্তাহিক ছুটিটা কাটাবে সোফিয়ার সান্নিধ্যে। সিগারেট ধরিয়ে টানছে চুপচাপ। ঠিক বারোটায় বেরুবে। পৌনে একটায় নেপলস ফ্লাইট ধরবে। একটা ব্রিফকেসে টুকটাক একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় নিয়ে একবারেই বেরিয়েছে ও সকালে।

ওঠার আগে রানা এজেন্সিতে ফোন করল। মোনিকাকে জানাল, ‘জরুরী কাজে দু’দিনের জন্যে রোমের বাইরে যাচ্ছি আমি। সোমবার সকালে ফিরব। ঠিকানাটা লিখে নাও।’

বেলা ডিসটার ঠিকানা বলল ও। সেই সাথে সোফিয়ার স্কেল ম্যাপে দেখা তার অবস্থানও জানাল। ‘এর মধ্যে কোন জরুরী মেসেজ এলে ওখানে যোগাযোগ করবে।’

হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে ক্রম থেকে বেরিয়ে এল রানা। সামনের

রুমে পা রাখতেই লিজার টেলিফোনটা বেজে উঠল। ‘কে বলছেন?’ অনেক প্র্যাকটিস করা সুরেলা গলায় জিজ্ঞেস করল লিজা। ‘মিসেস...কে? একটু ধরুন, দেখি উনি আছেন কি না।’

মাউথপীস চেপে ধরে রানার দিকে তাকাল মেয়েটি ভুরু কুঁচকে। চেহারাটা হয়েছে খতমত খাওয়ার মত। ‘কে এক মিসেস রবার্ট হুইটনি কথা বলতে চাইছেন।’

আরেকটু হলে রানার মুখ দিয়ে বেরিয়েই যাচ্ছিল, ও নামে কাউকে চিনি না আমি। মুখ খুলেও বুজে ফেলল ও হপ করে। মনে পড়ে গেছে সোফিয়া শেরম্যান এই নামেই ভাড়া করেছে বেলা ভিসটা। মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রানা। যদিও তাতে খুব একটা কাজ হল না। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মেয়েটি ওর দিকে।

এগিয়ে এসে রিসিভারটা নিল রানা। ‘ইয়েস?’ যথাসম্ভব গভীর গলায় বলল।

‘হ্যালো, পিটার?’ বলল সোফিয়া। ‘একটা জরুরী প্রয়োজনে ফোন করলাম।’

‘আই সী! হ্যা, বলুন।’

‘কি হল, কি বলছ এসব? ও...বুঝেছি। তোমার পি.এ. পাশেই রয়েছে, তাই না?’

‘জি, ঠিক ধরেছেন। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি।’

খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। এই সময়, যেন পরিস্থিতিটাকে আরও ঘোলাটে করে তোলার জন্যেই দড়াম করে খুলে গেল অফিসের ফ্রন্ট ডোর। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মাড়ি পর্যন্ত বের করে দিয়ে হাসছে টনি আমান্দো। ‘হাই, রানা!’ বলল সে,

‘লারসেন শালার কোন খবর হল?’

ভাগ্য ভাল, দরজায় আওয়াজ উঠতেই মাউথপীস চেপে ধরেছিল ও। নইলে প্রতিটি শব্দ কানে যেত সোফিয়ার। চোখ ইশারায় টনিকে চুপ করতে বলল রানা।

‘...একটা র্যাটেন নাম্বার এইট ফিল্টার,’ সোফিয়া ওদিকে বলছে। ‘ক্যামেরার সাথে স্পেয়ার একটা দিয়েছিল। কিন্তু ভুল করে ফেলে এসেছি ওটা। তাই হাতের কাছে অতিরিক্ত একটা রাখতে চাই।’

‘আইটেমটা কি?’

‘আমার পেইলারড বোলের সিনে ক্যামেরার জন্যে একটা র্যাটেন নাম্বার এইট ফিল্টার।’

‘ও, আচ্ছা আচ্ছা। অসুবিধে নেই। ব্যাপারটা দেখব আমি।’

‘আমি তোমার অপেক্ষায় আছি, পিটার।’

ভয় হল রানার। মনে হল মেয়েটির সব কথা শুনতে পাচ্ছে লিজা। ‘আচ্ছা, ঠিক আছে, গুডবাই,’ বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল তাড়াতাড়ি।

‘বিষয় কি, রানা?’ এগিয়ে এল টনি, ‘ব্রিফকেস হাতে যে?’

‘জরুরী কিছু কাগজপত্র,’ দ্রুত বলল রানা। ‘তারপর? কি মনে করে?’

‘এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একবার খবর নিয়ে যাই। তুমি বেরোচ্ছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘চল তাহলে।’

লিজার কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে বেরিয়ে এল রানা।

এলিভেটরে উঠে টনি বলল, 'আমার ওখানে চল। আড্ডা মারা যাবে।'

'সরি, টনি। জরুরী কাজ আছে,' ইশারায় হাতের ব্রিফকেসটা দেখাল রানা। 'আজকের মধ্যেই সারতে হবে।'

'ও. কে। তাহলে কাল সকালে চলে এস। মাছ ধরতে যাব এক জায়গায়।'

'দেখি, সময় পেলে আসব।'

'রোববার আবার কিসের কাজ তোমার?'

'না, তেমন কিছু নয়। ঠিক আছে, চেষ্টা করব।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদেয় নিল ওরা। অফিস বিল্ডিংয়ের সাথেই একটা ছোট সুপার মার্কেট। ওখান থেকে সোফিয়ার জন্যে একটা ফিল্টার কিনে নিয়ে ট্যাক্সি চেপে ছুটল রানা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির উদ্দেশে। বিশাল এয়ারপোর্ট ভবনের সামনে নেমে ঘড়ি দেখল। এখনও দশ মিনিট সময় আছে ফ্লাইটের। একটা নিউজ পেপার কিওস্ক থেকে একগাদা খবরের কাগজ ম্যাগাজিন এবং একটা ট্যুরিস্ট গাইড কিনল রানা। তারপর পা বাড়াল আলইটালিয়ার অভ্যন্তরীণ ডিপারচার লাউঞ্জের দিকে।

পৌনে একটায় রানাকে নিয়ে ডানা মেলল রোম-নেপলস ফ্লাইট-এর বোয়িং ৭০৭। নেপলস নেমেই সোজা রেল স্টেশন। বেশ ভিড় সরেনটোগামী লোকালে। দেশটা ইউরোপে হলেও লোকাল ট্রেনগুলো বাংলাদেশের ট্রেনের মতই যখন খুশি চলে, যখন যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে পড়ে। অন্তত এই একটা ব্যাপারে ইটালীর সাথে দেশের কোন তফাত নেই দেখে বেশ খুশিই হল রানা।

চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে সরেনটো পৌছুল ট্রেন, বিশ মিনিট দেড়িতে। ভিড়ের চাপ খানিকটা কমতে ব্যারিয়ারের দিকে এগুল রানা ধীরেসুস্থে। চেকারের ফিরিয়ে দেয়া টিকেটের অর্ধেকটা আনমনে ফেলে দিল। স্টেশনের লম্বা টিন শেডের বাইরে এসে দাঁড়াল খাঁ খাঁ রোদ মাথায় করে। বুদ্ধি করে হ্যাটটা সঙ্গে এনেছিল বলে নিজেকে ধন্যবাদ দিল রানা।

পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল সোফিয়ার খোঁজে, কিন্তু কোথাও দেখা গেল না তাকে। ব্রিফকেসটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল রানা। বিদেশী দেখে অনেকক্ষণ থেকেই পিছনে লেগে ছিল এক ছোকরা ভিথিরি। কড়া এক ধমকে তাকে ভাগাল ও। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল, চারদিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন।

স্টেশনে উপস্থিত থাকবে কথা দিয়েও সোফিয়া আসেনি দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়েছে রানা। ওপাশে কয়েকটা ছাপ মারা ট্যাক্সি আর কিছু ঘোড়া-গাড়ি ছাড়া কোন প্রাইভেট কার নেই স্টেশন কার-পার্ক। নিজের কার নিয়েই যদি এসে থাকে মেয়েটি, তাহলে নিশ্চয়ই ওটায় করেই ওকে রিসিভ করতে আসবে স্টেশনে। না কি ট্রেনের দেরি দেখে ফিরে গেছে ভিলায়?

সোয়ারী পেয়ে এক এক করে ট্যাক্সি আর ঘোড়া-গাড়িগুলো সামনের চত্বর ত্যাগ করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একা হয়ে গেল রানা। প্রথমটা ফেলে আরেকটা সিগারেট ধরাল। গরম আর অনিশ্চয়তায় অধৈর্য হয়ে উঠছে ক্রমেই।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের ওপাশে এদিকে মুখ করা বড় একটা কাফে চোখে পড়ল। ওখানে গিয়ে বসা যাক, ভাবল রানা। ব্রিফকেসটা বেশ ভারি লাগছে। ঘুরে স্টেশনের লেফট লাগেজ অফিসে এল ও।

ট্যুরিস্ট গাইড বুকটা বাদে অন্য পত্রিকাগুলো ভেতরে রেখে ওটা জমা দিয়ে রসিদ নিল, তারপর পায়ে পায়ে কাফেতে এসে ঢুকল। খোলা দরজার সামনে স্টেশনের দিকে মুখ করে বসল রানা। এক কাপ এসপ্রেসোর অর্ডার দিল। এক ফাঁকে নজর বুলিয়ে নিল হাতঘড়ির ওপর—সাড়ে চারটে বেজে গেছে।

আস্তু ধীরে এসপ্রেসো পান করল ও। নজর স্টেশনের প্রবেশ চত্বরে। পর পর আরও তিনটে সিগারেট ধ্বংস করল রানা। এ ধরনের প্রতীক্ষা কখনই ভাল লাগে না ওর, একটু একটু করে মেজাজ গরম হয়ে উঠতে শুরু করল। পাঁচটার সময় উঠে কাউন্টারে এসে দাঁড়াল। বেলা ভিসটায় টেলিফোন আছে নিশ্চয়ই। একবার ট্রাই করে দেখতে চায়, পাওয়া যায় কি না সোফিয়াকে।

পুরো দশ মিনিট লাগল অপারেটরের নাম্বারটা খুঁজে বের করতে। আরও দশ মিনিট পর রানাকে জানাল সে, 'সরি, সেনর। ভিলায় কেউ নেই। ধরছে না টেলিফোন।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল ও। ব্যাপার কি? এখানে আসেনি, ভিলায়ও নেই। গেল কোথায় মেয়েটা তাহলে? না কি আসেইনি সে সরেনটো? সাথে সাথেই সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল রানা। আর যা-ই হোক, এ কাজ কিছুতেই করবে না সোফিয়া। কিন্তু তাহলে? কথা দিয়েও কেন স্টেশনে এল না ওকে রিসিভ করতে?

আরেক কাপ এসপ্রেসোর অর্ডার দিল রানা। আর কিছুক্ষণ দেখা যাক, ভাবল ও, তারপর রওনা হবে ভিলার দিকে। বলা যায় না, হয়ত খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে শুতে গিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছে সোফিয়া। হয়ত ঘুম ভাঙলেই ছুটে আসবে,

পথের মাঝে কোথাও দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই তাহলে। তাই হবে, নিজেকে শোনাল ও, নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় কাপ এসপ্রেসো শেষ করে উঠল রানা। বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। পরশু রাতে স্কেল ম্যাপে ভিলার নির্দেশিত পথটা মনে আছে ওর। তাছাড়া ট্যুরিস্ট গাইডটাও পুনে বসে ভাল করে পড়েছে, অতএব ভিলার পথ খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না।

ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়ার চিন্তাটা নাকচ করে দিল রানা। সোফিয়া যদি গাড়ি নিয়ে আসে, তাহলে হুশ করে পরস্পরকে ক্রস করবে ওরা। বেকার ছোট্টাছুটিই সার হবে তাতে। তার চেয়ে বরং ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এগোনো যাক। কিন্তু অনেক খুঁজেও কোন খালি ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল না। অগত্যা হেঁটেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা।

স্টেশন থেকে শহরমুখো একমাত্র পাকা সড়ক ধরে সিকি মাইলখানেক এগোতে সরেনটোর কেন্দ্রস্থলে পৌঁছল ও। ছোট হলেও ইটালীর বিখ্যাত ট্যুরিস্ট স্পটগুলোর অন্যতম এই সরেনটো। এখন পর্যটনের মওসুম। দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক চোখে পড়ল রানার।

জোড়ায় জোড়ায় অথবা দল বেঁধে অলস ভঙ্গিতে রাস্তা জুড়ে হাঁটছে। নানান ভাষায় কথা বলছে, হাসাহাসি করছে। বড় দোকান সামনে পড়লে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখ মেলে ভেতরের সাজানো পণ্য দেখছে।

ট্যুরিস্ট গাইডের নির্দেশ অনুযায়ী সরেনটো-আমালফি রাস্তা ধরে সোজা দুমাইল এগোল রানা। এরমধ্যে ঘোড়া-গাড়ির চিন্তা

বাতিল করে দিয়েছে। পড়ন্ত বিকেলের এই পদযাত্রা বেশ উপভোগ করছে ও। রাস্তাটা যেখানে ডানে বাঁক নিয়ে আমালফির দিকে গেছে, তার বিশ-পঁচিশ গজ আগে বাঁয়ে একটা সরু প্রাইভেট রাস্তা। সোজা বেলা ভিসটার দিকে গেছে।

রাস্তার পাশে একটা বড় সাইনবোর্ড। তাতে টকটকে লাল রঙের হাই ইনটেনসিভ রিফ্লেকটিং শীটে ইংরেজি এবং ইটালিয়ানে লেখাঃ বেলা ভিসটা। নিচে লম্বা তীর চিহ্ন। সূর্যের আলোয় চিক চিক করছে লেখাগুলো। এই পথটুকু পেরোন কষ্টকর হবে, ভাবল রানা। ফেলে আসা পথের মত সমতল নয়। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেছে এ-পথ। মোটামুটি তিন মাইলের মত চড়াই পেরোতে হবে এখন ওকে।

সোফিয়ার চিন্তায় এতই মশগুল ছিল যে এ ব্যাপারটা একবারও মনেই হয়নি রানার। এখন আর ফিরে গিয়ে গাড়ি যোগাড় করে আনাও সম্ভব নয়। ছটা কুড়ি বাজে এখন। সন্কে হতে আর বেশি দেরি নেই। উল্টো গিয়ে যতক্ষণে গাড়ি নিয়ে ফিরতে পারবে ও, হেঁটে এগোলে হয়ত তার আগেই পৌঁছে যাবে ভিলায়।

কিন্তু ব্যাপারটা বেশ কঠিন। এক মাইল যেতেই অল্প অল্প হাঁপ ধরে গেল। ঘামতে লাগল রানা। কোথায় সোফিয়া, এখনও ঘুমিয়ে আছে? ভাবতে ভাবতে আরও আধমাইল চড়াই অতিক্রম করল। এই সময় দূরে আকাশের গায়ে হঠাৎ করেই ভেসে উঠল বেলা ভিসটা। চূড়ার সামান্য নিচে, এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে দোতলা ভিলাটা।

অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। মুগ্ধ বিশ্বয়ে বলে উঠল,

‘চমৎকার!’ রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছে আবার তাকাল।

সূর্যের আলোয় নীল আকাশের গায়ে জ্বল জ্বল করে ফুটে আছে মনোরম বেলা ভিসটা। দৃশ্যটা এতই মনোমুগ্ধকর যে চোখ ফেরানোই দায়। মনে মনে সোফিয়ার রুচির প্রশংসা করল রানা। সেই সাথে আরও দ্রুত পা চালাবার তাগিদ অনুভব করল। সোফিয়ার দেখা না পাওয়া পর্যন্ত ভারমুক্ত হতে পারছে না।

ভিলার কোমর সমান লোহার গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইটালিয়ান পোস্টাল সার্ভিসের পেটমোটা একটা ডাকবাক্সের সঙ্গে হেলান দিয়ে হ্য হ্য করে হাঁপাল রানা খানিক। তারপর আরেকবার ঘাম মুছে নিয়ে পা বাড়াল।

গেট থেকে ভিলা পর্যন্ত চওড়া ড্রাইভ। চক চকে কালো বিটুমিনাস সারফেস—মসৃণ। দুপাশে ছফুট উঁচু ডালিয়ার ঝাড়, ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে চূড়া। হাজারো বর্ণের ফুল রয়েছে ওর মধ্যে। কিন্তু ওসব নিয়ে ভাববার সময় পরে পাওয়া যাবে। দ্রুত এগোল রানা।

ভিলার সাথেই বড়সড় গ্যারেজ। গেট খোলা। রানার দিকে ড্যাবডেবে দুচোখ মেলে চেয়ে আছে ঝকঝকে নতুন একটা লিঙ্কন কনভার্টিবল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, ভিলাতেই আছে তাহলে সোফিয়া।

তাড়াতাড়ি ভিলার চওড়া বারান্দায় উঠে এল। সামনের দরজাটা খোলাই দেখা যাচ্ছে। ওটা পেরিয়ে বিশাল হলরুমে এসে দাঁড়াল রানা। ‘সোফিয়া!’

ওর হাঁকটা দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ভিলাময়। কিন্তু কোন জবাব এল না।

ভিক্ত অবকাশ-১

‘সোফিয়া!’

ধীর পায়ে নিচতলার সবগুলো রুম ঘুরে ঘুরে দেখল রানা। লাউঞ্জটা প্রকাণ্ড, সঙ্গে আছে ডাইনিং রুম অ্যালকোভ। তার ওপাশে কিচেন এবং পিছনদিকে আরেকটা বারান্দা। বে অভ সরেনটো দেখা যায় ওখান থেকে, ভিলার দুশো গজমত নিচে। দোতলায় তিনটে বেডরুম, দুটো বাথরুম এবং একটা বুল বারান্দা রয়েছে। সবকিছু চমৎকার রুচিসম্মতভাবে সাজানো গোছানো।

বেরিয়ে এল রানা ভিলা থেকে। বোঝা গেছে, ভেতরে নেই সোফিয়া। নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও আছে। হাঁটতে হাঁটতে পিছনদিকে চলে এল ও। সরু আরেকটা পাকা রাস্তা দেখা গেল। দুপাশের কমলালেবু, আঙুর ইত্যাদির বাগানের ভেতর দিয়ে উঠে গেছে চূড়ার দিকে।

এদিকেই আছে কোথাও সোফিয়া, ভাবল রানা। হঠাৎ কিচেন থেকে ঝন ঝন করে কিছু একটা আছড়ে পড়ার আওয়াজ উঠতে ঘুরে দাঁড়াল। একদৌড়ে ঢুকল এসে ভিলায়। লাউঞ্জ পেরিয়ে কিচেনে পা রেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। মার্বেল পাথরের ফ্লোর ডেসে যাচ্ছে কি এক ঘোলাটে তরল পদার্থে—চিকেন সুপ, নাকে গন্ধ যেতে বুঝল ও।

মানুষের সাড়া পেতেই কুচকুচে কালো নাদুস নুদুস একটা বেড়াল ছুটে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। দেয়াল ঘেঁষে রাখা সাইডবোর্ডের ওপর ঢাকা দেয়া ছিল স্টীলের বড় একটা বাউল। উল্টে দিয়েছে ওটা বেড়াল মহাশয়, সোফিয়ার কাজ বাড়িয়েছে। হাত দিয়ে দেখল রানা এখনও অল্প অল্প গরম আছে বাউলটা।

ফিরে এল রানা। হাতের ট্যুরিস্ট গাইডটা লাউঞ্জের সেন্টার

টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে এল ভিলা থেকে। পিছনের সরু রাস্তাটা ধরে হেঁটে চলল। বাগানের ভেতর দিয়ে সিকি মাইলখানেক এগিয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই এক দেড়শো গজ নিচে আরেকটা প্রকাণ্ড ভিলার ওপর চোখ পড়ল ওর। এ মুহূর্তে ওটার প্রায় মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা।

সেদিন সোফিয়া এই ভিলার কথাই বলেছিল নিশ্চয়ই। কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকল ও। কোনদিক থেকেই ওটায় পৌঁছানোর কোন রাস্তা চোখে পড়ল না। আরও ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝল রানা, আসলে একমাত্র সাগরপথেই ওখানে পৌঁছবার ব্যবস্থা করেছে ভিলার মালিক। অন্য কোন পথ নেই। থাকলে ওপর থেকে অবশ্যই চোখে পড়ত।

বে অভ সরেনটোর তীর কেটে ভিলা পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে একটা প্রাইভেট হারবার, দু তিনশো গজ লম্বা। একসার চওড়া পাথরের সিঁড়ি ভিলা থেকে নেমে গেছে হারবারে, ছোট্ট এক পল্টুন পর্যন্ত। দুটো শক্তিশালী মোটর-বোট বাঁধা আছে তাতে।

হাঁটতে হাঁটতে শেষবারের মত ভিলাটার দিকে চাইল রানা। সামনের লনে লাল রঙের প্রকাণ্ড একটা ছাতা। পাশেই বড় একটা টেবিল এবং কয়েকটা লাউজিং চেয়ার খালি পড়ে আছে। কোথাও মানুষজনের কোন ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না অতবড় ভিলাটায়।

আরেকটা বাঁক ঘুরতেই ওটা চোখের আড়ালে চলে গেল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ডানে-বাঁয়ে নজর রেখে দ্রুত এগোতে লাগল ও। ঘড়ি দেখল—আটটা দশ বাজে। পশ্চিম দিগন্তে প্রকাণ্ড এক গামলার মত ঝুলে আছে গাঢ় কমলা রঙের সূর্যটা, ডুবতে দেরি নেই। গাছে গাছে পাখি ডাকছে, ফিরে আসতে শুরু করেছে তিস্ত অবকাশ-১

তারা নিজ আলয়ে ।

আচমকা থমকে দাঁড়াল রানা । কয়েকগজ সামনে কালোমত কিছু একটা পড়ে আছে পথের ওপর । জিনিসটা চিনতে সময় লাগল না ওর—সোফিয়ার পেইলারড বোলেব্রের চামড়ার কেস ওটা । অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল রানার । এক পা এক পা করে কাছে এসে কেসটা তুলে নিল ও । শূন্য কেস, ক্যামেরাটা নেই ।

শুয়োরের চামড়ার সুদৃশ্য কেসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল রানা । এটা এখানে পড়ে কেন? ভাবল ও ।

‘সোফিয়া!’

প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে আসছে ওর ডাকটা । কিন্তু উত্তর এল না । এদিকেই যে এসেছে সোফিয়া, এখন আর কোন সন্দেহ নেই তাতে । কিন্তু উত্তর দিচ্ছে না কেন তাহলে? সোজা সামনে সাগর দেখা যাচ্ছে, তার মানে চূড়ায় পৌঁছে গেছে ও প্রায়, পথ খুব একটা বাকি নেই । তাহলে?

আবার পা বাড়াল রানা, এবার দ্রুত । পঞ্চাশ কদম যেতেই ডানে বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা হঠাৎ করেই, এবং শেষ হয়ে গেছে আচমকা, শূন্যে । জায়গাটা অনেকটা সাপের ফণার মত । রানা যেখানটায় দাঁড়িয়ে, ওটা একটা ওভারহ্যাঙ—ঝুলে আছে শূন্যে । পাহাড়ের পেটটা এখান থেকে ঝপ করে নেমে গেছে নিচে, খাড়াভাবে ।

কিনারায় দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি দিল রানা । খুব বেশি হলে দেড়শো ফুট নিচেই সাগরতট । অসংখ্য দৈত্যাকার বোল্ডার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বালুকাবেলায়—অর্ধেকটা তলিয়ে আছে

পানিতে । মৃদু ঢেউ আছড়ে পড়ছে এসে তাদের গায়ে । সাবধানে
আরও ছ'ইঞ্চি এগোলো রানা ।

পরক্ষণেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ওর । জমে গেল মূর্তির মত ।
দুটো বোল্ডারের ফাঁকে যেন ভাঙাচোরা একটা পুতুল আটকে
রয়েছে—ফর্সা মুখটা চেয়ে আছে সরাসরি ওরই দিকে । প্রথমে
দুটো বিট মিস করল হুথপিঙটা, তারপরই লাফিয়ে বেরিয়ে আসার
জন্যে ক্রমাগত গুঁতো মারতে লাগল রানার বুকের খাঁচায় ।

সোনালি চুলগুলো ছড়িয়ে আছে পানিতে, চিক চিক করছে
সূর্যের আলোয় । সাদা স্কাট এবং কচি কলাপাতা রঙের ব্লাউজ পরে
আছে মেয়েটি । ফুলে আছে স্কাটের খানিকটা জায়গা, বাতাস
আটকে গেছে ওখানটায় ।

পুতুল নয়, ওটা সোফিয়া শেরম্যান । পড়ে আছে তার লাশ!

ছয়

ধীরে ধীরে দম ছাড়ল মাসুদ রানা । নড়ছে না একচুল । বিস্ফারিত
চোখ । হঠাৎ করেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল, পা কাঁপছে অল্প
অল্প । কিন্তু ভাবতে পারছে না ও । কি করে পড়ল সোফিয়া? মরে
গেছে সত্যি সত্যি, না এখনও বেঁচে আছে? চট করে বসে পড়ল
রানা, পরিস্থিতি ভাল করে বোঝার জন্যে দুহাতে ক্রিফের কিনারা
ডিঙ অবকাশ-১

আঁকড়ে ধরে ঝুঁকে বসল। ভীষণভাবে ঘামতে শুরু করেছে।
ধড়ফড় করছে বুক।

‘সোফিয়া!’ ডাকতে গিয়ে বুঝল রানা স্বর ফুটছে না। কেশে
গলা পরিষ্কার করে আবার ডাকল, ‘সোফিয়া!’ পাহাড়ের খাড়া
শরীরে আঘাত খেয়ে চতুর্ভুজ হয়ে নেচে বেড়াতে লাগল নামটা।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। যতদূর পারা যায়, নিজেকে
সামনের দিকে এগিয়ে দিল। বুক এবং পেটের প্রায় সবটুকুই
শূন্যে ঝুলছে এখন। হঠাৎ করেই অসুগামী সূর্যকে ঘিরে ঘন, ছাড়া
ছাড়া মেঘ জমতে শুরু করেছে আকাশে। তেমন ভাল করে দেখা
যাচ্ছে না নিচের দৃশ্য।

উচ্চতা সম্পর্কে প্রথমে রানা যা ধারণা করেছিল, তা ভুল ছিল।
আরও অনেক বেশি হবে, বুঝল ও, কম করেও দুশো ফুট। এখান
থেকে ওই বোল্ডারের ওপর আছড়ে পড়ার ব্যাপারটা কি ভয়ঙ্কর,
কল্পনা করে শিউরে উঠল। আড়াল সরে যেতে বেরিয়ে এল সূর্যের
আলো। সার্চলাইটের মত লাল আলোর মোটা একটা স্তম্ভ সরাসরি
এসে পড়ল সোফিয়ার ওপর।

এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। চকের মত সাদা হয়ে
আছে সোফিয়ার মুখটা। মাথার চারদিকের পানিতে গাঢ় কালচে
রঙের কি যেন ভাসছে।

রক্ত!

ব্যস্ত হয়ে আরও এক ইঞ্চি এগোলো মাসুদ রানা। দুনিয়ার
কোনদিকে খেয়াল নেই। নিচের ওই নিখর দেহটা ছাড়া এ মুহূর্তে
আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই ওর কাছে। হঠাৎ ধড়াশ করে লাফ
দিল রানার কলজেটা—একটু একটু নড়ছে সোফিয়া! ভুলটা ভাঙল

পরক্ষণেই। আসলে বে অভ সরেনটোর মৃদু ঢেউয়ের জন্যে ঘটছে ব্যাপারটা। ঝাড়া দশ মিনিট হাঁ করে চেয়ে থাকল সেদিকে।

একটু একটু করে পিছিয়ে এল মাসুদ রানা, উঠে দাঁড়াল। ব্যাপারটা নিয়ে একটু মাথা ঘামাতে চাইল, কিন্তু ব্রেন কাজ করছে না। অভাবনীয় আঘাতটা এখনও মেনে নিতে পারছে না ও। চোখেমুখে অন্ধকার দেখছে। আচমকা উচ্চকণ্ঠের হো হো হাসি কানে যেতে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, পরিবেশ সম্পর্কে পলকে সজাগ হয়ে উঠল।

একটা খুদে জেলে নৌকার ওপর চোখ পড়ল। মাঝবয়সী দুই জেলে বসে আছে দুই গলুয়ে। তীর থেকে বড়জোর একশো গজ দূরে রয়েছে ওটা, মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে গভীর পানির দিকে। মাথা নিচু করে টানটান হয়ে পড়ে রইল রানা কিছুক্ষণ। ওদের কেউ মুখ তুলে তাকালেই আকাশের পটভূমিতে দেখতে পাবে ওকে পরিষ্কার।

একটু পর পিছিয়ে এসে উঠে বসল রানা। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল চট করে, আটটা বেজে বারো মিনিট। কতক্ষণ আগে মারা গেছে সোফিয়া? এক ঘন্টা? দু' ঘন্টা? না কি তারও আগে? এখুনি পুলিশে টেলিফোন করা দরকার, উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবল ও। পুরোপুরি রাত হওয়ার আগেই পৌছে যেতে পারবে ওরা যদি তাড়াতাড়ি করে। নিচে নেমে...

অনিশ্চিত, কাঁপা কাঁপা পায়ে দুকদম এগিয়েই থেমে পড়ল রানা। পুলিশ? না, পুলিশ ডাকা চলবে না। মাথা দোলাল রানা, ব্যাপারটা নিয়ে আগে আরও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়। পুলিশ এলে প্রথম চোটে ওকেই ধরবে, কোন সন্দেহ তিষ্ঠ অবকাশ-১

নেই।

খোঁজ নিলেই জেনে যাবে ওরা যে তিনদিনের জন্যে বেলা ভিসটা ভাড়া নিয়েছে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস রবার্ট হুইটনি। কেন? না, উইক এণ্ড যাপন করার জন্যে। ভিলার মালিক যখন মৃত সোফিয়াকে সনাক্ত করবে মিসেস হুইটনি বলে, তখনই প্রশ্ন উঠবে ছদ্মনাম কেন, এবং মিস্টারটা কে? রানা যদি বলে, জানি না, জানতে চাওয়া হবে, তাহলে আপনি কে? এবং আপনি এখানে কি করছিলেন? সরেনটোয় কেন আপনি?

এর ফলাফল কি হবে? ইটালিয়ান পুলিশের দক্ষতার অভাব নেই, আজ না পারলেও কাল ঠিকই সোফিয়ার আসল পরিচয় বের করে ফেলবে ওরা। এবং তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিউ ইয়র্ক পৌঁছে যাবে খবরটা, জেনে যাবেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। কি হবে তখন? দুনিয়াসুদ্ধ প্রচার হয়ে যাবে...না, তা হতে দেবে না মাসুদ রানা।

একা হলে হয়ত একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখা যেত। কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয়, কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে পিটার লারসেনের ভবিষ্যৎ। ও জানে সাংবাদিকতাই তার জীবন, তার সাধনা। তারওপর সামনেই প্রমোশন—সব স্বপ্ন, সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হয়ে যাবে তার শেরম্যানের কোপদৃষ্টিতে পড়লে।

বন্ধু হয়ে বন্ধুর এতবড় সর্বনাশ হতে দিতে পারে না মাসুদ রানা। অসম্ভব, জীবন থাকতে নয়। কি করা যায় এখন? দ্রুত ভাবতে লাগল ও। সরে পড়তে হবে। হ্যাঁ, ডাবল রানা, কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই সরে পড়তে হবে ওকে এখান থেকে। সময়টা এখন প্রাইম ফ্যাষ্টর। এখানে রানাকে কেউ আসতে

দেখেনি। কেউ বলতে পারবে না যে সোফিয়া শেরম্যানের মৃত্যুর সময় এখানেই ছিল ও। কাজেই এখানে ওর উপস্থিতির ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার আগেই সরে পড়া উচিত। নইলে জড়িয়ে পড়বে ও। বিচ্ছিরি কেলেক্কারি ঘটে যাবে।

এখন বরং রানাকে প্রমাণ যোগাড় করার চেষ্টা করতে হবে যে আজ, এই মুহূর্তে রোমেই ছিল ও। অন্য কোথাও নয়। তদন্ত শুরু হলে এ সব প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে। অতএব, তার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে রানাকে। সম্ভবত আগামীকালকের মধ্যেই পুলিশের মুখোমুখি হতে হবে ওকে। জানা কথা, সোফিয়ার পরিচয় উদঘাটন হওয়ামাত্র নিউ ইয়র্ক ভিশনের অফিসে যোগাযোগ করবে ওরা। সোফিয়া সম্পর্কে যতটা পারা যায়, তথ্য আদায় করার চেষ্টা করবে রোম ব্যুরো চীফের কাছ থেকে।

সেটাই স্বাভাবিক। এবং যেহেতু আসল ব্যুরো চীফের পাত্তা নেই, সেহেতু নিঃসন্দেহে নকলজনকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। প্রায় চমকেই উঠল রানা আরেকটা সম্ভাবনার কথা মনে জাগতে। মেয়েটার পরিচয় পুলিশ জানা মানেই ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের জেনে যাওয়া।

কি করবেন তিনি মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে? ছুটে আসবেন রোমে? অবশ্যই আসবেন। না কি, বাপ সম্পর্কে মেয়ের ধারণা যদি সত্যি হয়ে থাকে; সোফিয়ার হাত থেকে চিরদিনের জন্যে রেহাই পাওয়া গেছে ভেবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন, রোম আসার কষ্ট স্বীকার করবেন না।

উহঁ! মনে হয় না। হাজার হোক মেয়ে, আপন সন্তান। এ খবর পেলে কোন পিতা পারবে না এসে? তার মানে ফেঁসে যাচ্ছে

লারসেন। সে যখনকার ব্যাপার তখন দেখা যাবে, মাথা ঝাড়া দিয়ে এসব চিন্তা দূর করে দিতে চাইল মাসুদ রানা। সময় নষ্ট হচ্ছে এতে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা কেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল শেষ মুহূর্তে। হাতের ছাপ রয়েছে ওতে রানার। পকেট থেকে রুমাল বের করল ও তাড়াতাড়ি। সতর্কতার সাথে ভাল করে ডলে ডলে কেসটা মুছল। একবার নয়, তিন-চারবার। তারপর ক্রিফের কিনারাঘেঁষে ফেলে দিল নিচে।

এবার দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল রানা, ফিরে চলল ব্যস্ত পায়ে। মনের মধ্যে একটাই কেবল চিন্তা, রোম পৌঁছুতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। হাঁটতে হাঁটতে দ্বিতীয় ভিলাটার ওপর এক পলক নজর বুলিয়ে নিল ও। আগের মতই জনশূন্য। তবে তিন-চারটে রুমে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে এখন। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে প্রায় দৌড়ে নামতে লাগল রানা।

সোফিয়াকে ফেলে চোরের মত পালিয়ে যেতে হচ্ছে ভেবে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু কাজটা ওকে অনেকদিক ভেবেচিন্তেই করতে হচ্ছে, নিজেকে বোঝাল ও। লারসেনের চিন্তা না থাকলে এ কাজ করার কথা এমনকি কল্পনাতেও ঠাই দিত না ও।

আগে পুলিশ-ই উদ্ধার করুক সোফিয়ার মৃতদেহ, ভাবছে রানা। যদি মৃত্যুটা দুর্ঘটনাজনিত হয়ে থাকে, তাহলে তো চুকেই গেল। আর যদি তা না হয়ে থাকে, যদি কেউ হত্যা করে থাকে ওকে...থেমে গেল রানা। দূর! কি আবোল-তাবোল ভাবছে সে এসব? কে সোফিয়াকে খুন করতে যাবে?

এটা দুর্ঘটনা না হয়েই যায় না। হয়ত বেশি কিনারায় গিয়ে

দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, হঠাৎ করে পড়ে গেছে পা ফসকে। কিন্তু ওর ক্যামেরা কেসটা পথের মাঝে পড়ে ছিল কেন তাহলে? আবার মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যেতে শুরু করল।

ততক্ষণে বাগানের গেটের সামনে পৌঁছে গেছে রানা। আরেকবার ঘড়ি দেখল। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটা। পথে কোন বিঘ্ন না ঘটলে ভোর তিনটে নাগাদ রোম পৌঁছে যেতে পারবে ও। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এখন একটা অ্যালিবাই খাড়া করার কথা চিন্তা করতে হবে, ভাবল রানা। নিশ্চিহ্ন একটা অ্যালিবাই, যা মিথ্যে প্রমাণ করতে পারবে না কেউ।

হেঁটে সরেনটো ফিরতে হবে ভাবতেই আফসোস হল। সঙ্গে যদি গাড়ি থাকত! চাইলে অবশ্য সোফিয়ার লিঙ্কন কনভার্টিবলটা নিয়ে যেতে পারে ও, অন্তত সরেনটো পর্যন্ত। তারপর ট্রেন ধরবে। কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করে দিতে হল। ওরকম ঝকঝকে নতুন গাড়ি নিয়ে পথে বেরোনো মোটেই উচিত হবে না। ও গাড়ি মানুষের নজর কাড়বেই। সেই সাথে তার চালকের দিকেও এক পলক তাকাতে ভুল হবে না কারও। তারচেয়ে হেঁটে যাওয়াই অনেক নিরাপদ।

নেপলস-এর শেষ ট্রেন ক'টায় ছাড়ে সরেনটো থেকে, কে জানে! যদি পাঁচ মাইল পথ হেঁটে গিয়ে শোনে রাতে আর কোন গাড়ি নেই? ও পৌঁছার খানিক আগেই ছেড়ে গেছে? ঘুরে ভিলার সামনে চলে এল মাসুদ রানা। তেমনি দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। লোভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ও কিছুক্ষণ সেদিকে। সোফিয়ার হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটা মনে পড়ে গেল। আবার খারাপ হয়ে গেল মন। কেন এসেছিল ওরা, আর কি ঘটে গেল।

অন্ধকারে ডুবে থাকা নিখর বেলা ভিসটার দিকে শেষবারের মত ঘুরে তাকাল রানা, এবং সাথে সাথে একটা বিস্ময়ের ধাক্কা খেল।

টর্চ লাইট!

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল ও, ভুল দেখল না তো? চিন্তাটা শেষ হওয়ার আগেই আবার দেখা গেল আলোটা—সেকেণ্ডের দশভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে। লাইটটা যার হাতেই থাকুক, লাউঞ্জের রয়েছে সে এ মুহূর্তে। যা-ই করুক না কেন, খুবই সতর্কতার সাথে করছে। খোলা জায়গায় জমে গেছে রানা, নড়ছে না এক চুল। মাথার মধ্যে চিন্তা চলছে ঝড়ের বেগে।

এ মুহূর্তে কেউ দেখতে পাবে না ওকে ভিলা থেকে। চারদিক একে অন্ধকার, তারওপর রানার পিছনে রয়েছে ঘন ডালিয়ার ঝাড়। কাজেই আত্মগোপন করার কোন প্রয়োজন নেই। আবার পলকের জন্যে জ্বলে উঠেই নিভে গেল টর্চ।

কে ও? একটু এপাশে সরে এসে খোলা জানালা দিয়ে লাউঞ্জের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু ততক্ষণে নিজের অবস্থান থেকে সরে গেছে লোকটা। পরেরবার আলো জ্বলল অন্য জায়গায়। এগোবে কি না ডাবল ও। কিন্তু তা না করে বরং পিছিয়ে এল, পাকা ড্রাইড ছেড়ে ঢুকে পড়ল ফুলের বাগানে। বড় একটা হাইড্রেনজা ঝোপ দেখতে পেয়ে বসল তার আড়ালে। ভিলা গাড়ি সব পরিষ্কার দেখা যায় এখান থেকে।

একটু একটু করে সাহস বাড়ছে যেন ভেতরের লোকটির। আলোটা এখন দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে, এবং ঘন ঘন জ্বলছে। অস্থির আলোটার মতিগতি দেখে মনে হল, ব্যস্ত হয়ে কিছু একটা খুঁজছে

অনুপ্রবেশকারী। চোর-টোর নয়তো? ভাবল ও। উঠে গিয়ে ব্যাটার চেহারাটা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব, কিন্তু ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে ভেবে বসেই থাকল রানা।

পাঁচ মিনিট পর নিভে গেল আলোটা। আর জ্বলছে না। মিনিট খানেক নীরবে পেরিয়ে যেতে অস্থির হয়ে উঠল ও। চলে গেল নাকি লোকটা অন্য কোন রাস্তা দিয়ে? এই সময় হঠাৎ করেই একটা দীর্ঘ ছায়া চোখে পড়ল। সামনের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে ছায়াটা, রানার দশ-বার গজের মধ্যে। অস্পষ্টভাবে শুধু তার কাঠামোটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা।

এক মুহূর্ত স্থির থেকে নেমে এল লোকটা, ঘুরে গ্যারেজের দিকে চলল। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে উঁকি দিল লিঙ্কনের ভেতরে। টর্চটা আবার জ্বালল সে। কিন্তু এ দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বলে ব্যাটার চেহারা দেখতে পেল না রানা।

মাথায় কালো স্কাউচ হ্যাট পরে আছে লোকটা। অবাক হল ও ব্যাটার মোষের মত চওড়া কাঁধ দেখে। কে ও? কি খুঁজছে হন্যে হয়ে? সোফিয়ার কাছে কি এমন থাকতে পারে যা তার প্রয়োজন?

এক মিনিট পর আলো নিভিয়ে সিঁধে হল প্রকাণ্ডেহী। পায়ে পায়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল একেবারে রানার পাঁচ গজের মধ্যে। টর্চলাইটটা বাঁ বগলে চেপে ধরে হ্যাট নামিয়ে প্রথমে কপালের ঘাম মুছল রুমাল দিয়ে। তারপর চূলে আঙুল বোলাতে লাগল চিকুনির মত করে। ভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন, অথবা দুশ্চিন্তায়। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চেয়ে আছে রানা।

হঠাৎ করেই বিলি কাটা বাদ দিয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল তিক্ত অবকাশ-১

লোকটা, ঘুরে দাঁড়াল। রানার ধারণা ছিল ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে সামনের গেট দিয়ে। কিন্তু তা না করে ভিলার পিছনদিকে চলল সে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

অবাক হল মাসুদ রানা। ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ব্যাটা? তাকে অনুসরণ করার ইচ্ছেটাকে জোর করে গলা টিপে মারল রানা। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। তা করতে গেলে হয়ত রাত থাকতে রোম পৌছানো সম্ভব হবে না। অথচ ওটাই এখন সবচেয়ে বেশি জরুরী। লোকটা ফিরে আসে কি না, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ঝাড়া পাঁচ মিনিট বসে থাকল রানা।

কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ নেই দেখে উঠল। দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে ড্রাইভ পেরিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ঢালু রাস্তা দিয়ে প্রায় দৌড়ের মত হেঁটে চলল। সরেনটো পর্যন্ত দীর্ঘ পথ লোকটা ওর মন জুড়ে থাকল। সত্যিই চোর? নাকি সোফিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক ছিল তার? উত্তরটা অজানাই থেকে গেল।

দশটা দশ মিনিটে সরেনটো রেল স্টেশনে পৌঁছুল ও। খানিকটা দৌড়ে, খানিকটা হেঁটে, আবার দৌড়ে পথটুকু অতিক্রম করেছে রানা। কিন্তু বৃথা। নেপলস-এর শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে আরও দশ মিনিট আগেই, দশটায়। নিজের কপালকে বেছে বেছে গোটাকয়েক অশ্লীল গাল দিল রানা। সেই সাথে ইটালিয়ান রেল সার্ভিসকেও।

‘শালারা!’ গজগজ করতে লাগল ও, ‘আসার সময় পুরো বিশ মিনিট লেট করতে পেরেছিলে। যাওয়ার বেলায় এত পাণ্ডুয়ালা না হলে আর চলছিল না?’

কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এগারটা পনেরয় নেপলস-রোম শেষ এক্সপ্রেস ছেড়ে যাবে। অর্থাৎ, ওটা ধরতে হলে যে করেই হোক, ঠিক এক ঘন্টা পাঁচ মিনিটের মধ্যে নেপলস স্টেশনে পৌঁছতে হবে ওকে। তার আগে রসিদ দেখিয়ে ব্রিফকেসটা ছাড়িয়ে নিতে হবে লেফট লাগেজ অফিস থেকে।

রিসিভিং কাউন্টারে দাঁড়াবার আগেই দূর থেকে জানালার নেটের ভেতর দিয়ে রুমের মধ্যে নজর বুলিয়ে নিয়েছে ও। দুপুরের সেই কেরানি রয়েছে একা। কোন কারণে মেজাজ চড়ে আছে লোকটার, বকর বকর করছে আপনমনে। হ্যাটটা ভুরু পর্যন্ত টেনে নিয়ে এল রানা, মাথা নিচু করে রসিদটা এগিয়ে দিল। ওর দিকে চেয়ে দেখবার গরজ দেখাল না লোকটা। দয়া করে রসিদের ওপর আধ পলক নজর বুলিয়েই ঘুরে দাঁড়াল, পনের সেকেণ্ড পর ব্রিফকেসটা এনে দড়াম করে আছড়ে রাখল জানালার নিচের বড় ফোকরটার সামনে।

ওটা নিয়ে স্টেশনের অঙ্ককার কার পার্কে এসে দাঁড়াল রানা। একটাই মাত্র ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। সামনের সিটে বসে ঝিমুচ্ছে ড্রাইভার। পিছনে রানা উঠে বসেছে টেরই পেল না লোকটা। দরজাটা সশব্দে বন্ধ হওয়ার শব্দে উঠে বসল সে ধড়মড় করে। ব্যস্ত হয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল, শব্দ কোথায় হল বোঝার চেষ্টা করছে।

পিছন থেকে রানার গম্ভীর, ভরাট গলার আওয়াজ কানে যেতে ঝট করে ঘুরে তাকাল লোকটা। বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না রানা তাতে। ও নিশ্চিত, ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছে না ড্রাইভার।

‘ডবল ভাড়া,’ বলল রানা। ‘যদি সোয়া এগারটার মধ্যে তিষ্ঠ অবকাশ-১

নেপলস রেল স্টেশনে পৌঁছে দিতে পার। সেই সাথে পাঁচ হাজার নিরা টিপস।’

ইটালিয়ান ড্রাইভারদের মত খেপা, পাগলাটে এবং বিপজ্জনক ড্রাইভার পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ তাদের কাছে খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু, খেলাটা একটু সাবধানে খেলতে হবে, এই যা। এক্ষেত্রে গাড়ি স্টার্ট নেবার পর চ্যালেঞ্জকারীকে দুটো কাজ করতে হবে। এক, চোখ বুজে শক্ত হয়ে বসে থাকা; এবং দুই, অনবরত প্রার্থনা করা।

শান্তভাবে মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকাল ড্রাইভার, নড়েচড়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল। তারপর এক ঝটকায় স্টার্টের বাটনটা টিপে দিয়েই ঠেলে দিল গিয়ার স্টিক, সেই সাথে বন্ বন্ করে ঘোরাতে শুরু করল স্টিয়ারিং হুইল। পুরো স্টেশন এলাকা কেঁপে গেল ট্যাক্সির আচমকা বিকট হুঙ্কারে। কান ফাটানো তীক্ষ্ণ আওয়াজের সাথে রাস্তায় টায়ারের এক পাল্লা ছাল-চামড়া রেখে দিয়ে কামানের গোলার মত বিদ্যুৎবেগে স্টেশন চত্বর ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল ট্যাক্সিটা বাঁ দিকের দুচাকায় ভর দিয়ে। পরমুহূর্তেই ঝটকা মেরে সিধে হল, দড়াম করে আছড়ে পড়ল ভাসমান চাকা দুটো। প্রায় ট্রাফিকবিহীন পথ ধরে ছুটল হাঁ হাঁ করে।

সরেনটো-নেপলস হাইওয়ের প্রথম বারো মাইল রাস্তা আঁকাবাঁকা, সরু। ঠিক যেন কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে প্রকাণ্ড এক পাইথন। জানা ছিল না রানার ব্যাপারটা। চোখ কপালে তুলে সামনের দিকে চেয়ে আছে ও। অগণিত হেয়ারপিন বেগু পলক পড়ার আগেই সাঁই সাঁই করে পেরিয়ে চলেছে ট্যাক্সি। অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে ঘন ঘন বাঁক নিচ্ছে ডানে-বাঁয়ে, এবং প্রতিবারেই

উল্টে পড়তে পড়তেও একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিচ্ছে নিজেকে। আবার লেজ দাবিয়ে ভাগছে সন্ত্রস্ত শেয়ালের মত।

সামনে সিটের পিছনে পা বাধিয়ে দুহাতে দুই দরজার হাতল আঁকড়ে ধরে বসে আছে মাসুদ রানা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। প্রতিটি বাঁক নেবার সময় তীব্র আতঙ্কে ঘাড়ের খাটো চুলগুলো সর-সর করে দাঁড়িয়ে পড়ছে ওর শজারুর কাঁটার মত। অথচ ড্রাইভার ব্যাটা সম্পূর্ণ নির্বিকার, উদ্বেগহীন। এমনভাবে গাড়ি চালাচ্ছে, যেন এর মত সরলসোজা মসৃণ পথ আর হয় না। বাঁক নেবার সময় হর্ন চেপে ধরে রাখছে লোকটা, অনবরত হেড লাইট ডিপ-হাই করছে, এবং অবলীলায় পেরিয়ে যাচ্ছে বাঁকটা।

প্রতিবারই মনে হয় রানার, এই-ই শেষ! সামনের ওই বাঁকটাই ওদের আজরাইল। ওটা নিরাপদে পেরিয়ে এলে ভাবে, তাহলে পরেরটা নিশ্চয়ই। দুঃস্বপ্নের ইতি ঘটল এক সময়। হাইওয়ে ছেড়ে নেপলসগামী চওড়া, অটোস্ট্রাডায় উঠে এল ট্যাক্সি। কিছুটা আশ্বস্ত হল রানা এবার। নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসল। ভাবল, শুধু ড্রাইভারের পাকা হাত আর অভিজ্ঞতাই নয়, ওদের জ্যান্ত অটোস্ট্রাডায় উঠে আসতে পারার ব্যাপারে ভাগ্যেরও উদার সহযোগিতা ছিল।

অটোস্ট্রাডায় ট্রাফিকের চাপ এ মুহূর্তে প্রায় নেই বললেই চলে। গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার নিশ্চিত মনে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে ইণ্ডিকেটরের দিকে তাকাল মাসুদ রানা, নব্বুই আর পঁচানব্বুইয়ের মাঝখানে তির তির করে কাঁপছে সরু লাল কাঁটাটা। রাস্তা ছেড়ে শূন্যে ভাসছে যেন ট্যাক্সি, সামান্যতম দুলুনিও নেই।

এগারটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে নেপলস-এর শহরতলীতে পৌছে গেল ট্যাক্সি। আরও মাইল খানেক এগোতেই মনে মনে প্রমাদ গুনল মাসুদ রানা। সামনে যতদূর চোখ যায় শুধু গাড়ি আর গাড়ি। ধীর গতিতে মিছিল করে এগোচ্ছে নেপলস-এর দিকে। জোড়া-জোড়া টেইল লাইটের লাল আভায় আকাশ উদ্ভাসিত।

মনটা দমে গেল রানার। এই জ্যাম ঠেলে এক ঘন্টার মধ্যেও স্টেশনে পৌছানো যাবে কি না সন্দেহ। জানত না, আরও চমক অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। সামনের দৃশ্য দেখে বিড়বিড় করে কি যেন বলল শুধু ড্রাইভার, আর কোন প্রতিক্রিয়া হল না তার মধ্যে।

এক মিনিট পুরো হওয়ার আগেই জ্যামের লেজ ধরে ফেলল রানার ট্যাক্সি। এই সময় ড্রাইভার লোকটা প্রমাণ করল, শুধু বিপজ্জনক আর খ্যাপা-ই নয়, আস্ত একটা বন্ধ উন্মাদ সে। তার মধ্যে মানুষের সহজাত বিচার-বিবেচনার ছিটেফোঁটাও নেই।

গতি কমানোর কোন লক্ষণই দেখল না রানা, বরং মাথনের মধ্যে গরম ছুরি চালানোর মত করে সৈঁধিয়ে দিল সে ট্যাক্সি যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড়ে। বিকট শব্দে টানা হর্ন বাজাচ্ছে, সাঁ-সাঁ করে একটার পর একটা গাড়ির পাশ কাটিয়ে ঐক্যবৈক্যে ছুটে চলেছে একই গতিতে। এমনিতে কোন ইটালিয়ান ড্রাইভার নিজের থেকে অন্যকে সাইড দেয় না, জানা আছে রানার।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটল ঠিক উল্টোটা। জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা দুপাশটা—পলকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে দেখল ও অন্যান্য ড্রাইভারদের মধ্যে, প্রাণ রক্ষার তাগিদে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল তারা। হাসি ঠেকাতে পারল না ও পলকে

পিছিয়ে পড়া লোকগুলোর মুখে অনাবিল প্রশান্তির ছাপ দেখে, পাগলটাকে পথ করে দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পেরে নিশ্চয়ই নিজেদের ধন্য মনে করছে তারা।

চারদিকে চিৎকার চেষ্টামেচি আচমকা ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজ এবং নিজেরটার সাথে আরও অসংখ্য নির্যাতিত টায়ারের করুণ আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না রানা। হাইওয়ে পুলিশ এখনও কোন তৎপরতা দেখাচ্ছে না কেন ভেবে পেল না। বোধহয় ঝুঁকি নিতে চাইছে না। এর মত উন্মাদ কেউ নেই নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে। কে চাইবে এমন খ্যাপা ষাঁড়ের গতিরোধ করতে গিয়ে জীবনের ওপর ঝুঁকি নিতে?

যেভাবে সরেনটো স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেই একইভাবে উল্কার মত নেপলস স্টেশন চত্বরে এসে ঢুকল ট্যাক্সিটা। কড়া ব্রেকের ফলে কয়েক ফুট এগিয়ে গেল স্কিড করে, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘড়ি দেখল রানা, নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট আগেই পৌঁছে দিয়েছে ওকে ড্রাইভার।

স্টার্ট বন্ধ করে পিছন ফিরে হাসল সে দাঁত বের করে। নিজের কীর্তিতে মহাখুশি। 'ভ্রমণ কেমন লাগল, সেনর?'

রানারও দাঁত দেখা গেল। 'টেরিফিক,' বলল ও। হাসল, না কি তীব্র আতঙ্কে আগে থেকেই দাঁত কপাটি লেগে গিয়েছিল বলে ওরকমটা মনে হল, ঠিক বোঝা গেল না।

সরেনটো-নেপলস ট্যাক্সি ভাড়া জানা নেই রানার। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ে দ্বিগুণ অঙ্কের লিরা গুনে ধরিয়ে দিল তার হাতে। সেই সাথে পাঁচ হাজার লিরার দুটো বিল।

'কীপ ইট,' বিল দুটো গুঁজে দিল রানা হতভম্ব লোকটির তিষ্ঠ অবকাশ-১

হাতে । ‘অ্যাও থ্যাঙ্কস ।’ হ্যাটটা আরেকটু টেনে নামিয়ে দিল
নিচে । ব্রিফকেসটা হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল । কোনদিকে না
তাকিয়ে লম্বা দৃঢ় পায়ে ব্যারিয়ার পেরিয়ে ঢুকে পড়ল প্ল্যাটফর্মে ।
তখনও ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে ড্রাইভার ।

ঠিক সময়ে ছাড়ল এক্সপ্রেস । ফাস্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের প্রকাণ্ড
কাঁচের জানালার পাশে বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছে রানা—
চিন্তিত । বাইরে অন্ধকার । দু’পাশে ফসলের মাঠের মধ্যে দিয়ে
বিদ্যুৎবেগে ছুটছে ট্রেন । জানালায় নিজের ছায়া ছাড়া আর কিছু
দেখতে পাচ্ছে না রানা ।

সোফিয়ার কথা ভাবতেই বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে
এল । একটা সিগারেট বের করে ধরাল ও । কম্পার্টমেন্টটা পুরো
খালি, আর কোন যাত্রী নেই । ফলে বেশ স্বস্তি বোধ করছে রানা ।
কিন্তু অনুভূতিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না ।

সরলরেখার মত টানা লোহার রেইলের জয়েন্টে এক্সপ্রেসের
লোহার চাকার ঘন ঘন আঘাতের ঘট-ঘটাং ঘট-ঘটাং আওয়াজটা
কেন যেন অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে । রানার মনে হল
আওয়াজটার ভেতরে ওর জন্যে কিছু একটা বার্তা আছে হয়ত ।
যেন বলতে চাইছে সামনে বিপদ! হুঁশিয়ার! সামনে বিপদ!
হুঁশিয়ার!

সাত

বাংলোর বারান্দায় হাঁটাইটি করছে মাসুদ রানা। প্রায় দুঘন্টা হয়ে গেছে রোম পৌঁছেছে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবনা-চিন্তা করতে হলে বিশ্রাম দরকার, দরকার লম্বা ঘুম। তাই দেরি না করে শুতে গিয়েছিল। কিন্তু অনেক সাধনা করেও ঘুমাতে পারেনি। থেকে থেকে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় সোফিয়া শেরম্যান।

মেয়েটি আর বেঁচে নেই, মারা গেছে, এখনও মন থেকে মেনে নিতে পারছে না রানা। কি করে চোখের পলকে উন্টে গেল পরিস্থিতি, শেষ হয়ে গেল একটা জীবন, ভাবতে অবাক লাগছে। এ মুহূর্তে যদি ফিরে আসত লারসেন-প্রিসিলা, বেঁচে যেত রানা। যে-কোন সময় হাজির হবে এখন পুলিশ। এরপর সাংবাদিক। যার-তার মেয়ে নয় সোফিয়া, ওর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে তারা।

যদি ওরা আজও না আসে, তাহলে রানাকেই সামাল দেবার চেষ্টা করতে হবে ব্যাপারটা বাধ্য হয়ে। যদিও রানা নিশ্চিত, ব্যর্থ হবেই ও এ ক্ষেত্রে। এরপর আছে ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের ধাক্কা। টিভি-রেডিও বা খবরের কাগজে মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েও নিউ ইয়র্ক বসে থাকবেন ভদ্রলোক, ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে রাজি তিষ্ঠ অবকাশ-১

নয় রানা। নিশ্চয়ই ছুটে আসবেন শেরম্যান, আসতেই হবে তাঁকে।

যদি তার আগেই লারসেন ফিরে আসে, তাহলে হয়ত সবদিক রক্ষা হবে। নইলে সব শেষ—ওর আশা-ভরসা, ভবিষ্যৎ, সব শেষ। শেরম্যানের এক তুড়িতে হাওয়ায় উড়ে যাবে।

ঘুরে-ফিরে সেই বিশালদেহী লোকটার চিন্তা আবার পেয়ে বসল রানাকে। কে ছিল লোকটা? বেলা ভিসটায় কেন গিয়েছিল সে? কি খুঁজছিল অমন ব্যস্ত হয়ে? সত্যিই চুরির উদ্দেশ্যে গিয়েছিল, না কি...আর কি হতে পারে ভেবে পেল না রানা। হঠাৎ করেই দ্বিতীয় ভিলাটার কথা মনে পড়ল। কে বা কারা থাকে ওটায়? লোকটা পিছনের পথ ধরে কোথায় গেল? ওই ভিলাতেই কি?

পর পর তিনটে সিগারেট ধ্বংস করল রানা। ঘড়ি দেখল, সবে সোয়া পাঁচটা, ভোর হতে এখনও অনেক দেরি। আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক, ঘুম আসে কি না। ফিরে এসে শুয়ে পড়ল রানা।

সাড়ে দশটায় ঘুম ভাঙল ওর টেলিফোনের আওয়াজে। ‘হ্যালো, রানা,’ বলল টনি আমান্দো। ‘আর কত দেরি? চলে এস, আমরা সবাই বসে আছি তোমার অপেক্ষায়।’

‘সরি, ভাই,’ তার মাছ ধরতে যাওয়ার প্রস্তাবটার কথা মনে পড়ে গেল রানার চট করে। ‘মাথা ভীষণ ব্যথা করছে। আজ আর বাইরে যাব না ভাবছি। তোমরা চলে যাও।’

‘ও. কে,’ টেনে টেনে বলল টনি। ‘ব্যথা কি খুব বেশি?’

‘না, তেমন কিছু নয়। ও মাঝে মাঝেই হয়।’

‘অল রাইট । দেখি, রাতে তোমার ওখানে আসা যায় কি না ।’
ও হ্যাঁ, ওদের খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও?’

‘নাহ্!’

‘আমার মনে হয় এসে পড়বে আজ ।’

‘তাহলে বেঁচে যাই ।’

‘ও. কে, দেন । সী ইউ ।’

রিসিভার রেখে বাথরুমের উদ্দেশে পা বাড়াল রানা । মাঝপথে গিয়ে ফিরে এল আবার । লিজা ভ্যালিটিকে একটা ফোন করতে হবে । টনির মত ও-ও জানুক, রোববার ভোরে নিজের বাংলোতেই ছিল মাসুদ রানা । ঘুম থেকে উঠেই টেলিফোন করেছিল তাকে । তার মানে রাতটা বাইরে কোথাও কাটায়নি । বাংলোতেই ছিল । রোমে ওর অনুপস্থিতির ব্যাপারটা ঢাকা দেবার একটা প্রচেষ্টা এটা ।

‘হ্যালো!’ রানার কণ্ঠ শুনে খুশি হয়ে উঠল মেয়েটি । ‘হঠাৎ কি মনে করে?’

‘ছিলে কোথায় কাল সন্দের সময়?’ জিজ্ঞেস করল রানা ।

‘কেন? ঘরেই ছিলাম!’

আন্দাজে টিল ছুঁড়ল রানা । ‘তাহলে নিশ্চয়ই কানে তুলো দিয়ে ছিলে?’

‘ব্যাপারটা কি বল তো?’

‘কি আর, ফাটা কপাল! ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে বাইরে ডিনার করব কিন্তু দুবার ফোন করেও সাড়া পেলাম না তোমার ।’

‘আ’য়্যাম সো সরি, রানা । মনে পড়েছে, আধ ঘন্টার জন্যে সত্যিই বাইরে গিয়েছিলাম কাল ।’ গলা শুনে মনে হল এমন একটা

সুযোগ মিস করায় আফসোস করছে এখন লিজা। 'রিয়েলি সরি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা, টিলটা জায়গামতই লেগেছে।
এবার আরেকটা তথ্য জানা দরকার। 'কটায় বেরিয়েছিলে?'

'সঠিক সময় মনে নেই। তবে বোধহয় আটটার দিকে।'

'ঠিকই আছে, আমি ফোন করেছিলাম সোয়া আটটায়।'

'পরে আর করলে না কেন?'

'এমনিই। হঠাৎ করে মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত
আর বের-ই হতে পারিনি। যাকগে, আজ কোন কাজ আছে
বাইরে?'

'না, কোন কাজ নেই।'

'বাসায় থেক তাহলে। সাড়ে আটটায় আসব আমি।'

'আচ্ছা।' খুশিতে অস্থির হয়ে উঠেছে মেয়েটি মনে হল।

যে মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল, ভাবছে রানা, তাতে
আলফ্রেডোস-এ একটা ডিনার পাওনা হয়েছে লিজার। ফোন রেখে
বাথরুমে এসে ঢুকল ও। আনমনে ভাবছে, পুলিশ কি খুব বেশি
গুরুত্ব দেবে সোফিয়ার মৃত্যুটাকে? দিক না-দিক, এটা তারা
অবশ্যই জানার চেষ্টা করবে যে এই লোকটা, রবার্ট হুইটনি, কে
সে।

অবশ্য বলা যায় না, অতটা মাথা না-ও ঘামাতে পারে। যখন
বুঝতে পারবে যে সোফিয়া মিসেস হুইটনি নয়, তখন হয়ত
ভাববে ছদ্মনামে প্রেমিককে নিয়ে কয়েকটা দিন কাটাবার জন্যেই
বেলা ডিসটা ভাড়া নিয়েছিল সে। কি করবে তারপর পুলিশ?
থেমে পড়বে, না এগিয়ে যাবে?

'ধূস্তোর!'

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে পুরো আধঘন্টা ভিজল মাসুদ রানা।
তবু মনে হচ্ছে যেন ভেতরের গরম ভাবটা রয়েই গেছে, পুরোটা
বের হয়নি। পেটে কিছু নেই, খিদেয় চোঁ চোঁ করছে। তৈরি হয়ে
দ্রুত বেরিয়ে পড়ল ও বুইক নিয়ে। কাছের এক রেস্টুরেন্ট থেকে
লাঞ্চ সেরেই সোজা ফিরে এল বাংলোয়।

এবারও টেলিফোনই ঘুম ভাঙাল ওর, ঘুমিয়ে পড়ার আধঘন্টার
মধ্যেই। 'ইয়েস?' ঘুম জড়ানো গলায় বলল রানা।

লিজা ভ্যালেন্টিনের আতঙ্কিত গলা ভেসে এল। 'রানা?'

ধক করে উঠল কলজেটা। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে যথাসম্ভব
শান্ত রাখল ও। 'বলছি!'

'এখনই একবার অফিসে আসতে পারবে?' হাঁপাচ্ছে লিজা,
গলার স্বর কাঁপছে। 'মাই গড! রানা, এইমাত্র পুলিশ ফোন
করেছিল। বলছে সোফিয়া শেরম্যান নাকি মারা গেছে।'

'সে কি!' আঁতকে উঠল যেন রানা। 'কি হয়েছিল?'

'জানি না। তুমি একটু এস, প্লীজ! লারসেনের অ্যাপার্টমেন্টে
ফোন করেছিল ওরা প্রথমে। রিপ্লাই না পেয়ে আমার নাম্বারে
করেছে। ওরা আসছে ওখানে। রানা...'

'শান্ত হও। তুমি এখন কোথায়?'

'আমার ফ্ল্যাটে!' কিসের কি, ঘন ঘন ঢোক গিলছে লিজা।

'ঠিক আছে। বেরিয়ো না। আমিই তুলে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'আচ্ছা...আচ্ছা! প্লীজ, হারি আপ!'

এই শুরু হল!

বিছানা ছেড়ে নামতে নামতে ভাবল মাসুদ রানা। তবে এত
ডাড়াডাড়ি আশা করেনি ও। লক্ষ্য করল, হাত কাঁপছে একটু

একটু। ওয়াল মাউন্টেড লিকার কেবিনেট থেকে স্কচ বের করে দ্রুত দুটোক পান করল রানা। তৈরি হয়ে বেরোতে পুরো পাঁচ মিনিটও লাগল না। ততক্ষণে কাজ শুরু করে দিয়েছে হুইস্কি। স্টিয়ারিং হুইল ধরা হাত দুটো একচুলও কাঁপছে না এখন আর।

লিজাকে তুলে নিল রানা তার ফ্ল্যাট বিল্ডিংয়ের সামনে থেকে। রক্ত নেই মেয়েটির মুখে, সাদা হয়ে গেছে চেহারা। গাড়িতে বসে কিছু জিজ্ঞেস করল না রানা। রোমান ফোরাম ঘুরে নিউ ইয়র্ক ভিশনে পৌঁছুতে সাধারণত বিশ মিনিট লাগে লিজার ওখান থেকে। কিন্তু রানার লাগল আট মিনিট। ছুটির দিন বলে রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা।

একটিও কথা না বলে এলিভেটরে চড়ল ওরা। জনশূন্য করিডর পেরিয়ে ঢুকে পড়ল অফিসে। ‘আমার সঙ্গে এস,’ হাত ধরে মেয়েটিকে লারসেনের রুমে নিয়ে এল রানা। বসিয়ে দিল চেয়ারে। রীতিমত থর থর করে কাঁপছে সে এখন।

‘রিল্যাক্স,’ নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই অবাক হল রানা। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। ভেতরের ভয়টা গায়েব হয়ে গেছে পুরোপুরি। ‘খুলে বল, কি হয়েছে। কামন, লিজা। লেট’স হ্যাভ ইট।’

‘ওরা...ওরা তেমন কিছু জানায়নি। শুধু সরেনটোয় সোফিয়া শেরম্যানের লাশ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে। ক্লিফ থেকে পড়ে মারা গেছে সে।’

তাই যেন হয়, মনে মনে বলল রানা। ‘সরেনটো? সেটা কোথায়?’

‘নেপলস-এ।’

‘গুড গড! সেখানে গেল কি করে সোফিয়া?’

‘রানা, কি হবে এখন?’ দুচোখে পানি টল টল করছে লিজার।
‘মিস্টার শেরম্যানের কানে গেলে...’

‘সব একসাথে ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপ কোরো না। আগে
শুনি সরেনটোয় কেন গিয়েছিল সে?’

‘জানি না আমি। পুলিশ জানে বোধহয়। কিন্তু মিস্টার
শেরম্যান...’

‘লিজা, সোফিয়া তোমার দোষে মারা যায়নি। কাজেই তোমার
অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। সমস্যায় যদি কেউ পড়ে, তো সে
লারসেন আর আমি। ভেব না, তোমাদের ওপর যাতে কোন ঝড়
ঝাপটা না আসে, আমি দেখব তা।’ আরও কিছু বলার জন্যে মুখ
খুলছিল রানা, থেমে গেল দরজায় টোকা পড়তে।

‘কাম ইন।’

খাটমত এক লোক ভেতরে ঢুকল। চেহারাটা ভীষণ রকম
শীতল, কঠিন লাগল রানার প্রথম দর্শনেই। দুচোখ ফ্যাকাসে নীল,
অনুসন্ধানী, এবং স্থির। লোকটির বয়স বোঝার উপায় নেই, দেখে
মনে হয় যেন ত্রিশ। ছোট ছোট মাপা পায়ে ডেকের সামনে এসে
দাঁড়াল সে, ডান হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল,
‘লেফটেন্যান্ট ভিটোলা ফ্রেনজি, ফ্রম রোম হোমিসাইড
ডিপার্টমেন্ট।’

‘মাসুদ রানা,’ হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল রানা। লোহার মত শক্ত
লেফটেন্যান্টের হাত।

একটু ইতস্তত করল লোকটা। ‘আই বেগ ইওর পার্ডন,
সেনর। আমি জানতাম রোমে নিউ ইয়র্ক ভিশনের চার্জে আছেন

সেনর পিটার লারসেন ।’

‘ঠিকই বলেছেন । লারসেন এ মুহূর্তে ছুটিতে আছেন । আমি ওর রিলিভার ।’

‘আই সী,’ বলল লোকটা । ‘কতদিন আগে চার্জ নিয়েছেন আপনি?’

‘এক সপ্তার বেশি হবে । আজ নয় দিন,’ হঠাৎ লিজার ওপর চোখ পড়ল রানার । তাড়াতাড়ি লেফটেন্যান্টকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল । ‘সরি । আমার পি.এ, সেনরিনা ভ্যালেন্টি, লিজা ভ্যালেন্টি ।’

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লিজাকে বো করল অফিসার ।

‘ঘটনাটা এবার শোনা যাক, অফিসার,’ বলল রানা । ‘আপনি শিওর ওটা সোফিয়া শেরম্যানের ডেডবডি?’

‘সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না আমার,’ ধীর, অভিব্যক্তিহীন গলায় বলল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি । ‘তিন ঘন্টা আগে প্রথম টেলিফোনে খবরটা পাই আমি নেপলস হেডকোয়ার্টার থেকে । আমাদের জানানো হয় সরেনটোর পাঁচ মাইল দূরে একটা ক্লিফের পায়ের কাছে এক যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে । নেপলস-এর ধারণা ওপর থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় মেয়েটির । আধ ঘন্টা আগে আবার টেলিফোন করে ওরা, জানায়, ওটা লা সেনরিনা সোফিয়া শেরম্যানের লাশ । ওই ক্লিফেরই চূড়ায় একটি ভিলা ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি তিনদিনের জন্যে । ভিলাটা সার্চ করা হয়েছে । সেনরিনার হাতব্যাগের কাগজপত্র পরীক্ষা করে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারে নেপলস । এখন মৃতদেহটা আইডেন্টিফাই করার জন্যে আপনাদের কাউকে আমার সাথে

সরেনটো যেতে হবে।’

এ জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না রানা। মর্গে গিয়ে সোফিয়ার সুন্দর দেহটির ভগ্নাবশেষ দেখতে হবে, চিন্তাটা প্রায় অসুস্থ করে তুলল ওকে।

লিজা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ‘তাহলে তোমাকেই যেতে হচ্ছে, রানা। আমি কখনও দেখিনি সেনরিনাকে। তুমি চেন তাকে।’

শেষ বাক্যটা এমনভাবে বলল সে, রানার মনে হল যেন ওর ভেতরে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে কিছু একটা। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ পেল না ও। উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে লেফটেন্যান্ট।

‘চলুন তাহলে, সেনর। দেরি না করাই ভাল। নিচে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে।’

‘আপনি এগোন,’ রানাও চেয়ার ছাড়ল। উপায় নেই, যেতেই হবে। ‘আমি আসছি।’

লেফটেন্যান্ট বেরিয়ে যেতে লিজাকে বলল, ‘তুমি বাসায় ফিরে যাও। আমি এসে যা করার করব। ফিরেই ফোন করব তোমাকে। ভাল কথা, টনি আমান্দোর বাসায় ফোন করে ওকে ব্যাপারটা জানিয়ো। বলা যায় না, ওর সাহায্য দরকার হতে পারে।’

‘ঠিক আছে।’

‘আর মারসেন যদি আসে...।’ কি বলবে ভেবে না পেয়ে থেমে গেল ও। কাঁধ ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

করিডরেই রানার অপেক্ষায় ছিল অফিসার। নিঃশব্দে নিচে নেমে এল ওরা। রোম পুলিশের ছাপমারা একটা কার দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথ ঘেঁষে। সামনের সিটে ড্রাইভার বসা। ওদের তিস্ত অবকাশ-১

দুজনকে এগিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল লোকটা, পিছনের দরজা মেলে ধরল।

ছুটল পুলিশ কার এয়ারপোর্টের দিকে। আড়চোখে একবার ফ্রেনজির মুখের দিকে চাইল রানা। দৃষ্টি সামনে। স্থির বসে আছে লোকটা, গাড়ির ঝাঁকিতে দুলছে মৃদু মৃদু। কি ভাবছে, বা আদৌ কিছু ভাবছে কি না, মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই।

‘ব্যাপারটা কিভাবে ঘটল,’ বলল রানা। ‘আই মীন, কোন ধারণা?’

সাপের মত পলকহীন, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকল ফ্রেনজি কয়েক সেকেণ্ড। ঘুরে আবার সামনে তাকাল। ‘বললাম তো, পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।’

‘কি বলেছেন ভুলিনি। মনে আছে। জানতে চাইছি আর কিছু আছে কি না। গুরুত্বপূর্ণ কিছু।’

কাঁধ ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট বিশেষ ভগ্নিমায়, যা কেবল ইটালিয়ানরাই করে থাকে। ‘জানি না। তবে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস রবার্ট হুইটনি নামে ভিলাটা ভাড়া নিয়েছিলেন লা সেনরিনা। অথচ তিনি বিবাহিতা ছিলেন না, তাই না?’

‘আমিও সেরকমই জানি, অবিবাহিতা ছিল।’

বিচ্ছিন্ন, কটুগন্ধি তামাকের তৈরি সস্তা দেশী সিগারেট ধরাল ফ্রেনজি। রানাকেও অফার করেছিল, কিন্তু ‘ইচ্ছে করছে না,’ বলে পাশ কাটিয়েছে সে। নাকমুখ দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়ল লোকটা কিছুক্ষণ। ভাব দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, এ মুহূর্তে গভীর চিন্তায় আছে।

অর্ধেক সিগারেট শেষ করে আবার মুখ খুলল অফিসার।

‘ব্যাপারটা বেশ জটিল মনে হচ্ছে আমার। এসব ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে...সেনরিনার বাবা খুবই প্রভাবশালী মানুষ, আমরা জানি। ভেতরের কাহিনী ফাঁস হয়ে গেলে ভদ্রলোক বিব্রতকর অবস্থায় পড়বেন। কিন্তু আমি চাই না তেমন কিছু ঘটুক।’

‘ঠিক,’ আনমনে বলল ও। ‘আমিও চাই না তেমন কিছু ঘটুক।’ নিজের পরিচয় ভাঁড়ানোটা কি ঠিক হয়েছে? ভাবল রানা, পরে যখন জানবে এ লোক যে...সে তখন দেখা যাবে। নিজেকে বোঝাল রানা, এটা এমন কোন অপরাধ নয়। প্রয়োজনের খাতিরেই কাজটা করতে হয়েছে। পরে লেফটেন্যান্টকে সব বুঝিয়ে বললেই চলবে। নড়ে চড়ে বসল ও। পরমুহূর্তে ফ্রেনজির মন্তব্যটা মনে পড়ল। কেন বলল সে কথাটা?

‘নামের গোলমালটা ছাড়া আর কি জটিলতা আছে এর মধ্যে, লেফটেন্যান্ট?’

‘লা সেনরিনার ব্যাপারে কতটুকু জানেন আপনি?’ চাউনি আরও তীক্ষ্ণ, আরও অন্তর্ভেদী হয়ে উঠল তার। ‘ব্যাপারটা শুধু নেপলস পুলিশ আর আমি জানি। গোপন রাখতে চাই ওটা, আমরা। তবে কতক্ষণ পারব জানি না।’

‘কোনটা?’ অজান্তেই একটা ঢোক গিলল রানা।

‘এই মিস্টার হুইটনির ব্যাপারটা। লোকটা যে-ই হোক, আমাদের ধারণা সেনরিনার লাভার ছিল সে। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না, গোপনে বিয়ে করেছিলেন সেনরিনা?’

‘হতে পারে। তবে আমার মনে হয় না।’

‘আমারও। মনে হচ্ছে আনঅফিশিয়াল হানিমুন করতে সরেনটো গিয়েছিলেন তিনি।’ আবার কাঁধ ঝাঁকাল ভিটেলি

ফ্রেনজি। ‘এটা সম্ভব, কি বলেন? রবার্ট হুইটনি নামে কাউকে চেনেন আপনি?’

‘নাহ্।’

‘হুঁম!’ শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা টোকা মেরে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল সে। ‘লেফটেন্যান্ট গুইডো, নেপলস-এ যে এই কেসটা হ্যাণ্ডেল করছে, ওর কথাবার্তা শুনে মনে হয় মৃত্যুটাকে ও একটা দুর্ঘটনা হিসেবে ভাবছে। কিন্তু হিসেবটা উল্টে দিয়েছে এই হুইটনি। এ না থাকলে কেসটা ছিল স্ট্রাইটফরোয়ার্ড।’

‘এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে যদি মিস্টার শেরম্যানের বিব্রত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তো কাজটা না করলেই পারেন।’

‘অসম্ভব নয়। হয়ত করা যাবে, যদি প্রয়োজন দেখি। আপনি কতদিন থাকবেন সেনর লারসেনের রিলিভার হিসেবে?’

‘ঠিক নেই। হানিমুনে গেছে ও। কবে ফিরবে বলা যায় না।’

‘কদিনের ছুটি?’

‘সাতদিনের ছিল। নয়দিন হয়ে গেছে অলরেডি।’

‘উনি এলে কোথায় যাবেন আপনি? নিউ ইয়র্ক?’

‘সম্ভবত। হেড অফিস যেভাবে বলে আর কি!’ অস্বস্তিতে পড়ল রানা। ব্যাটা ওকে নিয়ে পড়ল কেন আবার?

‘যেখানেই যান, আগে আমাকে জানাতে ভুলবেন না। অবশ্য এর মধ্যে যদি কেসের সুরাহা হয়ে যায় তাহলে আর দরকার হবে না তার।’

‘আগে সরেনটো চলুন তো। দেখি, সত্যিই ও সোফিয়া শেরম্যান কি না। যদি না হয়...’

‘আ’য়্যাম অ্যাফ্রুড ইট ইজ হার অল রাইট। লাগেজের মধ্যে

কয়েকটা ব্যক্তিগত চিঠি পাওয়া গেছে। সেনরিনার পরিচয়ের ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে বলে আমি মনে করি না।’

প্লেনে ওঠার আগ পর্যন্ত আর কোন কথা হল না ওদের। যে যার চিন্তায় ডুবে থাকল রানা-ফ্রেনজি। প্লেন মাটি ত্যাগ করার পর ফ্রেনজিই প্রথম কথা বলল, ‘ভাবছি, খবরটা কি ভাবে গ্রহণ করবেন ইল সেনর শেরম্যান। আ’য়্যাম অ্যাফ্রেড, জটিলতা যদি আরও বাড়ে তাহলে বাধ্য হয়েই মাঠে নামতে হবে আমাদেরকে। এবং সবকিছুই বেরিয়ে আসবে, গোপন থাকবে না কিছুই। তাই প্রার্থনা করি, আমাদের পাওয়া তথ্য যেন সঠিক না হয়। মৃতদেহটা যেন লা সেনরিনা সোফিয়ার না হয়।’

বলা শেষ হতে চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসল লেফটেন্যান্ট রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই। যেন কথাগুলো সে নিজেকেই শোনাচ্ছিল। মনের ভেতর খচ খচ করলেও লোকটাকে আর কোন প্রশ্ন করল না মাসুদ রানা।

নেপলস পুলিশের লেফটেন্যান্ট ওইডো গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল বিমানবন্দরে। রানার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক খাটো হবে লোকটা। রানাকে ফ্রেনজি তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সামান্য হাসল সে। যেন একান্ত বাধ্য হয়েই। হাত মেলাল। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকাল না একবারও। আচরণে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, রানাকে তার পছন্দ হয়নি।

দুই অফিসারকে একসাথে বসার সুযোগ করে দিল রানা। নিজে থেকেই উঠে বসল ড্রাইভারের পাশে। সরেনটো পর্যন্ত পুরোটা পথ প্রায় ফিস ফিস করে দ্রুত, একনাগাড়ে কথা বলে গেল লেফটেন্যান্ট ওইডো, যার একটা অক্ষরও বুঝল না রানা শত তিস্ত অবকাশ-১

চেঁটা করেও । বাধ্য হয়ে রাস্তার দিকে মন দিল ও । মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে এই পথেই ফিরে গিয়েছিল রানা নেপলস ।

চোখ পথের দিকে থাকলেও মাঝে মাঝেই রেয়ার ভিউ মিররের ভেতর দিয়ে পিছনের দুই আরোহীর দিকে তাকাচ্ছিল ও চোরা চোখে । এর মধ্যে দুবার চোখাচোখি হল গুইডোর সাথে ।

সরেনটো স্টেশনের পিছনদিকের ছোট একটা একতলা লাল ইটের দালানের সামনে এসে থামল গাড়ি । সরেনটোর মর্গ এটা । গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা । লেফটেন্যান্ট গুইডো বলল, 'লা সেনরিনাকে এভাবে দেখাটা আপনার জন্যে সুখকর হবে না, সেনর মাসুদ রানা, জানি । তবুও কাজটা করতে হবে । আপনি নিশ্চই...'

'দ্যাট'স অল রাইট, অফিসার,' আগে আগে পা বাড়াল রানা । মুখে যা-ই বলুক, ভেতরে ভেতরে ঘামছে ও ।

ভেতরে ঢুকে একটা করিডর পেরিয়ে ডানে বাঁক নিল গুইডো । তার পিছনে চলেছে রানা আর ফ্রেনজি । সামনেই একটা রুম, দরজায় ঝুলছে ধপধপে সাদা পর্দা । রুমের ঠিক মাঝখানে রয়েছে টেবিলটা, তার ওপর সাদা চাদরে ঢাকা একটা নারীদেহ । এছাড়া আর কিছু নেই এ রুমে । হঠাৎ করেই খানিকটা অসুস্থ বোধ করল রানা । টের পেল দ্রুত সরে যাচ্ছে মুখের রক্ত ।

ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি । রানার চোখে চোখ রেখে দেহটার মুখের ওপরকার চাদরের আচ্ছাদন আলতো করে নামিয়ে আনল গলার নিচ পর্যন্ত ।

দুচোখ আধবোজা সোফিয়ার । ঠোট সামান্য ফাঁক হয়ে আছে । আতঙ্কের স্থায়ী ছাপ চেহারায় স্পষ্ট । আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে

চেহারাটা দর্শনযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে যথাসাধ্য।
যদিও খুব একটা কাজ হয়নি তাতে। পলকহীন চোখে মেয়েটির
দিকে চেয়ে থাকল রানা কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ করেই ঘুরে
দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল রুম থেকে।

ওর পিছন পিছন এল দুই গোয়েন্দা। গাড়ির কাছে এসে
দাঁড়াল তারা।

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা। ‘কোন সন্দেহ নেই। ওটা সোফিয়া শেরম্যান।’

‘দুঃখিত,’ বলল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। ‘মনের মধ্যে একটা
ক্ষীণ আশা ছিল, হয়ত সেনরিনার পরিচয়ের ব্যাপারে কোন
ভুলভাল হয়ে থাকলেও থাকতে পারে। এবার তা দূর হল। কিছু
কিছু সমস্যা ফেস করতে হবে আমাদের এখন। সবচে বড়
সমস্যা, সেনর রানা, প্রেস। ব্যাপারটাকে ওরা হয়ত খুব বেশি
গুরুত্ব দেবে। আপনি যদি কাইগুলি আজই ইল সেনর শেরম্যানকে
খবরটা দেন, খুব উপকৃত হব। প্রেসের সামনে মুখ খোলার আগে
তাঁর সঙ্গে কথা বলে নেয়া দরকার। আগ বাড়িয়ে কিছু করতে
গেলে বিপদে পড়ব আমরা। চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।’

‘ঠিক আছে,’ বলল রানা। ‘আজই তাঁর কানে খবর পৌঁছে
যাবে।’

একটা সিগারেট ধরাল ফ্রেনজি। ম্যাচের কাঠি ফুঁ দিয়ে
নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। ‘এক কাজ করুন, আমাদের সঙ্গে চলুন
পুলিস হেডকোয়ার্টারে। ওখান থেকে ফোন করতে পারবেন।’

ঘড়ি দেখল রানা। পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। বলল,
‘চলুন।’

আগেরমতই সামনের সিটে বসল ও। পিছনে দুই গোয়েন্দা।

হেডকোয়ার্টারে পৌঁছতে দশ মিনিট সময় লাগল। খোলা হাওয়ায় এখন কিছুটা সুস্থ বোধ করছে রানা। একটা রুমে টেলিফোনের সামনে ওকে একা রেখে বেরিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা উর্ধ্বতন অফিসারের সাথে আলোচনার কথা বলে।

লিজা ভ্যালেন্টিনের বাসায় ফোন করল রানা। প্রথমেই লারসেনের খবর নিল। জানা গেল এখন পর্যন্ত আসেনি সে। এরপর সোফিয়ার ব্যাপারটা জানাল মেয়েটিকে। শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল লিজা। তারপর ভয়ভাঙিত কণ্ঠে বলল, 'এখন কি হবে? মিস্টার শেরম্যানকে কি করে খবরটা দেয়া যায়? কে দেবে?'

'আমিই দেব। ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। এখন কাগজ-কলম নাও, যা বলি, লিখে নাও।'

লিজা তৈরি হতে ডিকটেশন দিতে শুরু করল মাসুদ রানা। একনাগাড়ে পাঁচ মিনিট ঝড়ের বেগে বলে গেল ও, একটা শব্দও রিপিট করতে হল না। ডিকটেশন শেষ হতে বলল, 'মেসেজটা মিস্টার শেরম্যানকে টেলেক্স কর লারসেনের নামে। ওটা পেয়েই হয়ত তোমাকে ফোন করবেন তিনি।' বল, 'ডেডবডি আইডেন্টিফাই করতে সরেনটো গেছে লারসেন। ফিরে এসে টেলিফোন করবে তাকে। সাপোজ, অ্যাট টোয়েন্টি টু আওয়ার্স, ইওরোপিয়ান টাইম।'

'ইয়েস। তুমি কখন ফিরছ?'

'দশটার আগেই। টনিকে খবর দিয়েছ?'

'তিনি বাসায় নেই। কয়েকবার ফোন করেছি।'

'আধ ঘন্টা পর পর ফোন করতে থাক। রোম ফিরেই ওকে

দরকার হবে আমার, জানিয়ে রেখ ।’

‘আচ্ছা । আর কিছু?’

‘নাথিং । তবে অনর্থক মাথা গরম কোরো না । তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই । রাখলাম । এখনই টেলেক্সটা পাঠিয়ে দাও ।’

রিসিভার রেখে একটা সিগারেট ধরাল রানা । এই সময় ফ্রেনজি এসে ঢুকল রুমে ।

‘জায়গাটা দেখতে যাচ্ছি আমি, সেনর । যেখানে মারা গেছেন সেনরিনা । আপনি যেতে চান?’ বলল সে ।

‘হ্যাঁ, যাব ।’ উঠে দাঁড়াল রানা ।

রাস্তায় ওদের অপেক্ষায় ছিল লেফটেন্যান্ট গুইডো । দূর থেকে রানার মনে হল, হঠাৎ করেই যেন পাল্টে গেছে লোকটার চাউনির ধরন । সরাসরি ওর চোখের দিকে চেয়ে আছে সে এখন । রাজ্যের সন্দেহ বাসা বেঁধেছে তার দুচোখে ।

আট

পুলিস স্টেশনের পিছনেই খালের মত সরু সরেনটো হারবার । মিশেছে গিয়ে সরেনটো উপসাগরে । ঘাটে বাঁধা পুলিশের মোটর বোটে চড়ে রওনা হল ওরা—রানা, দুই গোয়েন্দা অফিসার, সঙ্গে তিন কনস্টেবল । হারবার জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অজস্র

নৌযানের ফাঁক ফোকর দিয়ে ঐকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে বোট মোহনার দিকে।

স্টার্নে পাশাপাশি বসে আছে রানা আর লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। একটু অস্বস্তি বোধ করছে রানা ফ্রেনজির চোখের নীল টিনটেড সানগ্লাসটার জন্যে। রোম থেকে আসার সময় ওটা তার সাথে ছিল না, হলফ করে বলতে পারে রানা। এ মুহূর্তে গ্লাসটা চোখে পরার বিশেষ কোন কারণ আছে কি না বুঝতে পারছে না।

অ্যামিডশিপে দাঁড়িয়ে আছে গুইডো রেলিঙে ভর দিয়ে। তার চোখে সানগ্লাস নেই। বিশ মিনিট একনাগাড়ে চলার পর বাঁয়ে ঘুরে উপসাগরে পড়ল পুলিশ বোট। ঘটনাস্থলে পৌঁছতে আরও দশ মিনিট লাগল। নিচ থেকে মনে হয় কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়টা, যে কোন সময় ভেঙে পড়বে সাগরে।

কাছে থেকে বোল্ডারগুলোর দিকে তাকাল রানা। ওপর থেকে বোঝার উপায় নেই কি বিশাল আকার একেকটার। যতক্ষণ বোটটা তীরে ভেড়ার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে না পেল, হাঁ করে একভাবে ক্রিফের দিকে চেয়ে থাকল গুইডো। নিশ্চয়ই ওর মত সে-ও ভাবছে ওপর থেকে পতনের ভয়ঙ্করত্বের কথা।

বোট ভিড়তে নেমে পড়ল সবাই। ফ্রেনজিকে বলল গুইডো, 'কোন কিছু স্পর্শ করিনি আমরা। শুধু লা সেনরিনার বডিটা তুলে নিয়ে গিয়েছি, ব্যাস।'

ঘটনাস্থলের কাছে এসে রানাকে বড় একটা বোল্ডার দেখিয়ে ফ্রেনজি বলল, 'আপনি এখানে বসুন, সেনর। আমরা স্পটটা আগে ঘুরে দেখি। তারপর আপনি যেতে পারবেন।'

সিগারেট ধরিয়ে বসে বসে ওদের সার্চ দেখতে লাগল ও।

সোফিয়ার ক্যামেরা কেসটা আবিষ্কার করতে খুব বেশি সময় লাগল না। দুই বোল্ডারের মাঝখানে পড়েছিল ওটা। তুলে আনল ফ্রেনজি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। চশমাটা ঠেলে তুলে দিয়েছে কপালের ওপর। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল দ্বিতীয় গোয়েন্দা। এত গভীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল, যেন দুই মহাকাশ বিজ্ঞানী মঙ্গল গ্রহ থেকে ছিটকে পড়া অজ্ঞাত কোন বস্তুর নাম পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

লক্ষ্য করল রানা, খুব সতর্কতার সঙ্গে জিনিসটা নাড়াচাড়া করছে লেফটেন্যান্ট। সময় থাকতে হাতের ছাপগুলো মুছে ফেলার কথা খেয়াল পড়েছিল বলে নিজেকে ধন্যবাদ দিল রানা। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে এদিকে তাকাল তারা। মনে হল ওকে নিয়েই বলাবলি করছে কিছু। এক সময় এগিয়ে এল।

ফ্রেনজি বলল, 'এটা নিশ্চয়ই তাঁর হবে। লা সেনরিনা ফটোগ্রাফির ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন নাকি?'

'বলতে পারি না,' মাথা দোলাল রানা। 'তবে হতে পারে। হাজার হলেও পত্রিকা সম্পাদকের মেয়ে।'

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল লেফটেন্যান্ট। কেসটা আলতো করে তুলে দিল এক কনস্টেবলের হাতে। বড় একটা প্লাস্টিক ব্যাগে জিনিসটা ভরে রাখল সে। আবার স্পটে ফিরে গেল দুজনে ঘুরতে ঘুরতে। মিনিট দশেক পর আরেকটা কিছু আবিষ্কার করল। জিনিসটা কি হতে পারে এখান থেকে বুঝতে পারছে না রানা। বড় একটা বুনো ঝোপের ভেতর থেকে ওইডো তুলে আনল ওটা। ওর দিকে পিছন ফিরে জিনিসটা দেখছে এখন।

কি হতে পারে? ভাবছে রানা। টের পেল হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন

ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি আরেকটা সিগারেট ধরাল ও, টানতে লাগল ঘন ঘন। জিনিসটা কি জানার জন্যে ছটফট করছে মন।

একসময় ফিরে এল অনুসন্ধানী দল। সোজা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়াল রানা, পা বাড়াল সামনে। কাছে আসতে বোঝা গেল সোফিয়ার দামি ক্যামেরা ওটা। ওপর থেকে আছড়ে পড়ে তুবড়ে গেছে বডিটা কয়েক জায়গায়। নিশ্চয়ই পাথরের ওপর পড়েছিল। টেলিফটো লেন্সটা উধাও।

ক্যামেরাটা নিল রানা। দেখতে লাগল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। পিছনদিকের ছোট উইণ্ডো প্যানেলের ওপর নজর আটকে গেল ওর। ভেতরে ফুটেজ মিটার বলছে বারো ফুট ছবি তোলা হয়েছে এটা দিয়ে।

‘এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে কিভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে,’ বলল ফ্রেনজি। ওইডোও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

‘তাই? কিভাবে?’ বলল রানা।

‘দেখাচ্ছি,’ ক্যামেরাটা নিয়ে চোখে লাগাল লেফটেন্যান্ট। ‘নিশ্চয়ই ঠিক এভাবে এটা ধরে ছবি তুলছিলেন সেনরিনা। ওই সময় হয়ত ক্লিফের একেবারে কিনারার কাছাকাছি ছিলেন তিনি। ইউ নো, ক্যামেরার ভিউফাইণ্ডারে চোখ রাখলে দূরত্ব ঠাহর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। হয়ত ওই অবস্থাতেই সামনে এগুবার জন্যে পা বাড়িয়েছিলেন সেনরিনা। অ্যাও দ্য রেজাল্ট ইজ...।’ থেমে গেল গোয়েন্দা। কাঁধ ঝাঁকাল।

‘হতে পারে,’ বলল মাসুদ রানা। ‘ভেতরে ফিল্ম আছে ওটার

যতদূর সম্ভব। যদি পানি ঢুকে না থাকে তাহলে ঠিকই আছে, ছবি পাওয়া যাবে। ফিল্ম প্রসেস করালেই বোঝা যাবে আপনার ধারণা ঠিক কি না।’

ঠোট কামড়ে ধরে মাথা দোলাল ফ্রেনজি। মনে হল সন্তুষ্ট হয়েছে রানার পরামর্শে। ‘ঠিক বলেছেন। আজই দেখব ব্যাপারটা।’

দুজন কনস্টেবলকে সার্চ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ফিরতি পথ ধরল ওরা। পুলিশ স্টেশনে এসে রানাকে জিজ্ঞেস করল ফ্রেনজি, ‘ভিলায় যাচ্ছি এখন আমরা, যেটা ভাড়া নিয়েছিলেন সেনরিনা সোফিয়া। মেয়েছেলেটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। যাবেন আপনি?’

‘মেয়েছেলে?’ পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

‘ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে তাকে সেনরিনা ঠিক করেছিলেন। দেখি জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু জানা যায় কি না।’

‘চলুন, যাব।’

এবার ওইডো বসল সামনের সিটে। রানা-ফ্রেনজি পিছনে। অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে আসার পর মুখ খুলল ফ্রেনজি। ‘শুধু যদি নিজেকে মিসেস রবার্ট হুইটনি বলে পরিচয় না দিতেন সেনরিনা সোফিয়া, কেসটা তাহলে আমাদের জন্যে খুব সহজ হত। আপনার বসের প্রভাব সম্পর্কে আমার কোন ভুল ধারণা নেই, সেনর মাসুদ রানা। ভদ্রলোক ইচ্ছে করলে...।’ থেমে গেল লোকটা। কপাল কুঁচকে আছে। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে হঠাৎ করেই।

বিস্মিত হল রানা। এই প্রথম সত্যি-সত্যি টের পেল ফ্র্যাঙ্কলিন

শেরম্যানের প্রভাবের বলয় কত বিস্তৃত। অন্য দেশের পুলিশ অফিসারকে পর্যন্ত নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছেন ভদ্রলোক আটলান্টিকের ওপারে বসে।

বেলা ভিসটার গেটে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকল ওরা। খোলা গ্যারেজে তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে সোফিয়ার লিঙ্কন কনভার্টিবল। বনেটের ওপর পাতলা ধুলোর পর্দা জমেছে।

‘ওটা সেনরিনার গাড়ি নিশ্চই?’ রানাকে জিজ্ঞেস করল ফ্রেনজি।

‘জানি না।’

‘তাঁরই,’ অধৈর্যভাবে বলে উঠল ওইডো। ‘এটার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি আমি। গাড়িটা নিজের নামে কিনেছেন ল্যা সেনরিনা রোম আসার পরদিনই।’

‘হতে পারে,’ বলল ও। ‘আমার জানা নেই।’

আসার পরদিনই কি করে এত দামি গাড়ি কিনল সোফিয়া? কে দিল ওকে টাকা? নাকি আসার সময়ই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল? কিন্তু সম্ভাবনাটা নিজের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হল না রানার। যে মানুষ মেয়েকে হাতখরচের জন্যে প্রয়োজনের চাইতেও কম টাকা দিতেন তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, তিনি কিছুতেই এত টাকা ক্যাশ দেননি মেয়েকে। মেয়ের জন্যে প্রয়োজন হলে যখন-তখন দশটা গাড়ি কিনে দেবার ক্ষমতা তাঁর আছে, কাজটা নিজে সম্ভব না হলেও অন্যকে দিয়ে করাতে পারতেন যে-কোন মুহূর্তে। সে সুযোগ থাকতে কেন সোফিয়ার হাতে এত টাকা দেবেন শেরম্যান? উইঁ। মিলছে না।

রানাকে লাউঞ্জে বসতে বলে দোতলায় উঠে গেল ফ্রেনজি-

গুইডো। চুপ করে বসে থাকল ও। আনমনা। ঠিক চব্বিশ ঘন্টা আগে পায়ে হেঁটে এগোচ্ছিল রানা এই ভিলার দিকেই। কি বিরাট পার্থক্য সেই আসা আর এই আসায়। মিনিট দশেক পর নেমে এল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। হাতে ছোট একটা চামড়ার বাক্স। গুইডো ওপরে রয়ে গেছে।

রানার সামনে সেন্টার টেবিলের ওপর সেটা রাখল গোয়েন্দা। 'এটার দায়িত্ব আপনি নিন, সেনর রানা। ইল সেনর শেরম্যানকে দেবেন দয়া করে। আমাকে একটা হাত-রসিদ দেবেন শুধু।'

'কি আছে এতে?'

ঢাকনা তুলল ফ্রেনজি। কিছু জুয়েলারি রয়েছে ভেতরে। দুটো পাথর বসানো আংটি; একটায় বড় স্যাফায়ার পাথর, অন্যটায় তিনটে ডায়মণ্ড। এছাড়া একটা ডায়মণ্ড কলার এবং একজোড়া কানের দুল। ডায়মণ্ড বসানো তাতেও। এসবের দাম সম্পর্কে রানার কোন ধারণা নেই। কিন্তু তবুও জিনিসগুলো যে খুবই দামি, সে ব্যাপারে সন্দেহ রইল না।

ওর ভাবনার প্রতিধ্বনি ঘটল ফ্রেনজির গলায়। 'এগুলো খুব মূল্যবান, সেনর। ভাগ্য ভাল যে কেউ হাতাবার সুযোগ পায়নি।'

পেয়েছিল, মনে মনে বলল রানা। বিশালদেহী লোকটার কথা ভাবল। লোকটা তাহলে চুরি করতে আসেনি। তাহলে কেন এসেছিল? কিসের আশায়? নাকি জিনিসগুলো তার চোখে পড়েনি?

'কোথায় ছিল বাক্সটা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ওপরের মাষ্টার বেডরুমে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর।'

'এগুলো আসল তো? আই মীন...'

‘অফকোর্স জেনুইন!’ ভুরু কুঁচকে তাকাল সে ওর দিকে।
‘এগুলোর দাম হবে কম করেও তিন মিলিয়ন লিরা।’

পকেট থেকে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একটা রসিদ বের করে
এগিয়ে দিল ফ্রেনজি ওর দিকে। ‘সই করুন, প্লীজ।’

হঠাৎ করেই শীত লেগে উঠল রানার। অস্বস্তির হিম ঠাণ্ডা
একটা ধারা শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল ঘাড়ের পিছনে। এখন রানা
নিশ্চিত, আর যে কারণেই হোক, চুরির উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না
লোকটার। তাহলে? তাহলে কিসের জন্যে এসেছিল?
টেলিফোনের শব্দে চমক ভাঙল রানার।

লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি ধরল। ‘সি...সি...সি।’ তারপর
অনেকক্ষণ ধরে শুনল ও প্রান্তের বক্তব্য। শেষে কয়েকবার মাথা
দোলাল কিছু একটা অনুমোদনের ভঙ্গিতে। তারপর একবার
সংক্ষিপ্ত, ‘সি,’ বলেই রেখে দিল ফোন।

লেফটেন্যান্ট ওইডো নেমে এল এ সময় ওপর থেকে।
দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কিছু একটা প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে থাকল
সতীর্থের মুখের দিকে।

একটা সিগারেট ধরাল ফ্রেনজি অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে।
হঠাৎ করেই ভীষণ রকম গম্ভীর হয়ে গেছে মুখটা। সোফায় হেলান
দিয়ে অন্যমনস্কের মত সিলিং সই করে ধোঁয়া ছুঁড়তে লাগল সে।
টানা দুমিনিট পর যেন হুঁশ হল। ‘সেনর,’ মুখ খুলল ফ্রেনজি। ‘লা
সেনরিনার ময়না তদন্তের রিপোর্টটা এইমাত্র জানাল আমাকে মর্গ,’
বলেই আবার ধোঁয়া গেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

বুঝতে পারছে রানা, রিপোর্টে এমন কিছু জানা গেছে যা
অস্বস্তিতে ফেলেছে তাকে। চোখজোড়া কেমন যেন অস্থির হয়ে

উঠেছে লোকটার। ঘন ঘন রানা আর গুইডোর ওপর দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

‘নতুন কি আর থাকবে তাতে,’ বলল রানা। ‘মিস সোফিয়া কিভাবে মারা গেছেন, সে তো আমরা জানি-ই।’

‘হ্যাঁ,’ চোখ বুজে মাথা চুলকাতে লাগল ফ্রেনজি। ‘সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।’

‘তো? বলতে চাইছেন আরও কিছু আছে রিপোর্টে যা আমাদের জানা ছিল না?’

‘ঠিক ধরেছেন।’ তিক্ত হাসি ফুটল তার মুখে। ‘একেই বলে যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।’

‘ব্যাপারটা কি?’

‘তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন লা সেনরিনা। এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্তে কেউ তাঁর তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। হতে পারে লাথি বা অন্য কোনভাবে করা হয়েছে আঘাতটা,’ এমনভাবে বলছে ফ্রেনজি, যেন নিজেই নিজের ফাঁসির আদেশ ঘোষণা করছে। ‘মানেটা কি হল তার? ছবি তুলতে গিয়ে নয়, লাথি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ খুন করা হয়েছে তাঁকে।’

নয়

খবর বটে একখানা! কি না, তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছে সোফিয়াকে, এবং সেই আঘাতেই ক্লিফ থেকে পড়ে মারা গেছে সে। সেই সাথে অন্তঃসত্ত্বাও ছিল মেয়েটি! যদি আজরাইল স্বয়ং সামনে এসে বলত, এই মুহূর্তে তোমার জান কবচ করব আমি, তাহলেও হয়ত এতটা চমকাত না মাসুদ রানা।

অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না ও। ফ্রেনজি বা গুইডো যদি এখন ঘুণাঙ্করেও জানতে পারে রানা-ই সেই মিস্টার রবার্ট হুইটনি, এবং কাল বিকেলে এসেছিল সে বেলা ভিসটায়, তাহলেই হয়েছে। সোফিয়ার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পিছনে ওর হাত নেই, ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেও ও যে তাকে আঘাত করেনি, অর্থাৎ খুন করেনি, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। শুধু ওরা কেন, কেউ-ই করবে না।

ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি উঠে গেছে রানার। আতঙ্কিত বোধ করছে রীতিমত। কে হত্যা করল সোফিয়াকে? কি অপরাধ করেছিল সে তার কাছে? কালকের সেই বিশালদেহী লোকটি-ই কি হত্যাকারী? সোফিয়ার প্রেমিক সে? হতে পারে। কিন্তু সোফিয়া তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলছে এরা, তার মানে

ব্যাপারটা এদেশে ঘটেনি। ঘটেছে আমেরিকায়।

তাহলে? ওই লোকটিও কি আমেরিকান? কিন্তু সোফিয়াকে যদি হত্যা করতেই হবে, তাহলে এদেশে কেন? কাজটা তো নিউ ইয়র্কেও করতে পারত সে। মনের মধ্যে হাজারো জিজ্ঞাসা, অথচ একটিরও উত্তর জানা নেই রানার। একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করতে লাগল। নিজেকে ওর দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট আহ্বানক বলে মনে হচ্ছে এখন।

সোফিয়ার রূপের মোহে আকৃষ্ট হয়ে চরম গাধামী করেছে ও, আওপিছু চিন্তা না করেই বড্ডো বেশি জড়িয়ে ফেলেছিল নিজেকে। সেটা যদিও খুব একটা মারাত্মক কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু হুট করে মেয়েটির এরকম একটা আয়োজনের সাথে জড়ানোটা একেবারেই ঠিক হয়নি। ভুল হয়ে গেছে। মারাত্মক ভুল। এখন সে ভুলের মাশুল গুণতে হবে মাসুদ রানাকে।

ভিলার প্রতিটি ইঞ্চি, সামনে-পিছনের বাগান তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হল। কিন্তু পাওয়া গেল না আর কিছু। যে মহিলাকে ভিলার কাজ কর্মের জন্যে ঠিক করেছিল সোফিয়া, আগেই তাকে খবর পাঠিয়েছিল গুইডো। একটু আগে এসেছে সে কাঁপতে কাঁপতে। রানা তাকে দেখেনি।

পাশের এক রুমে মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এখন দুই গোয়েন্দা। তার দুর্বল গলার স্বর মাঝে মাঝেই শুনতে পাচ্ছে ও। ঝাড়া পনের মিনিট ধরে জেরা করা হল মহিলাকে। তারপর তাকে বিদেয় করে এ ঘরে এল ফ্রেনজি। সাতটা চল্লিশ বাজে তখন।

সেনরিনা সোফিয়ার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা আছে বলে তিষ্ঠ অবকাশ-১

কখনও মনে হয়েছে আপনার?’ রানাকে জিজ্ঞেস করল ফ্রেনজি।

‘আই টোল্ড ইউ, অফিসার। মিস সোফিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র সাতদিনের। রোম অফিসের দায়িত্ব নেবার পরদিনই মিস্টার শেরম্যান আমাকে তার রোম আসার খবর দিয়ে অনুরোধ করেন আমি যেন সোফিয়াকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করি, হোটেল একসেলশিয়রে তুলে দেই। সেই মত কাজ করি আমি। এরপর দুতিনবারই কেবল দেখা হয়েছে আমাদের। এইটুকু সময়ের মধ্যে কারও মনের কথা কি করে জানা সম্ভব? তাছাড়া এ প্রসঙ্গ এখন আসছে কেন? অটোপসি রিপোর্ট তো...’

‘সরি, সেনর,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে রানার হাতে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে চেয়ে আছে ফ্রেনজি। ‘আমি আসলে সম্ভাবনার কথা ভাবছিলাম। বলা যায় না, পেটে আঘাতের ব্যাপারটা ডাক্তারের ভুলও হতে পারে। হয়ত আগে নয়, পড়ে গিয়েই আঘাতটা পেয়েছিলেন সেনরিনা। এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। হতে পারে,’ বলে আপনমনে মাথা ঝাঁকাল সে। ‘কি বলেন? অ্যাট লিস্ট, সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।’

একটু ভাবল রানা ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর বলল, ‘হ্যাঁ, তা ঠিক।’

‘ওইডোর ধারণা, খুব সম্ভব সেনরিনাকে ত্যাগ করেছিল তাঁর প্রেমিক। হয়ত সে দুঃখ সহিতে না পেয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তিনি।’

‘আমার মনে হয় না,’ বলল রানা। ‘এত সহজে আমেরিকান মেয়েরা আত্মহত্যা করে না। ওরা অনেক প্র্যাকটিক্যাল।’

‘ওখানেই সমস্যায় পড়েছি। হুইটনি ধরা না পড়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না আমরা কিছুতেই। ও ধরা পড়লেই বুঝব সব।’

ওইডো এসে বসল ফ্রেনজির পাশে। রানার দিকে চেয়ে থাকল শীতল চোখে। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করে আসছে ও, কেন যেন সহ্য করতে পারছে না লোকটা রানাকে।

‘এই হুইটনি যে লা সেনরিনার প্রেমিক ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই,’ বলল ফ্রেনজি। ‘মেয়েলোকটার কাছে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরের আগেই ভিলায় আসেন সেনরিনা-একা। তাকে তিনি বলেছিলেন যে পরদিন, শনিবার, দুপুরের পর নেপলস থেকে আসছেন তাঁর স্বামী। সাড়ে তিনটোর নেপলস-সরেনটো লোকালে। লা সেনরিনা এ-ও বলেছেন, তাকে রিসিভ করতে স্টেশনে যাচ্ছেন তিনি। মহিলা যেন সন্কে সাড়ে আটটার দিকে এসে ডিনারের ঐটো বাসন-কোসন ধুয়ে দিয়ে যায়। দুপুর দুটোর দিকে মহিলা বাসায় চলে যায়। এরপর সম্ভবত এমন কিছু ঘটেছে, যে কারণে লা সেনরিনা স্টেশনে যাননি। ব্যাপারটা তাঁর ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, দুটোই হতে পারে।’

‘কি ধরনের কিছু ঘটেছে বলে ভাবছেন?’

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। ‘হতে পারে হয়ত কোন মেসেজ পেয়েছেন তিনি যে তাঁর স্বামী আসছেন না ওই ট্রেনে।’ ঝট করে উঠে দাঁড়াল অফিসার। চোখমুখের ভাব দেখে বোঝা যায় যারপর নাই বিরক্তি বোধ করছে। লাউঞ্জের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করতে লাগল লোকটা। ‘আমি ভাবছি ওইডোর ধারণাই হয়ত ঠিক। স্বামী আসছেন না খবর পেয়েই হয়ত অভিমানে আত্মহত্যা করেছেন লা সেনরিনা।’

‘আপনার প্রথম ধারণাটাও তো ঠিক হতে পারে,’ মৃদু গলায় বলল রানা। ‘হয়ত এসব কিছুই না, ছবি তুলতে গিয়েই পড়ে গেছেন মিস সোফিয়া।’

দাঁড়িয়ে পড়ল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। ‘হতে পারে। কিন্তু তাতে হুইটনির ধাঁধাটা মিলছে না। একে আমার চাই-ই,’ দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে। ‘যে-কোন মুহূর্তে রোম পৌছাবেন ইল সেনর শেরম্যান, নো ডাউট। তাঁকে কি জবাব দেব ভেবে পাচ্ছি না কিছুই।’

• ‘আর যা-ই বলুন, প্রথম চোটেই মেয়ের প্রেগনেসির কথা জানাতে যাবেন না তাঁকে দয়া করে। ভদ্রলোক তাতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন।’

‘আমি না বললেই কি? অটোপসি রিপোর্ট বলবে। আমি আমার নিজের কথা ভাবছি, সেনর রানা। যা-তা বলে বুঝ দেয়া যাবে না সেনর শেরম্যানকে। তাঁর সামনে মুখ খুলতে হলে ফ্যাক্টস্ চাই আমার, নইলে বিপদে পড়ব। ওটাই এখন ভাবছি আমি।’

‘রাত দশটায় তাঁকে ফোন করব,’ বলল রানা। ‘নিশ্চয়ই সবকিছু জানতে চাইবেন ভদ্রলোক। কি বলব তাঁকে?’

‘ইনভেস্টিগেশনের এই পর্যায়ে যত কম বলে পারা যায় ঠিক সেটুকুই বলবেন, পুীজ। বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না। আর হুইটনির ব্যাপারটা উল্লেখ করার দরকার নেই। ওইভাবেই জানান, ছবি তুলতে গিয়ে...’

টেলিফোনের ঝন ঝন শব্দে থেমে গেল ফ্রেনজি। গুইডো রিসিভার তুলল। এক মুহূর্ত ও প্রান্তের বক্তব্য শুনে রানার দিকে তাকাল সে। ‘আপনার ফোন, সেনর।’

এগিয়ে এসে রিসিভারটা নিল রানা। বিস্মিত হয়েছে খানিকটা। 'হ্যালো?'

লিজার গলা ভেসে এল। 'রানা, মিস্টার শেরম্যান টেলিফোন করেছিলেন এইমাত্র। কাল ভোর আটটায় রোম আসছেন তিনি,' শেষ দিকে গলা প্রায় ভেঙে গেল তার।

এক মুহূর্ত থমকাল রানা। এত দ্রুত আসবেন শেরম্যান, ভাবেনি। একটা হালকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ওরা আসেনি এখনও?'

'না। আসেনি।'

'কিছু জিজ্ঞেস করেছেন উনি?'

'না, দুচার কথা বলেই রেখে দিয়েছেন ফোন। বললেন, আটটায় যেন এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকে লারসেন।'

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'কি আর করব। আমি থাকব এয়ারপোর্টে।'

'তারপর?'

'কিসের?'

'যদি খেপে যান শেরম্যান? এমনিতেই মনের অবস্থা ভাল নেই। তার ওপর...'

'সে আমি দেখব,' আশ্বার সাথে বলল রানা।

'বেশ। তুমি রোম আসছ কখন?'

ঘড়ি দেখল রানা। আটটা। 'এখনই রওনা হব।'

'আমি কি অফিসে থাকব?'

'কোন দরকার নেই। বাসায় চলে যাও। দরকার হলে যোগাযোগ করব।'

‘আচ্ছা, বেশ । তুমি ঠিক আছ তো?’

ভুরু কুঁচকে গেল রানার । ‘কি?’

‘কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো তোমার ওখানে?’ তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে ফেলেছে মেয়েটা, মনে হল রানার ।

‘হ্যাঁ, ঠিকই আছি । সো লং ফর নাউ ।’

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে চেয়ে আছে দুই লেফটেন্যান্ট ।

‘কাল ভোর আটটার ফ্লাইটে রোম আসছেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান,’ আশু করে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা । ‘এখন তাকে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত যা-ই বলি, কাজ হবে না । উনি নিশ্চয়ই রোম থেকে কানেকটিং ফ্লাইটে নেপলস আসবেন, সে, বিফোর নুন । কাজেই, এই সময়ের মধ্যেই আপনাদের যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে, লেফটেন্যান্ট । সবকিছু তাঁকে বিস্তারিত জানাবার জন্যে আপনার তৈরি থাকাই ভাল ।’

‘অল রাইট,’ ওইডোর সাথে চোখাচোখি হল ফ্রেনজির । ‘আশা করি তার আগেই রবার্ট হুইটনিকে ট্রেস করতে পারব আমরা ।’

‘তাহলে তো ভালই,’ হাসির ভঙ্গি করল রানা । কিন্তু দাঁতি ড্যাঙচানোর মত হয়ে গেল ।

ওইডোর দিকে ফিরল ফ্রেনজি । ‘থানায় ফোন কর । চব্বিশ ঘন্টা গার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে ভিলায় ।’

তাই করল ওইডো । ফোন সেরে বলল, ‘আসছে গার্ড ।’

‘সেনর রানা, জুয়েলারির বাক্সটার কথা ভুলে যাবেন না যেন ।’

‘ভুলব না ।’

হঠাৎ করেই কর্ম তৎপরতা বেড়ে গেছে যেন ফ্রেনজির । ঝট করে ওইডোর দিকে ফিরল । মুখ চলতে লাগল তুফান বেগে ।

‘খুঁজে দেখ রবার্ট হুইটনি নামে কাউকে চেনে কি না কেউ । সরেনটোয় তাকে দেখা গেছে কি না । আমেরিকান ট্যুরিস্টদের ব্যাপারে বিশেষ খোঁজখবর করবে, বিশেষ করে যারা একা ছিল গতকাল, তাদের ব্যাপারে । রেল স্টেশনে আমি খোঁজ নেব । তুমি সব হোটেল-রেস্তোরাঁ-কাফে, আর...ট্যাক্সি ড্রাইভারদেরও জিজ্ঞেস করবে । নেপলস থেকে তারা কাল বিদেশী কাউকে এনেছে কি না এখানে, বা নেপলস নিয়ে গেছে কি না । আর হ্যাঁ, অপারেটরকেও জিজ্ঞেস করতে হবে, কেউ টেলিফোন করেছিল কি না কাল বেলা ভিসটায়, সন্দের আগে । তাছাড়া সরেনটো আমালফি রোডে...’

এখন আর ফ্রেনজির একটা কথাও কানে ঢুকছে না রানার । চিন্তিত হয়ে পড়েছে ও । টের পাচ্ছে সময় আর বেশি নেই । যে-ভাবে বলছে লোকটা সে-ভাবে যদি খোঁজা হয়, নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে । ধড়া পড়তেই হবে ওকে ।

রানা সতর্ক হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা সোফিয়া মৃত, এটা জানার পরই । আগে নয় । নিশ্চয়ই অনেকেই ওর চেহারা দেখে রেখেছে কাল । বিশেষ করে যে-কাফেতে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় কাটিয়েছে ও, টেলিফোন করেছে ভিলায় । সরেনটো থেকে হেঁটে আসার পথেও অসংখ্য মানুষ ওকে দেখেছে । দেখেছে নিঃসঙ্গ এক ট্যুরিস্টকে, একমনে হেঁটে চলেছে আমালফির দিকে ।

ঘেমে উঠেছে রানা । অন্ধকার দেখছে চোখে ।

ব্যারিয়ারের সাথে হেলান দিয়ে রোমের নামকরা ইংরেজি দৈনিক 'ডেইলি স্পোকস্ম্যান'-এর পাতায় চোখ বোলাচ্ছে মাসুদ রানা। সবগুলো পাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে কোথাও সোফিয়া শেরম্যানের মৃত্যু সম্পর্কে কিছু লিখেছে কি না। কিন্তু না, পাওয়া গেল না খবরটা। খানিকটা আশ্বস্ত হল ও। পত্রিকাটা ভাঁজ করে কোটের সাইড পকেটে পুরল।

আশপাশে প্রচুর মানুষ, নিউ ইয়র্ক-রোম প্যান অ্যাম ফ্লাইটের অপেক্ষায় আছে। এখনও পাঁচ মিনিট দেরি আছে ওটা ল্যাও করতে। ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান আসছেন ওই বিমানে। রানা এসেছে তাঁকে রিসিভ করতে। একটু অস্বস্থিতে আছে ও লারসেনের ব্যাপারটা অদ্রলোক কিভাবে নেবেন ভেবে। একে মেয়ের শোক, তার ওপর ওর অনুপস্থিতি। রানা তাঁকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করুক, খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হয় না।

নারীকণ্ঠের একটা অ্যানাউন্সমেন্ট কানে যেতে সচকিত হল মাসুদ রানা। প্যান অ্যামের নিউ ইয়র্ক-রোম ফ্লাইট পাঁচ মিনিটের মধ্যে ল্যাও করবে বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। পর 'পর তিনবার ঘোষণা করে ধেমে গেল স্পীকার। প্রায় সাথে সাথেই পূর্ব আকাশে

দেখা দিল বিমানটি, ভোরের কচি রোদে চিক চিক করছে
অ্যালুমিনিয়ামের ফিউজিলাজ।

ঘুরে বিমানবন্দরের পশ্চিম প্রান্তে ল্যাণ্ড করল ওটা।
অনেকখানি জায়গা নিয়ে চক্কর দিয়ে ধীরে ধীরে থেমে দাঁড়াল এসে
ব্যারিয়ারের সামনে। দেখামাত্রই চিনল রানা ভদ্রলোককে। বুঝতে
অসুবিধে হয় না, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান।
ছয় ফুটের বেশি লম্বা। সাঙঘাতিক মোটা, ঠিক যেন একটা ড্রাম।
বয়স ষাটের কাছাকাছি।

চেহারা অবিকল বেনিটো মুসোলিনির। বর্তমান মুখভঙ্গিটাও
তেমনি নির্দয় গোঁয়ারের মত—যেন সবাইকে এক হাত দেখিয়ে
দেবার জন্যে মুখিয়ে আছেন। হাতে মাঝারি আকারের একটা
ব্রিফকেস। দীর্ঘ পায়ে হেলেদুলে এগিয়ে আসছেন ব্যারিয়ারের
দিকে।

ভদ্রলোকের উপস্থিতিটাই যেন কেমন। আশপাশের সবাইকে
তাঁর সামনে ভীষণরকম ম্লান মনে হয়। এই লোকের ছঁবিই কাল
ওকে দেখিয়েছে লিজা। ব্যারিয়ার পেরিয়ে এসে বাঘের চোখে
এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান, পিটার
লারসেনকে খুঁজছেন।

সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ‘মিস্টার শেরম্যান?’

‘ইয়েস?’ চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকালেন তিনি। প্রকাণ্ড
মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে গরমে, ঘামে জবজব করছে।

‘আমি মাসুদ রানা,’ মুখটা অতিরিক্ত গভীর করে রেখেছে
ও, যাতে ধমক-ধামক মারার আগে ভাবনা-চিন্তা করে নেন
ভদ্রলোক। ‘আপনাকে নিতে এসেছি আমি।’

‘কেন? লারসেন কোথায়? আমার আসার খবর পায়নি?’

‘পেয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আটকা আছে সে, তাই আসতে পারেনি।’

রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকবার চোখ বোলালেন শেরম্যান। ‘আই সী! কোথায় আছে সে?’

যেন শুনতে পায়নি রানা, এমনভাবে বলল, ‘আসুন, পূজ। গাড়ি নিয়ে এসেছি আমি আপনার জন্যে। যেতে যেতে কথা বলব।’

‘কিন্তু আপনি কেন...’

‘আমি লারসেনের বন্ধু,’ ব্রিফকেসটা তাঁর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল রানা। তারপর দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, দাপটের মানুষ শেরম্যান, তাঁর সাথে পাল্টা দাপট দেখাতে হবে। নইলে রানা যেভাবে চাইছে সেভাবে ওর বশে থাকবেন না ভদ্রলোক। ‘সঙ্গে আর কোন লাগেজ আছে?’

‘না।’ দ্রুত পায়ে ওর পাশে পৌঁছে গেলেন শেরম্যান। ঘন ঘন চাইছেন মুখের দিকে। না তাকিয়েও বুঝতে পারছে রানা, কৌতূহলী করে তুলতে পেরেছে ও তাঁকে।

‘সরেনটো পুলিশ আপনার সাথে সঙ্গে সাতটায় বসবে। রোম ইন্টারকন্টিনেন্টালে সুইট বুক করে রেখেছি আমি আপনার জন্যে। সরেনটোতেও হোটেল বুক করেছি। তিনটের ফ্লাইটে নেপলস যাচ্ছি আমি আর আপনি।’

গাড়ির দরজা মেলে ধরল রানা ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের জন্যে। তিনি উঠে বসতে ব্রিফকেসটা পিছনের সিটে রেখে সে-ও উঠল।

পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এসে তুমুল গতিতে গাড়ি ছোটাল শহরের দিকে।

‘আপনি যাচ্ছেন...আমার সাথে? কেন, লারসেন যাবে না?’
ভুরু কুঁচকে গেছে মুসোলিনির। গলার স্বরে রাগ রাগ ভাব। কিন্তু বেশি চোটপাট দেখাতে সম্ভবত ভরসা পাচ্ছেন না। রানার ভাব-ভঙ্গি কথাবার্তা দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে তাঁকে।

‘না। এ মুহূর্তে রোমের বাইরে আছে লারসেন। হানিমুন করতে গেছে।’

‘হোয়াট!’ ঘুরে বসলেন শেরম্যান। ‘ফর গড’স সেক, কি বলছেন এসব আপনি? কাল আমাকে টেলেক্স করেছে ও, আর...’

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিল রানা। ‘ও নয়, আমিই করেছি টেলেক্স।’

থমকে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ একভাবে চেয়ে থাকলেন রানার মুখের দিকে। তারপর থমথমে গলায় বললেন, ‘এসবের কি অর্থ?’

পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে পাঁচ মিনিট সময় লাগল রানার। শুনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন ভদ্রলোক, নড়াচড়া করতেও ভুলে গেছেন। বিশ্বাস করবেন কি করবেন না ভেবে পাচ্ছেন না সম্ভবত। অভিজ্ঞতাটা যেমন অভিনব তেমনি অভাবনীয়ও বটে, যা ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের মত ইম্পাতদূঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষকে পর্যন্ত হতবাক করে দিয়েছে। চোখমুখ কুঁচকে রানার দিকে চেয়ে থাকলেন তিনি অনেকক্ষণ।

খবরটা হজম করার জন্যে তাঁকে কিছুটা সময় দিয়ে আবার মুখ খুলল রানা, ‘টেলিফোনে সেদিনও আমার সাথেই কথা

বলেছেন আপনি। পরদিন সোফিয়াকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করি আমি, আপনার কথামত হোটেল একসেলশিয়রে তুলে দেই। মাত্র একদিনই হোটেলে ছিল সে, পরদিন ভায়া ক্যাভোরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে চলে যায় কাউকে কিছু না জানিয়েই। মৃত্যুর আগে তিন কি চারবার তার সাথে দেখা হয়েছে আমার।’

থামল মাসুদ রানা। আশা করছে কিছু বলবেন শেরম্যান। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ‘গতকাল সরেনটো গিয়েছিলাম সোফিয়ার ডেডবডি আইডেন্টিফাই করার জন্যে। আমি দুঃখিত, মিস্টার শেরম্যান।’

‘থ্যাঙ্ক ইউ।’ গলার স্বরে বিন্দুমাত্র রাগের আভাস নেই তাঁর। একেবারে খুশি মনে না হলেও বাস্তব সত্যকে মেনে নিতে পারছেন বলে মনে হল রানার। ব্যাপারটা এত সহজে মিটে যাবে ভাবেনি ও।

‘পুলিস আপনাকে অ্যালাউ করল কেন আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপারে?’

‘ওরা জানে আমিও নিউ ইয়র্ক ভিশনের রিপোর্টার। লারসেনের রিলিভার হিসেবে কাজ করছি।’

‘আচ্ছা!’

‘সোফিয়ার পরিচয় কনফার্ম হবার পর লারসেনের বাসায় ফোন করে পুলিস। ওকে না পেয়ে ওর পি. এ.-কে জানায় তারা মৃত্যু সংবাদ,’ কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘সিচুয়েশন ফেস করা ছাড়া উপায় ছিল না আমার। সে সময় লারসেনের প্রসঙ্গ তুললে অনর্থক সময় নষ্ট হত, ময়না তদন্ত পিছিয়ে যেত। তাই নিজেকে ওর রিলিভার পরিচয় দিয়েছি আমি বাধ্য হয়ে। সোফিয়াকে না চিনলে

হয়ত এ কাজ করতাম না।’

‘হুম!’ ব্যাখ্যাটা মনে হল পছন্দ হয়েছে তাঁর। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আনমনা।

‘আইডেন্টিফিকেশনের পর আপনাকে টেলেক্স করতে বলি আমি লিজাকে।’

‘অটোপসি হয়ে গেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘মৃত্যুর কারণ কি বলা হয়েছে রিপোর্টে?’

‘ক্লিফ থেকে পড়ে মারা গেছে।’ গতি কমিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিল মাসুদ রানা।

‘কি করে পড়ল জানা গেছে?’

‘পুলিসের ধারণা ছবি তোলার সময় অসাবধানে ঘটেছে ব্যাপারটা।’ জিজ্ঞেস করলে প্রথমে শুধু এটুকুই বলতে অনুরোধ করেছে ওকে ফ্রেনজি। বাকি যা বলার সে বলবে।

‘আপনার নাম কি বললেন যেন? আই ফরগট।’

‘মাসুদ রানা।’

চোখ কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে থাকলেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। প্রায় বিড় বিড় করে বললেন, ‘নামটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। কি করেন আপনি?’

‘ব্যবসা করি।’ আবার বাঁয়ে টার্ন নিল রানা। আর একশো গজ এগোলেই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল।

‘কি ধরনের? আই মীন, কি ব্যবসা, বলতে আপত্তি আছে?’ একটা চুরুট ধরালেন ভদ্রলোক।

‘একটা ছোটখাট ইনভেস্টিগেটিভ ফার্ম আছে আমার।’ গেট

দিয়ে হোটেল কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়ল কালো বুইক। পোর্চের নিচে এসে থামল রানা। পাশে তাকাল। এখনও চেয়ে আছেন শেরম্যান। ‘রানা এজেন্সি,’ মৃদু গলায় বলল ও।

মুহূর্তে থতমত খাওয়া চেহারা হল তাঁর। চুরুট টানা ভুলে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকলেন রানার দিকে। হতভম্ব শেরম্যানকে কোন মন্তব্য করার সুযোগ দিল না ও। চট করে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ব্রিফকেসটা নিয়ে গাড়ির চাবি পোর্টারের হাতে তুলে দিল রানা। ‘চলুন,’ বলে পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় আচমকা সচকিত হলেন তিনি।

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। ‘ওটা আমাকে দিন, ওটা আমাকে দিন।’ ব্রিফকেসটা নেবার জন্যে প্রায় কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলেন।

‘কোন অসুবিধে নেই,’ শান্ত গলায় বলল মাসুদ রানা। ‘থাকুক আমার কাছে।’

রিসেপশন ডেস্ক থেকে ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের নামে বুক করে রাখা লাগজারি স্যুইটের চাবি নিল রানা। একটা কার্ড এগিয়ে দিল ক্লার্ক, সশ্রদ্ধ চোখে চেয়ে আছে শেরম্যানের বিশাল বপুর দিকে। ‘এখানে সই করুন, প্লীজ, সেনর।’

এলিভেটরে চড়ে বারো তলায় উঠে এল ওরা। ভেতরে ঢুকল না রানা। দরজা খুলে ব্রিফকেসটা বাড়িয়ে দিল ভদ্রলোকের দিকে। ‘আপনি বিশ্রাম করুন। আড়াইটায় আপনাকে তুলে নিতে আসব আমি।’

‘আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব,’ আমতা আমতা করতে লাগলেন তিনি। ‘অনেক কষ্ট করলেন।’

হাসি পেল রানার। প্রচণ্ড ক্ষমতামাশী, বদরাগি মানুষটিকে

এত সহজে ম্যানেজ করতে পারবে কল্পনাই করেনি। 'না না, এ আর এমন কি। আর আমি লারসেনের বন্ধু, আমার সাথে ফর্মাল হবার কোন দরকার নেই।' ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'সী ইউ অ্যাট টু থার্টি।' লম্বা, মাপা পায়ে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে চলল। পিছন থেকে যতক্ষণ দেখা যায় একভাবে ওর দিকে চেয়ে থাকলেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান।

তিনটের ফ্লাইটে নেপলস এল ওরা। ভিসুভিয়াস হোটেলে শেরম্যানকে তুলে দিল রানা। নিজে উঠল হোটেল মার্স ইন্টারন্যাশনালে। সাড়ে ছটার দিকে টেলিফোনে লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজিকে ভিসুভিয়াস হোটেলে আসতে বলে বেরিয়ে পড়ল রানা।

বিলাসবহুল স্যুইটের লাউঞ্জে বসে চুরুট টানছেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। নেপলস আসার পথে প্লেনে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে তাঁর রানার সাথে। লারসেনের ব্যাপারে মনের মধ্যে যেটুকু ক্লোড জমেছিল, প্লেন নেপলস-এর মাটি স্পর্শ করার আগেই গায়েব হয়ে গেছে তা পুরোপুরি। রানার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব যেন জাদু করেছে শেরম্যানকে। ওর অপেক্ষাতেই ছিলেন তিনি।

খুশি হয়ে উঠলেন রানাকে দেখে। 'কাম ইন, রানা।'

ভেতরে পা রেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল ও। শেরম্যানের সামনের সোফায় বসে আছে অল্পবয়সী এক সুন্দরী। শুধু সুন্দরী-ই নয়, একেবারে চোস্ত সুন্দরী। বসার ভঙ্গিতে ফুটে আছে রূপের অহঙ্কার। পরনে টাইট ফিট আকাশী-নীল সিল্কের পোশাক, পায়ে সাদা হীল। মাথায় ছোট একটা কালো হ্যাট, মাঝারি আকারের তিনটে ডায়মণ্ড বসানো আছে তাতে।

‘রানা, মীট মাই ওয়াইফ । প্যামেলা ।’ স্ত্রীর দিকে ফিরলেন তিনি । লক্ষ্য করল রানা, পলকে বদলে গেছে শেরম্যানের চেহারা । হাসি হাসি মুখটা কঠোর হয়ে উঠেছে কেন যেন । ‘প্যামেলা, এ মাসুদ রানা । পত্রিকার রোম ব্যুরো চীফ ।’ কথাগুলো প্রায় ঠাসঠাস ভঙ্গিতে বললেন তিনি ।

সসম্মানে নড করল রানা প্যামেলাকে । মনে মনে ভাবল, ব্যাপার কি? স্ত্রীর কাছে ওর মিথ্যে পরিচয় কেন দিলেন ভদ্রলোক?

‘রোমেই ছিল ও,’ কোন অদৃশ্য সুইচ টিপে হাসিটা ঠোটে ফিরিয়ে আনলেন তিনি । ‘শপিং করতে এসেছিল সপ্তাখানেক আগে । তোমার পি.এ.-র কাছে খবর পেয়ে চলে এসেছে ।’

‘বড় দুঃখজনক মৃত্যু,’ বলল প্যামেলা । সরাসরি রানার দিকে চেয়ে আছে । ‘কি বলেন?’

কেন যেন চাউনিটা পছন্দ হল না রানার । ‘ঠিক,’ বলল ও । এ পাশের একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে পড়ল । এই মেয়েই তাহলে ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের লেটেস্ট বউ, সোফিয়ার দুবছরের ছোট!

‘ওরা এসে পড়বে এখনই,’ শেরম্যানের উদ্দেশে বলল রানা ।

মাথা দোলালেন তিনি । ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন চুরুটে । ঠিক সাতটায় নক হল দরজায় । রানাই উঠে গিয়ে ভেতরে নিয়ে এল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি এবং গুইডোকে । পরিচয় পর্ব সমাধা হল খুবই সংক্ষেপে । এরপর অফিসারদের বসার জন্যে শেরম্যানের সামনের সোফাটা ছেড়ে উঠে গেল প্যামেলা ।

রাস্তার দিকের জানালা ঘেঁষা একটা রকিং চেয়ারে কাত হয়ে বসল সে পায়ের ওপর পা তুলে । তার সুন্দর হাঁটুর ওপর ঘন ঘন নজর যাচ্ছে আগন্তুক দুজনের । খেয়াল করছে রানা, দুই গোয়েন্দা

টুকতেই হঠাৎ করে যেন পাল্টে গেছে ঘরের পরিবেশ। কেমন একটা টান টান ভাব, ঝড়ের আগে যেমন আচমকা থেমে যায় বাতাস, অনেকটা তেমনি।

অনেক গভীর হয়ে গেছেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। স্থির চোখে দেখছেন ফ্রেনজিকে। সকালে এয়ারপোর্টে শেরম্যানের যেমন চেহারা দেখেছিল রানা। এ সেই চেহারা। তাঁর তাকানোর ভঙ্গিটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল অফিসারকে, উসখুস করতে লাগল লোকটা।

‘ওকে,’ ঝ্যাক করে উঠলেন তিনি। ‘লেট’স হ্যাভ দ্য ফ্যাক্টস।’

‘ব্যাপারটা আপনার জন্যে পেইনফুল হবে, সেনর শেরম্যান,’ শান্ত গলায় বলল ফ্রেনজি। ‘তবুও যখন জানতে চাইছেন, জানাব আমি।’

আধপোড়া চুরুটটা কামড়ে ধরে মূর্তির মত বসে আছেন বিশালদেহী মুসোলিনি। নীলচে ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে তাঁর কঠিন মুখের একপাশ ছুঁয়ে। খলথলে লোমশ হাত দুটো কোলের ওপর ভাঁজ হয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে। দৃষ্টি স্থির।

‘থ্যাঙ্ক ইউ,’ বললেন তিনি। ‘ব্যথা সামলাবার সামর্থ্য আছে আমার। আপনি বলে যান।’

‘ছয় দিন আগে,’ থেমে থেমে, সময় নিয়ে বলতে শুরু করল গোয়েন্দা। ‘আপনার মেয়ে, লা সেনরিনা সোফিয়া, বিমানে করে নেপলস আসেন প্রথমবার। সেখান থেকে লোকাল ট্রেনে সরেনটো আসেন এক ভিলার এস্টেট এজেন্টের সাথে দেখা করার জন্যে,’ এমনভাবে বলছে ফ্রেনজি, রানার মনে হল যেন মুখস্থ বক্তৃতা। বহুবার মহড়া দিয়ে নিয়েছে। ‘নিজেকে তিনি মিসেস রবার্ট

হুইটনি নামে পরিচয় দেন এন্টেট এজেন্টকে। বলেছেন আমেরিকান এক ব্যবসায়ী, মিস্টার রবার্ট হুইটনির স্ত্রী তিনি।’

দ্রুত শেরম্যানের মুখের ওপর নজর বোলাল রানা। তেমনি বসে আছেন মানুষটি, নড়েননি একচুল। শুধু মুখের চুরুটটা সামান্য খাটো হয়েছে, লম্বা হয়েছে পোড়া অংশ। প্যামেলার দিকে তাকাল ও। জানালা দিয়ে রাস্তা দেখছে। ফ্রেনজির কথা শুনছে বলে মনে হয় না।

‘এজেন্টকে ট্যুরিস্ট গাইডে উল্লেখ করা বিশেষ একটা ভিলার নাম জানান লা সেনরিনা,’ বলে চলল ফ্রেনজি পরিষ্কার, ঝরঝরে ইংরেজিতে। ‘ভিলাটার নাম বেলা ভিসটা। একটা ক্রিফের ওপরে। জায়গাটা নিরিবিলি বলে ওটা খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। জানান, প্রথমে তিনদিনের জন্যে ভাড়া নেবেন ভিলাটা। পরে যদি স্বামীর পছন্দ হয়, তাহলে আজ থেকে, অর্থাৎ সোমবার থেকে আরও এক মাসের জন্যে নেবেন ওটা। পয়সা যা লাগে দিতে আপত্তি নেই তাঁর। পরে ব্যাপারটা ফয়সালা হলে লা সেনরিনা এজেন্টকে একজন কাজের মেয়ে যোগাড় করে দেবার অনুরোধ করেন।’ সেই মত এজেন্ট কাছের গ্রাম থেকে এক বয়স্ক মহিলাকে নিয়ে এসে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। মহিলাকে পছন্দ হয় সেনরিনার। তাকে শুক্রবার বারোটোর দিকে ভিলায় আসতে বলে রোম ফিরে আসেন তিনি। পরেরবার, শুক্রবার, সাড়ে এগারটা থেকে বারোটোর মধ্যে বেলা ভিসটায় পৌঁছান লা সেনরিনা। রোম থেকে সরাসরি গাড়ি নিয়ে আসেন তিনি, একটা লিঙ্কন কনভার্টিবল। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছেন।’

‘গাড়িটা কার নামে রেজিস্ট্রি করা?’ বললেন শেরম্যান।

‘লা সেনরিনার নিজের নামে ।’

চুরুটের ছাই ঝাড়লেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান । ‘বলে যান ।’

‘কথায় কথায় মহিলাকে তিনি বলেছিলেন যে শনিবার সাড়ে তিনটের লোকালে তাঁর স্বামী আসবেন নেপলস থেকে । এজেন্টের কাছে স্বামীকে তিনি ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিলেও তাকে বলেছেন যে, তাঁর স্বামী নাকি খবরের কাগজে চাকরি করেন, সাংবাদিক ।’

ধড়াশ করে লাফিয়ে উঠল রানার কলজেটা । পলকে মুখের রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা । ফ্রেনজি তাকিয়েছিল কি না জানে না, কিন্তু গুইডো ওর চোখে চোখে চেয়ে ছিল, পরিবর্তনটা পরিষ্কার দেখে ফেলেছে সে । ঠোঁট সামান্য বেঁকে গেল লোকটার, মনে হল যেন হাসছে । প্রচণ্ড মানসিক শক্তি খরচ করে নিজেকে সামলাল রানা । শেরম্যান ব্যাপারটা লক্ষ্য করছেন কি না ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ল ।

‘তবে এটা বোঝা গেছে,’ বলছে ফ্রেনজি, ‘তাঁর স্বামী, রবার্ট হুইটনিকে খুব বেশি ভালবাসতেন লা সেনরিনা ।’

এই প্রথম সামান্য একটু প্রতিক্রিয়া দেখা গেল শেরম্যানের মধ্যে । দুহাত মুঠো করে ধরে থাকলেন তিনি কয়েক সেকেন্ড । তারপর টিল দিলেন পেশীতে । আরেকবার ছাই ঝেড়ে হেলান দিয়ে বসলেন ।

‘তারপর?’

‘শনিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে বেলা ভিসটায় যায় সেই মহিলা । লা সেনরিনার নাশতার ঐটো কাটলারিজ ধোয়া মোছা করে । তারপর ভিলা ঝাঁট দেয় । তাকে সেনরিনা জানান, দুপুরে স্টেশনে যাচ্ছেন তিনি মিস্টার রবার্ট হুইটনিকে রিসিভ করতে । সে

তিক্ত অবকাশ-১

যেন সন্ধে সাড়ে আটটার দিকে একবার এসে ডিনারের বাসন-কোসন ধুয়ে দিয়ে যায়। দুটোর দিকে তখনকার মত কাজ শেষ করে ফিরে আসে মহিলা। সে সময় লাউঞ্জের ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছিলেন লা সেনরিনা। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি ওর পর আর কেউ তাঁকে জীবিত দেখেনি।’

নড়েচড়ে বসল প্যামেলা শেরম্যান। ওপরের পা নিচে, নিচের পা-টা ওপরে তুলে আগের মতই কাত হয়ে বসল। তবে এবার উল্টোদিকে। তার সুন্দর চোখ দুটো সরাসরি রানার মুখের ওপর সঁটে আছে। ভাব দেখে মনে হল চিত্তিত। চেয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না ওকে।

‘তখন থেকে সন্ধে সোয়া আটটা পর্যন্ত, এই সময়টা, নিয়ারলি অ্যাবাউট সিক্স অ্যাও আ কোয়ার্টার আওয়ারস্, কি করছিলেন লা সেনরিনা, সম্ভবত কোনদিনই জানতে পারব না আমরা।’

চাউনি সরু হয়ে এল শেরম্যানের। ‘সোয়া আটটা? কেন?’

‘ওই সময়ই মারা গেছেন লা সেনরিনা,’ বলল ফ্রেনজি। ‘কোন সন্দেহ নেই তাতে। হাতঘড়ি হাতেই ছিল তাঁর, পতনের ফলে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ঠিক আটটা পনেরয় থেমে আছে কাঁটা দুটো।’

লোহার মত শক্ত হয়ে গেল রানার পেশী। সেই সাথে বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল মনের ভেতর। এ আরেকটা খবর! ঠিক ওই সময়ই ক্রিফে ছিল রানা, খুঁজে ফিরছিল সোফিয়াকে। ধরা পড়লে কাউকেই বিশ্বাস করাতে পারবে না ও যে বেলা ভিসটায় সে ছিল ঠিকই তখন, কিন্তু সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে তার হাত নেই।

‘আপনার মেয়ের মৃত্যুটা একটা নিছক দুর্ঘটনা,’ ফ্রেনজি বলে

চলেছে, 'কথাটা বলতে পারলে খুব স্বস্তি পেতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পারছি না।'

মুখ থেকে চুরুটটা হাতে নিলেন শেরম্যান। আলতো করে নামিয়ে রাখলেন সামনের সুদৃশ্য পাথরের অ্যাশটের ওপর। 'না পারার কারণ?'

'এর ভেতরে আরও অনেক জটিলতা আছে, সেনর। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে আমাকে। পরিষ্কার উত্তরটা দিতে পারব তার পর। আগে নয়। তারপরও আমি মনে করি তিনভাবে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে লা সেনরিনার।'

'বলে যান,' চুরুটটা তুলে নিয়ে ছোট ছোট দুটো চুমুক দিলেন তিনি। আবার রাখলেন ওটা অ্যাশটেতে।

রানার ওপর থেকে দৃষ্টি সরে গেল প্যামেলার। মাথাটা সামান্য কাত করে শ্রবণেন্দ্রিয়কে পুরোপুরি সজাগ, সতর্ক করে তুলল সে। যাতে একটা অক্ষরও শুনতে ভুল না হয়।

'মৃত্যুর আগে ক্রিফ হেডে দাঁড়িয়ে নিজের সিনে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছিলেন তিনি। মৃতদেহের কাছেই ওটা খুঁজে পেয়েছি আমরা। মনে হয় ক্রিফের একেবারে কিনারায় ছিলেন তিনি তখন। সবাই জানে, ক্যামেরার ভিউ ফাইণ্ডারে চোখ রাখলে স্বভাবতই দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়। হয়ত ওরকম কোন অসতর্ক মুহূর্তে পা ফসকে পড়ে গেছেন সেনরিনা,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রেনজি। 'এই গেল একটা সম্ভাবনা।'

'ইয়েস ইয়েস,' অসহিষ্ণুর মত বললেন শেরম্যান। 'নেক্সট?'

'অথবা কেউ ফেলে দিয়েছে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে।'

'হোয়াট!'

‘ইয়েস, সেনর । আ’য়্যাম সরি । অটোপসি রিপোর্ট বলছে, মৃত্যুর আগে যে ভাবেই হোক তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন তিনি । সম্ভবত লাথি বা ওই ধরনের কিছু হবে ।’

চেহারাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের । সামনে ঝুঁকে চোখ-মুখ কুঁচকে অপলক চেয়ে আছেন ফ্রেনজির দিকে । ভাব দেখে মনে হল যে-কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড দাবড়ি মেরে বসবেন লোকটাকে । ওই অবস্থায় কেটে গেল ঝাড়া দুমিনিট । নীরবে । কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না কেউ । ভদ্রলোকের কড়া চাউনি সহ্য করতে না পেরে অনেক আগেই নিজের হাতের তালু পরীক্ষা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ভিটেলা ফ্রেনজি । গুইডো জানালা দিয়ে আকাশ দেখছে ।

একসময় সচেতন হলেন শেরম্যান । ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লেন । ‘তৃতীয় সম্ভাবনার কথাটা?’ খানিকটা নরম সুরে উচ্চারণ করলেন তিনি ।

‘আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন লা সেনরিনা,’ ভয়ে ভয়ে বলল ফ্রেনজি ।

‘কেন আত্মহত্যা করবে সোফিয়া?’

গলা যথাসম্ভব নিচু করে বলল অফিসার, ‘তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তিনি ।’

হাজার চেষ্টা করেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাই বলতে পারলেন না ভদ্রলোক । কয়েকবার মুখ খুলেও বুজে ফেলতে বাধ্য হলেন কি বলবেন ভেবে না পেয়ে ।

‘ওহ, ডার্লিং!’ হঠাৎ ককিয়ে উঠল প্যামেলা, যেন কেঁদে ফেলবে এখনই । ‘আমাদের সোফিয়া...আই কান্ট বিলিভ দ্যাট...’

‘শাটা-আ--প!’ ঘরদোর কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন শেরম্যান। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বোকা বনে গেল মাসুদ রানা। এমন ভয়ঙ্কর রেগে গেছেন যে ওরা ঘরে না থাকলে হয়ত এই মুহূর্তে গলা টিপে শেষ করে ফেলতেন মেয়েটিকে। ‘মুখ সামলে কথা বল!’

ঝট করে ফ্রেনজির দিকে ফিরলেন তিনি সবার কলজে হিম করে দিয়ে। বুঝতে কারও অসুবিধে হল না, মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে রীতিমত সংগ্রাম করছেন তিনি নিজের সাথে। ওদিকে মনে হল ধমক খেয়ে লজ্জা পেয়ে গেছে প্যামেলা। চোখ নামিয়ে নিয়েছে।

থমথমে গলায় বললেন শেরম্যান। ‘ডাক্তার বলেছে এ কথা?’

‘জি, সেনর। আমার কাছে অটোপসি রিপোর্টের কপি আছে। চাইলে দেখতে পারেন।’

‘প্রেগনেন্ট! সোফিয়া?’ আশ্চর্য দ্রুততার সাথে উঠে দাঁড়ালেন তিনি বিশাল ধড়টা নিয়ে। দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন ওদের চারদিকে। ধাক্কাটা এতই জোরাল যে স্থির রাখতে পারছেন না নিজেকে। মানুষটিকে এ মুহূর্তে বড্ডো অসহায় লাগছে রানার, একেবারে শিশুর মত অসহায়। যেন এ শেরম্যান সে শেরম্যান নয়।

সুস্থির হতে প্রচুর সময় লাগল তাঁর। ফিরে এসে বসে পড়লেন ‘আগের জায়গায়। চুরুটটা নিভে গেছে। ওটা ফেলে আরেকটা ধরালেন। দীর্ঘ পাঁচ মিনিট পর আবার যখন মুখ খুললেন, দুই গোয়েন্দার সাথে রানারও ভুল ভাঙল। আগের সেই দাপটের মানুষটির-ই গলা এটা।

‘ও আত্মহত্যা করেনি, অফিসার,’ বললেন তিনি। ‘আমার তিন্ত অবকাশ-১

মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। সাধারণ মেয়েদের চাইতে অনেক শক্ত মনের মেয়ে ছিল ও।’

‘জি, সেনর।’ নির্দিধায় সিদ্ধান্তটা মেনে নিল ফ্রেনজি। বুঝতে পেরেছে কথা বাড়ালেই বিপদ বাড়বে।

আবার উঠলেন শেরম্যান।

অস্থির পায়ে ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছেন। দাঁতে কামড়ে ধরে আছেন চুরুট। দুহাত পকেটে। স্থায়ীভাবে কুঁচকে আছে চোখমুখ। অস্বস্তিকর আরও কয়েকটা মিনিট নীরবে কেটে গেল। এক সময় থামলেন তিনি, জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘লোকটা কে, হুইটনি?’

‘আমরা জানি না, সেনর,’ বলল ফ্রেনজি। ‘খোঁজ-খবর নিয়ে যতদূর জানতে পেরেছি এ মুহূর্তে ইটালীর কোথাও এই নামে কোন আমেরিকান ট্যুরিস্ট নেই। মনে হয় লা সেনরিনা তার নামটাও সত্যি বলেননি।’

ফিরে এসে বসলেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। ‘হতে পারে। হয়ত যুক্তি করে নিজেদের নাম ভাঁড়িয়েছে ওরা পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে।’

‘তা সম্ভব,’ বলল ফ্রেনজি। ‘আমরা তদন্ত করে দেখেছি ওইদিন সত্যিই সাড়ে তিনটের ট্রেনে একজন ট্যুরিস্ট সরেনটো এসেছিল, একা। তবে লোকটি আমেরিকান কি না, জানা যায়নি এখনও। আশা করছি জেনে যাব আজ-কালকের মধ্যেই। সরেনটো-আমালফি রোড ধরে হেঁটে ভিলার দিকে এগোতে দেখা গেছে লোকটিকে।’

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল রানার। খটখটে হয়ে গেছে মুখের

ভেতরটা। শুকনো জিভ দিয়ে ঠোট ভেজানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। কতখানি জেনেছে লোকটা?

‘সঙ্গে একটা লাগেজ ছিল তার। একটা ব্রিফকেস। স্টেশনের লেফট লাগেজ অফিসে সেটা জমা রেখেছিল সে রাত দশটা পর্যন্ত। সম্ভবত আর কোন লাগেজ ছিল না সঙ্গে। তবে দুর্ভাগ্য, একেকজন একেকরকম চেহারার বর্ণনা দিচ্ছে তার। আসলে কেউ ভাল করে লক্ষ্য করেনি লোকটাকে। তার পোশাকের ব্যাপারে অবশ্য সবাই একমত, লাইট গ্রে সুট পরে ছিল সে। লেফট লাগেজ অফিসের কেয়ানি বলছে প্রায় ছফুট লম্বা ছিল লোকটা। আবার কেউ বলছে খাটো। রাত দশটায় সুটকেসটা কালেক্ট করে ট্যাক্সি নিয়ে নেপলস রওনা হয় লোকটা। কারণ রাতের শেষ ট্রেন তখন ছেড়ে গেছে অলরেডি। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে অনেক টাকার লোভ দেখায় সে। বলে, নেপলস-রোম এগারটা পনেরর এক্সপ্রেস ধরিয়ে দিতে পারলে ডবল ভাড়া, এবং পাঁচ হাজার লিরা বখশিশ দেবে।’

‘তারপর? ধরিয়ে দিতে পেরেছিল?’

‘জি, পেরেছিল। নেপলস নেমে খুশি হয়ে ড্রাইভারকে পুরো দশ হাজার লিরা টিপস দেয় লোকটা।’

ফ্রেনজির মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন শেরম্যান। রানার মনে হল শিকারের অপেক্ষায় বসে আছে বাঘ, এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। ‘সরেনটো-আমালফি রোড-ই কি বেলা ডিসটায় যাওয়ার একমাত্র পথ?’

‘জি।’

‘সোফিয়া মারা গেছে সোয়া আটটায়?’ ডান হাত মুঠো করে তিষ্ঠ অবকাশ-১

বাঁ হাতের তালুতে একের পর এক ঘুসি মেরে চলেছেন তিনি।
আস্তু হলেও শব্দ উঠছে পটাশ পটাশ।

‘জি।’

‘অ্যাও দিস ফেলা, ট্যাক্সি নিয়েছে দশটার দিকে?’

‘সোয়া দশটার দিকে, অনুমান।’

‘বেলা ভিসটা থেকে সরেনটো আসতে কতক্ষণ লাগে?’

‘গাড়িতে আধঘন্টার মত। হাঁটাপথে...ঘন্টা দেড়েক।’

‘আপনি বলতে চাইছেন, হেঁটে সরেনটো ফিরেছে সে, যে
জন্যে ট্রেন ফেল করেছে। বাধ্য হয়েছে ট্যাক্সি নিতে, এই তো?’

‘জি, সেনর।’

আবার কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটল। রানার মনে হল ব্যস্ত হয়ে
কোন একটা হিসেব মেলাতে চাইছেন যেন শেরম্যান। কোন
সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চাইছেন। অথবা গুরুতর কোন পয়েন্ট আবিষ্কার
করার চেষ্টা করছেন। একটু পর মুখ তুললেন তিনি। কড়া চোখে
তাকালেন ফ্রেনজির দিকে।

‘লোকটা যদি সোফিয়াকে খুন করেই থাকে, তো হেঁটে
সরেনটো ফেরার ঝুঁকি নিতে যাবে কেন সে? বিশেষ করে
সোফিয়ার গাড়িটা যখন ওখানেই পড়ে ছিল? সময়ের হিসেব
নিয়ে ভাবলে সেরকমই মনে হয় বটে, কিন্তু এর পেছনে যুক্তি কি?
গাড়ি নিয়ে এসে সহজেই তো ট্রেন ধরতে পারত লোকটা, সে
ক্ষেত্রে কোন বোকা নিজের পা দুটোকে কষ্ট দেবে? কেন তা
করবে খুনি? কেন ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে নিজের ব্যস্ততা প্রমাণ
করার ঝুঁকি নেবে?’

আমতা আমতা করতে লাগল ফ্রেনজি। বলল, ‘তা...হ্যাঁ,

এটা অবশ্য ঠিকই বলেছেন আপনি। আমরা...'

‘অতএব দ্বিতীয় এবং তৃতীয় থিওরিটা মন থেকে বাদ দিতে পারেন আপনি, অফিসার। ও নিশ্চয়ই ছবি তুলতে গিয়েই পড়ে গেছে।’

দুর্বল গলায় বলল ফ্রেনজি, ‘কিন্তু তাহলে সেনরিনার তলপেটের আঘাতটা? ওটা কি করে হল?’

‘হয়ত কোন ভুল হয়েছে ডাক্তারের, কে জানে। সে যাকগে,’ হঠাৎ করেই কর্কশ হয়ে উঠল শেরম্যানের কণ্ঠ। ‘সোফিয়া পা ফসকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে, এটাই রিপোর্টের সিদ্ধান্ত হতে হবে।’

দ্বিধায় পড়ে গেল দুই গোয়েন্দা। এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। অবশেষে মুখ খুলল লেফটেন্যান্ট গুইডো, রুমে ঢোকার পর এই প্রথম কথা বলল সে। ‘আমাদের কর্তব্য করোনারকে ফ্যাঙ্কিস্ জানানো, সেনর শেরম্যান। রিপোর্টের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন।’

‘রাইট। কে সে? কি নাম করোনারের?’

‘ইল সেনর সলোয়া ক্যানডালো।’

‘নেপলস-এ?’

‘জি।’

মাথা ঝাঁকালেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। ‘আমার মেয়ের মৃতদেহ কোথায়?’

‘মর্গেই আছে, সেনর।’

‘সকালে দেখতে যাব আমি।’

‘নিশ্চয়। কোন অসুবিধে নেই। কখন যাবেন জানালে আমি

নিজেই আপনাকে নিতে আসব,' বলল ফ্রেনজি।

নাকের ডগায় যেন মাছি বসেছে, বাঁ হাতের দ্রুত ঝাপটায় ওটাকে তাড়াবার ভঙ্গি করলেন ভদ্রলোক বিরক্ত মুখে। 'তার দরকার নেই। মাসুদ রানার সাথেই যাব আমি।'

'অ্যাজ ইউ উইশ, সেনর।'

'শুধু মর্গে জানিয়ে রাখবেন আমার কথা।' নতুন একটা সিগার ধরালেন শেরম্যান সোনার তৈরি লাইটার জ্বলে। তারপর রানার দিকে ফিরলেন। 'রানা, ইটালিয়ান প্রেস কতটা জানে এ ব্যাপারে?'

'কিছুই জানে না,' বলল ও। 'আপনি আসছেন জানার পর লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজিকে অনুরোধ করেছিলাম যেন খবরটা আপাতত চেপে রাখা হয়।'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে থেকে মাথা দোলালেন তিনি। মনে হল বেশ সন্তুষ্ট হয়েছেন। 'গুড। ঠিক করেছ।' ফ্রেনজির দিকে ফিরলেন। 'আর কিছু বলবেন?'

'লা সেনরিনার কিছু জুয়েলারি পাওয়া গেছে ভিলায়। ওগুলো সেনর মাসুদ রানাকে দিয়ে দিয়েছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। সোফিয়ার যা কিছু আছে সব ওকে বুঝিয়ে দেবেন। উনিই রিপ্রেজেন্ট করবেন আমাকে।'

'ইয়েস, সেনর,' বলল গুইডো, 'আমরা তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখব।'

'ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট।'

লোক দুটো বেরিয়ে যেতে অনেকক্ষণ থম মেরে বসে থাকলেন শেরম্যান। আনমনে হাতের ডানুর দিকে চেয়ে আছেন।

সোফিয়ার জুয়েলারি বক্সটা সঙ্গেই ছিল রানার। পকেট থেকে বের করে আলগোছে তাঁর সামনের সেন্টার টেবিলের ওপর রাখল সে ওটা।

চোখ কুঁচকে গেল তাঁর। ‘এটা কি?’

বাকি কৌতূহলটুকু নিবৃত্ত করতে চায় রানা। চট করে প্যামেলার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, ‘সোফিয়ার জুয়েলারি।’

বাক্সটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন শেরম্যান। খুলে ভেতরে তাকালেন। ওদিকে কথাটা কানে যাওয়ামাত্র রকিং চেয়ার ছাড়ল প্যামেলা। দ্রুত এগিয়ে আসছে। বাক্সটা টেবিলের ওপর উপুড় করে ধরলেন ভদ্রলোক। কপাল-ভুরু কুঁচকে আছে।

কাছে এসে দামি জিনিসগুলো দেখল প্যামেলা। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, ‘এগুলো তুমি কিনে দিয়েছ ওকে, শেরম্যান?’

প্রায় ধমকে উঠলেন তিনি, ‘অবশ্যই না।’

‘দেখি!’ ডায়মণ্ড কলারটা ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল প্যামেলা। এক ধাক্কায় হাতটা সরিয়ে দিলেন শেরম্যান।

‘সরে যাও!’ চঁচিয়ে বললেন, ‘হাত দেবে না কিছুতে!’

তাঁর গলার আওয়াজ অবাক করল রানাকে। ব্যবহারটাও। যা জানার ছিল জানা হয়ে গেল। বুঝতে পারছে ও, যে জন্যেই হোক, প্যামেলাকে সহ্য করতে পারছেন না ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। কিন্তু স্বামীর এত রুঢ় ব্যবহারেও খুব একটা লজ্জিত মনে হল না মেয়েটিকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরে গেল সে নিজের জায়গায়, বসে পড়ল। এমন ভাব করছে যেন কিছুই হয়নি।

জুয়েলারিগুলো একটা একটা করে বাক্সে ভরলেন ভদ্রলোক।

তারপর ঢাকনা বন্ধ করে এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। ‘এটা তোমার কাছেই রাখ, রানা। প্লীজ।’

বাক্সটা নিল রানা। চট করে চালান করে দিল কোটের সাইড পকেটে।

আবার দীর্ঘ, পীড়াদায়ক নীরবতা। শেরম্যানের ব্রেন ফুল স্পীডে চলছে, তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারছে মাসুদ রানা। একটু একটু করে তাঁর ভেতর ফিরে আসছে আদি ও অকৃত্রিম, তেজস্বী ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান—মুখে তার ছায়া পড়ছে স্পষ্ট। কি ভাবছেন তিনি? রবার্ট হুইটনির কথা? ফ্রেনজি-গুইডো কি বুঝে ফেলেছে ও-ই সেই রহস্যময় আমেরিকান ট্যুরিস্ট ওরফে সাংবাদিক? সম্ভাবনাটার কথা কি শেরম্যানও ভাবছেন?

রীতিমত আঁধার দেখছে রানা চোখে। এই গ্যাডাকল থেকে কিভাবে নিজেকে উদ্ধার করবে, পথ খুঁজে পাচ্ছে না। সচকিত হল ও শেরম্যানের গলা শুনে।

‘রানা, প্রেসকে এবার ঘটনাটা জানানো যায়, কি বল? সিম্পলি ছবি তুলতে গিয়ে পাহাড় থেকে পড়ে মারা গেছে সোফিয়া। এখানকার ব্যাপার ফ্রেনজিকে জানিয়ে দিলেই তো চলবে, তাই না? রোমের পেপারগুলোর জন্যে তোমার পি.এ-কে বলে দাও।’

‘জি। জানিয়ে দিচ্ছি।’

‘থ্যাঙ্কস, সন।’ ঘড়ি দেখলেন তিনি—আটটা বাজতে দশ। ‘এখন কি অফিসে থাকবে করোনার...ক্যানডেল, না কি যেন? আলাপটা এখনই সেরে ফেলতে চাই।’

‘দেখছি,’ উঠল রানা। ডিরেক্টরি থেকে সলোয়া ক্যানডালের

অফিসের নাশ্বার বের করে রিঙ করল।

দুবার রিঙ হতে করোনার নিজেই ধরলেন ও প্রান্তে। তাঁকে অপেক্ষা করার অনুরোধ করে শেরম্যানের দিকে ফিরল রানা।
'করোনার।'

'থ্যাঙ্কস,' উঠে এসে রিসিভারটা নিলেন তিনি। গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, 'দিস ইজ ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান...।'

নামটা এত জোরের সাথে ঘোষণা করলেন ভদ্রলোক, রানার মনে হল এভাবে নিজেকে জাহির করার ক্ষমতা সম্ভবত পৃথিবীতে আর কারও নেই।

এগার

নিজের হোটেল থেকে রোম টেলিফোন করল মাসুদ রানা, লিজা ভ্যালেন্টিনার বাসায়। মেয়েটির সাড়া পেতে গম্ভীর গলায় বলল,
'কাগজ কলম নাও।'

'জাস্ট আ মোমেন্ট, রানা।...হ্যাঁ, বল।'

সোফিয়া শেরম্যানের মৃত্যু সংবাদের সদ্য তৈরি কাহিনী দ্রুত বলে গেল রানা সংক্ষেপে। ওপ্রান্তে খস খস করে কলম চলছে মেয়েটির, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও।

'ব্যাস? এইটুকুই?' রানা থামতে প্রশ্ন করল লিজা।

‘হ্যাঁ। টাইপ কপির গোটা বিশেক ফটোকপি কর। তারপর সোজা চলে যাও প্রেস ক্লাব। অথবা তোমাদের অফিসেও কনফারেন্স ব্যবস্থা করতে পার। দরকার মনে করলে টনি আমান্দোর সাহায্য নিয়ো। ওকে বলবে, আমি অনুরোধ করেছি তোমাকে হেলপ করতে। মাইও, এ প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলা চলবে না প্রেসকে। গট দ্যাট?’

‘ইয়েস।’

মেয়েটিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল রানা। এরপর ফোন করল সরেনটো পুলিশ স্টেশনে। লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজিকে চাইল ও। নিজের পরিচয়টা জানাতে ভুলল না অপারেটরকে।

‘ইয়েস। সেনর?’ বলল ফ্রেনজি।

‘সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারটা এবার নেপলস প্রেসকে জানাতে পারেন আপনি, অফিসার।’

‘ইল সেনর শেরম্যান অনুমতি দিয়েছেন?’

‘হ্যাঁ। বাট নো ডিটেলস। শুধু ছবি তোলার সময় পাহাড় থেকে পড়ে গেছে সে, এইটুকু।’

‘কিন্তু, সেনর, রিপোর্টাররা নিশ্চই জানতে চাইবে বেলা ডিসটায় একা কেন গিয়েছিলেন লা সেনরিনা, কি করছিলেন। তাছাড়া অটোপসির রিপোর্ট...’

‘প্রথমেই সে রাস্তা বন্ধ করে দেবেন ও ভ্যাকেশনে ছিল বলে। রিপোর্টারদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া চলবে না। মিস্টার শেরম্যান পছন্দ করবেন না ব্যাপারটা,’ বলল রানা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লেফটেন্যান্ট। তারপর সশব্দে একটা

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'ঠিক আছে, কি আর করা।'

ফোন রেখে দিল রানা। পরদিন সকাল নটায় হোটেল ছাড়ল। আগের দিন পৌছেই হোটেলের রেন্টাল সার্ভিস থেকে একটা ক্যাডিলাক ভাড়ায় নিয়েছিল ও। ওটা নিয়ে চলে এল হোটেল ভিসুভিয়াসে। আজ'আর ওপরে গেল না রানা। রিসেপশন থেকে টেলিফোনে খবর দিল ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানকে।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে নামছি,' বললেন তিনি।

এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে বসে পড়ল রানা লাউঞ্জ। সিগারেট ধরিয়ে আনমনে টানতে লাগল। কফি অর্ধেক শেষ হওয়ার আগেই নেমে এলেন শেরম্যান। একা। প্যামেলা নেই সঙ্গে। ঠোটে চুরুট, বগলে একগাদা আজকের দৈনিক।

'বোসো বোসো,' রানাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বললেন তিনি। 'শেষ কর কফি।' ওর মুখোমুখি বসলেন। একটার পর একটা পত্রিকার ওপর নজর বোলাতে লাগলেন। সোফিয়ার মৃত্যুকে নিয়ে এক কলাম তিন ইঞ্চির বেশি এগোতে পারেনি কোন পত্রিকা, তা-ও হেডিংসহ।

'হুম!' দেখা শেষ হতে কাগজগুলো কয়েক ভাঁজ করে পাশের বড় একটা ওয়েস্ট পেপার বাক্সে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ভালই। রোমে খবরটা পাঠিয়েছিলে?'

'জি। বেরিয়ে গেছে আজ নিশ্চয়ই।'

'এইটুকুই?'

'জি।'

কফি শেষ করে উঠল মাসুদ রানা। দুজনে পাশাপাশি বেরিয়ে এল কার পার্ক। বেশ ভিড় রাস্তায়। কোথায় যাবেন শেরম্যান

জানাই আছে। তাই কোন প্রশ্ন করল না রানা। গাড়ি ছোটাল সোজা সরেনটো স্টেশনের দিকে। ছোট দালানটার সামনে গাড়ি দাঁড় করাতেই ভেতর থেকে মাঝবয়সী এক লোক ছুটে এল। নিজেকে মর্গ-ইন-চার্জ বলে পরিচয় দিল লোকটা।

ভেতরে গেল না রানা। সোফিয়ার মৃত মুখটা দ্বিতীয়বার আর দেখার ইচ্ছে নেই। ইন-চার্জের অফিসে বসল ও। শেরম্যান চলে গেলেন ভেতরে। পুরো বিশ মিনিট পেরিয়ে যেতে ফিরলেন তিনি। পিছন পিছন এল ইন-চার্জ, হাত কচলাচ্ছে।

এখন আর আগের মত মনে হচ্ছে না শেরম্যানকে, কেমন যেন অসুস্থ লাগছে। কপালের বাঁ দিকের একটা রগ লাফাচ্ছে ঘন ঘন।

‘চলুন,’ বলল রানা। ‘হোটেলে পৌঁছে দিই আপনাকে।’

‘না, রানা,’ ওর কাঁধে মস্ত একটা থাবা রাখলেন তিনি। টের পাচ্ছে রানা, হাতটা কাঁপছে। ‘আমাকে বেলা ভিসটায় নিয়ে চল কাইগুলি। জায়গাটা দেখব আমি।’

‘একটু পরে গেলে...’

‘না!’ ধমক মেরে ওকে থামিয়ে দিলেন শেরম্যান। ‘পরে নয়। এখনই নিয়ে চল। প্লীজ।’

‘বেশ। চলুন।’

যানবাহনের ভিড় ঠেলে আধ ঘন্টার রাস্তা পেরোতে চল্লিশ মিনিট লাগল। দূর থেকে ভিলাটা চোখে পড়তেই শক্ত হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। ড্যাশবোর্ড ধরে ঝুঁকে বসলেন সামনে। ‘ওটা?’

‘হ্যাঁ।’ লাফাতে লাফাতে গাড়ির একেবারে সামনে এসে পড়ল একটা খরগোশ। এমনিতেই ধীরগতিতে চলছিল ক্যাডিলাক, কড়া ব্রেক কষে ওটাকে জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফেলল রানা। আওয়াজ

কানে যেতে ঘুরে তাকাল খুদে প্রাণীটা, পলকে উধাও হয়ে গেল
তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে ।

সামনের নিচু গেটটা খোলাই ছিল । সোজা চওড়া ড্রাইভ
পেরিয়ে ভিলার সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল রানা । এদিক-
ওদিক তাকাল ও । পুলিশের গার্ড থাকার কথা এখানে । কিন্তু
কাউকে চোখে পড়ল না । সবকিছু একই রকম আছে, কোথাও
কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না । লিঙ্কন কনভার্টিবলটার দিকে
তাকাল রানা । ধুলোর স্তরটা গত দুদিনে আরও পুরু হয়েছে ।

গাড়ি থেকে নেমে ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ফ্র্যাঙ্কলিন
শেরম্যান । অর্ধেক হয়ে আসা চুরটটা নিজস্ব কায়দায় ঠোঁটের বাঁ
কোণে কামড়ে ধরে, দু-কোমরে হাত রেখে গাড়িটার ওপর নজর
বোলালেন কয়েক মুহূর্ত ।

‘এটাই সোফিয়ার গাড়ি, রানা?’

‘জি ।’

কাছে গিয়ে ড্রাইভারের দরজাটা খুললেন তিনি । কয়েক মুহূর্ত
ভেতরে চোখ বোলালেন । তারপর দরজা বন্ধ করে পিছিয়ে
এলেন । ‘চল, ভেতরে যাই ।’

পুরো ভিলা ঘুরিয়ে দেখাল রানা তাঁকে । দোতলার পিছনের
বারান্দায় এসে খানিক থমকালেন মানুষটি । স্থির চোখে চেয়ে
থাকলেন বে অভ সরেনটোর দিকে । তাঁকে কিছুক্ষণ একা থাকার
সুযোগ দিয়ে নিচে চলে এল রানা । একটু ভাবনা চিন্তা করা
দরকার । এক এক করে দশ মিনিট পেরিয়ে গেল । ওপরে সব
চুপচাপ । কোন সাড়া শব্দ আসছে না ।

ব্যাপার কি দেখার জন্যে আবার উঠে এল রানা । মাস্টার
ভিত্ত অবকাশ-১

বেডরুমে বসে আছেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান, ঘরের মাঝখানে বিশাল ডবল খাটের ওপর। সামনে সোফিয়ার দুটো সুটকেস। ভেতরের কাপড়-চোপড় স্তূপ হয়ে আছে তাঁর সামনে। দুহাতে কোলের ওপর ধরে আছেন মেয়ের একটা গাউন। নিখর হয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে। বাপ সম্পর্কে সোফিয়ার তাহলে ভুল ধারণা ছিল, ভাবল রানা।

তাঁর চাউনিটা হতভম্ব করে দিল ওকে। দু'চোখ স্বাপদের মত ধক-ধক জ্বলছে। এত হিংস্র চাউনি আগে কারও চোখে দেখেনি রানা কখনও। মায়া হল ওর বেচারার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে। একই সাথে নিজেকে নিয়ে শঙ্কিতও হল। ফিরে লাউঞ্জে এসে বসল।

গত দুটো দিন বডেডা দুশ্চিন্তায় কেটেছে ওর। নিজেকে মনে হয়েছে ফাঁদে আটকা পড়া শিকার। অপেক্ষা করছে কখন শিকারী আসবে, তুলে নিয়ে ঝোলায় পুরবে ওকে। মাসুদ রানাকে চিনতে না পারলেও ঐ সুট পরা নিঃসঙ্গ পর্যটকটিকে ঠিকই ট্রেস করতে পেরেছে ফ্রেনজি। সোফিয়ার মৃত্যুর সময় আর ওর ভিলায় উপস্থিতির সময়টাও মিলিয়ে ফেলেছে সে এরই মধ্যে, এখন শুধু মাসুদ রানাকে রবার্ট হুইটনির সাথে মেলাতে পারলেই মামলা ডিসমিস।

কাল সারারাত ঘুমাতে পারেনি ও সোফিয়ার হাতঘড়িটার কথা ভেবে। কি করে সোয়া আটটায় মারা গেল মেয়েটি, কি করে ওই সময় বন্ধ হল তার ঘড়ি, আকাশ-পাতাল তোলাপাড় করেও খুঁজে পায়নি রানা উত্তরটা। অথচ পরিষ্কার মনে আছে, প্রথম যখন ও সোফিয়ার মৃতদেহ দেখতে পায় তখন সম্ভবত সোয়া আটটা

বাজতে দুচার মিনিট বাকিই ছিল। তাহলে কি করে সম্ভব হল এটা? না কি তখনও চলছিল ঘড়ি? সোয়া আটটায় বন্ধ হয়ে গেছে আপনা-আপনি?

নেমে এলেন শেরম্যান। ওর মুখোমুখি একটা সোফায় বসলেন। বিশাল দেহটার ভারে ক্যাচ-কোঁচ আওয়াজ উঠল স্প্রিংয়ে। ‘তোমার সাথে সোফিয়ার কবার দেখা হয়েছে রোমে, রানা?’ বললেন তিনি।

প্রশ্নটা অস্বস্তিতে ফেলল রানাকে। ‘তিন-চারবার।’

‘ওর বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে কোন ধারণা নেই তোমার?’

‘জি, না। সরি।’

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন তিনি। চোখ কুঁচকে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তারপর কি মনে পড়তে উঠে দাঁড়ালেন। ‘রানা, দুর্ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল দেখতে চাই আমি।’

‘শিওর,’ উঠল ও। ‘চলুন।’

আগে আগে শেরম্যানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল রানা। মোটা মানুষ, চড়াই পেরোতে বেশ কষ্ট হচ্ছে, ঘামছেন দরদর করে। কিন্তু একটা কথাও না বলে নীরবে অনুসরণ করছেন ওকে। পিছনে তাঁর ফোঁস ফোঁস দম নেয়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। দ্বিতীয় ভিলাটার ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়ালেন শেরম্যান। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে চেয়ে থাকলেন সেদিকে।

‘ওটা কার ভিলা?’

‘বলতে পারি না।’

পিছিয়ে এসে শেরম্যানের পাশে দাঁড়াল রানা। আগের মতই

খাঁ-খাঁ করছে ভিলাটা। মানুষজন দূরের কথা একটা কুকুর বেড়ালের দেখা পর্যন্ত নেই। ঘুরে পন্থুনের দিকে তাকাল রানা। সেই মোটর লঞ্চ দুটো আগের মতই বাঁধা আছে ঘাটে।

আনমনে বললেন শেরম্যান, ‘ওটায় আসা-যাওয়ার রাস্তা তো চোখে পড়ছে না! কি ব্যাপার? লোকজন,’ জেটির ওপর চোখ পড়তেই থেমে গেলেন তিনি। ‘...ও, বুঝেছি।’

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওটার ওপর আত্মহ হারিয়ে ফেললেন তিনি। ঘুরে পা বাড়ালেন। ‘চল। কতদূর আর?’

‘এসে গেছি প্রায়।’

দশ মিনিট পর ক্লিফের চূড়ায় পৌঁছুল ওরা। গাছের ছায়ায় সামান্য জিরিয়ে নিয়ে পায়ে পায়ে কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন শেরম্যান। নিচের দিকে তাকিয়ে গাল কুঁচকে উঠল তাঁর। হাত-পা কাঁপতে লাগল থর থর করে। অবস্থা দেখে চট করে পাশে এসে দাঁড়াল রানা। মাথা ঘুরে পড়েই যাবেন হয়ত ভদ্রলোক। হাত ধরে টেনে পিছিয়ে নিয়ে এল তাঁকে রানা।

‘চলুন,’ মৃদু গলায় বলল সে। ‘এখানে দেখার কিছু নেই।’

কিন্তু নড়ার কোন লক্ষণ নেই। আপনমনে বিড়বিড় করে বারবার একই কথা বলছেন তিনি। ‘মাই গড! ও মাই গড! এত উঁচু থেকে পড়েছে সোফিয়া? এত উঁচু থেকে?’

দেখতে দেখতে চোখের দু-কোণ ভিজে উঠল শেরম্যানের। তাড়াতাড়ি রুমাল চাপা দিলেন চোখে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। রানার বেচারার মানসিক অবস্থা টের পেয়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ও। মিথ্যে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করার চাইতে চুপ করে থাকাই ভাল। নিজেকে সামলে নিলেন তিনি একসময়। চোখ মুছে

পকেটে পুরলেন রুমালটা।

রানার দিকে তাকিয়ে জোর করে একটু হাসির ভঙ্গি করলেন।
'এখানে আমার না আসাই বোধহয় ভাল ছিল। খারাপ হয়ে গেল
মনটা, রানা। আসলে মেয়েটা আমার খুব দুঃখী ছিল কি না!
আমার আদর বলতে গেলে কখনই পায়নি। মা-ও মরে গেল
অসময়ে। সৎ-মাদের যত্নগা সহ্য করতে করতে..., 'আচমকা থেমে
গেলেন শেরম্যান। 'এসব থাক, চল, ভিলায় যাই।'

ফিরে এল ওরা। সূর্য তখন প্রায় মাঝ আকাশে। প্রচণ্ড গরমে
তেতে উঠেছে পরিবেশ। মুখোমুখি দুটো সোফায় বসে ঘামতে
লাগল দুজনেই। মাথার ওপর পূর্ণোদ্যমে ঘুরছে সিলিং ফ্যান। কিন্তু
খুব একটা কাজ হচ্ছে না তাতে। বাতাসটাও গরম।

দুহাতে মোনাজাতের ভঙ্গিতে মুখটা ডললেন শেরম্যান।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন ঘন ঘন। 'আমার মনে হয় হুইটনিই সোফিয়াকে
ওই গাড়ি আর জুয়েলারিগুলো দিয়েছে, রানা। এখন বুঝতে
পারছি মেয়েটাকে আরও বেশি বেশি টাকা দেয়া উচিত ছিল
আমার। তাহলে হয়ত আজকের এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না।
নিজেকে মানব-চরিত্র সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ভাবতাম আমি।
অথচ...।'

থেমে একটু কি ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর আবার বলে
চললেন আপনমনে। 'এই হুইটনি লোকটা যে-ই হোক,
পয়সাওয়ালা ছিল। ওর টাকার গরমই মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে আমার
মেয়ের। ওটাই স্বাভাবিক। এত দামি দামি উপহার পেলে কোন্
মেয়ের মাথা ঠিক থাকবে, বল?'

একটা সিগার বের করলেন তিনি। ওপরের সেলোফেনের

মোড়ক খুলতে লাগলেন পঁচিয়ে পঁচিয়ে। ‘মেয়েটা আমার খুব ভাল ছিল, রানা। সবদিক থেকেই ভাল ছিল। ভাল ছাত্রী ছিল। রোমে আর্কিটেকচারের ওপর পড়াশুনা করতে চেয়েছিল বলে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ভুল করেছি। ওর প্রয়োজন বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি চরমভাবে। যদি টাকার পরিমাণ আরও কিছু বাড়িয়ে দিতাম, আর ওকে দেখাশুনার জন্যে ভাল একজন মেইড পাঠাতাম সঙ্গে, তাহলে বোধহয় বেঁচে থাকত আমার মেয়ে। হুইটনির মত দুশ্চরিত্র পাক্ষের টাকার লোভে পড়ত না।’

গরম লাগছে। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল রানা। বলল না কিছু।

‘তোমার আউটফিট সম্পর্কে প্রায় সবই জানি আমি, রানা। এভাবে এরকম প্রয়োজনের মুহূর্তে তোমার সাথে পরিচয় হবে, ভাবিনি কখনও। তুমি জান, করোনারের সাথে কাল কথা হয়েছে আমার। সোফিয়ার মৃত্যুকে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলে ঘোষণা করতে রাজি হয়েছে লোকটা। পরে পুলিশ চীফের সাথেও কথা বলেছি। তিনিও কথা দিয়েছেন ব্যাপারটা যেন মোটেই প্রচার না পায় সে ব্যবস্থা করবেন। সোফিয়ার প্রেগনেসির প্রসঙ্গ কেউ তুলবে না। সবদিক থেকে ঘটনাটা চেপে রাখা হলে প্রেস আর কি-ই বা করবে। সামনের রাস্তা ক্লিয়ার, এগিয়ে যেতে কোন অসুবিধে নেই। এখন একটাই পথ আমার সামনে খোলা। আমি জানি না তুমি এ মুহূর্তে কতটা ব্যস্ত। যদি বেশি ব্যস্ততা না থাকে, আমি আশা করব, সোফিয়ার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটা তুমি নেবে। যদি না নাও তাতেও ক্ষতি নেই। আমিই মাঠে নামব। প্রয়োজনে দুনিয়ার যত প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা

আছে সবগুলোকে রবার্ট হুইটনিকে খুঁজে বের করার কাজে লাগাব। যতক্ষণ না তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে বিশ্রাম নেব না।’

জমে গেল রানা। ভেবেছিল পুরো ব্যাপারটা এখানেই ধামাচাপা দিতে চান বলেই সবাইকে দিয়ে সোফিয়ার মৃত্যুটাকে ‘দুর্ঘটনাজনিত’ বলে কবুল করাতে উঠে পড়ে লেগেছেন শেরম্যান। এখন বোঝা যাচ্ছে সে ধারণা ভুল। আসলে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে তাঁর বুকে, মেয়ে হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইছেন তিনি। চাইছেন পুলিশকে রাস্তা থেকে হটিয়ে দিয়ে নিজেই খুঁজে বের করবেন রবার্ট হুইটনিকে।

একটু চিন্তা করতেই বুঝল রানা, আসলে তাঁর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ওর উপায় নেই। বরং রাজি হলে ওর-ই লাভ। কাজটা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে সব দায়িত্ব ওর ওপর অর্পণ করে দেশে ফিরে যাবেন শেরম্যান। কিন্তু যদি রাজি না হয়, তাহলে তিনি নিজেই উঠে পড়ে লাগবেন। সেক্ষেত্রে রানার ধরা পড়তে বেশি সময় লাগবে না।

‘হুইটনিকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিতে বলছেন?’

‘হ্যাঁ, সন। যদি তোমার আপত্তি না থাকে। লোকটা অসময়ে আমার বাচ্চাকে সরিয়ে দিয়েছে পৃথিবী থেকে, এর চরম খেসারত তাকে দিতেই হবে।’

‘বেশ,’ কোন রকমে বলল রানা। ‘যদি সত্যিই কেউ খুন করে থাকে আপনার মেয়েকে, তাকে আমি খুঁজে বের করব।’

‘সত্যি, রানা? করবে তুমি কাজটা?’ হাঁটুতে কনুইয়ের ভর রেখে সামনে ঝুঁকে এলেন শেরম্যান। ব্যাস, এটুকুই। এর বেশি আগ্রহ দেখা গেল না ভদ্রলোকের মধ্যে।

‘আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন। কিন্তু ওর মৃত্যুটাকে আপনি হত্যা বলছেন কেন, ওটা কি দুর্ঘটনা হতে পারে না?’

‘না, রানা, পারে না। এটা হত্যা, ঠাণ্ডা মাথায় খুন। আমার মেয়ে ছবি তুলতে গিয়ে ওভাবে মরতে পারে না, রানা। ফটোগ্রাফির ওপর বড় ডিগ্রী আছে সোফিয়ার। ভিউ ফাইণ্ডারে চোখ রেখে ফলস স্টেপ নেবে, আর পাহাড় থেকে পড়ে যাবে, এমন মেয়েই নয় সোফিয়া। আমার ধারণা নিউ ইয়র্কেই হুইটনির সাথে পরিচয় হয় সোফিয়ার। এবং অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে ও। ব্যাপারটা জানার পর ব্যস্ত হয়ে ওঠে সোফিয়া, সম্ভবত ওকে বিয়ে করার জন্যে চাপ দেয় হুইটনিকে। কিন্তু রাজি করাতে পারেনি।

‘খেপে গিয়ে এরপর হয়ত তাকে হুমকি-ধামকি দিয়েছিল সোফিয়া। বেগতিক দেখে রাজি হওয়ার ভান করে সে। তারপর ঠিক কি যে ঘটেছে বোঝা মুশকিল। হয়ত সোফিয়াকে রোম আসতে রাজি করিয়েছে সে, আশা দিয়েছে এখানে এলে বিয়ে করবে। অথবা আর কিছু। মোট কথা আমি শিওর, দুর্ঘটনা নয়। খুন করেছে হুইটনি আমার মেয়েকে। সে চেয়েছে দূরে কোথাও নিয়ে হত্যা করবে ওকে, ঝামেলা বিদেয় করবে। এবং তাতে সফলও হয়েছে। ক্রিফের কিনারায় নিয়ে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে নিচে। অতএব আমাকেও বিফল হলে চলবে না। সফল হতেই হবে, যে কোন মূল্যে।’

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কি যেন ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, ‘অথবা, এমনও হতে পারে, ক্রিফের চুড়োয় গিয়ে ওকে বিয়ে না করলে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে বলে হুইটনিকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল আমার মেয়ে। তারপরও রাজি

করাতে না পেরে সত্যিই আত্মহত্যা করেছে। নয়ত...সে যাকগে, মোট কথা এ মৃত্যুর জন্যে হুইটনিই দায়ী। কোন ভুল নেই তাতে।’

‘আপনি বলছেন আত্মহত্যা করেছে?’ বিস্মিত হল রানা।

‘একটা সম্ভাবনার কথা বললাম, রানা। আগেই তো বলেছি, ও সে-ধরনের মেয়ে নয় যে অমন একটা কাজ করে বসবে। জানি তুমি আইনের পক্ষের লোক। হয়ত ভাবছ, ওকে পেলে হত্যা করব আমি। না, রানা। আমি বোকা নই। অতটা উন্মাদও হইনি। শুধু জীবনটা যাতে ওর বিষিয়ে ওঠে, যেন বেঁচে থাকতেই নরকের দেখা পায় হুইটনি, খুশিমনে নিজের প্রাণ নিজহাতে ধ্বংস করে দিতে বাধ্য হয়, সেই ব্যবস্থা করব। অন্য কিছু নয়। ধর,’ অবাক হয়ে চেয়ে আছে রানা তাঁর মুখের দিকে। হঠাৎ করেই যেন বাচাল হয়ে উঠেছেন শেরম্যান, মুখ চলছে অনবরত। ‘...ওর জীবনযাপনের মৌলিক যে ব্যাপারগুলো আছে, প্রথমেই তার ওপর আঘাত করব আমি। যেখানে থাকে, সেখান থেকে লাথি মেরে রাস্তায় নামাব ওকে। নিজের বাড়ি হলে ওটা বিক্রি করে দিতে বাধ্য করব। ভাড়া বাড়ি হলে পরে যাতে আর কোন ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে না পারে সে ব্যবস্থা করব। পথের ধারে গাড়ি পার্ক করতে পারবে না কোনদিন হুইটনি, ইভেন পার্কিং লটেও নয়। যেন কোন ভাল রেস্টুরেন্টে ওকে ঢুকতে না দেয়া হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখব আমি। কি? খুব ছোটখাট ব্যাপার মনে হচ্ছে? একবার নিজেকে হুইটনির জায়গায় ভাব, কেমন লাগবে ব্যাপারগুলো তোমার? এরপর লাগবে হারামজাদার টাকা আর সামাজিক নিরাপত্তার পিছনে। যদি পেশায় চাকরিজীবী হয়,

তাহলে ওটা যাতে হারায় এবং জীবনে আর কোথাও চাকরি না পায় সে কাজটাও করব। যদি ব্যবসায়ী হয়ে থাকে, একের পর এক লোকসানের ধাক্কায় জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে তার। যখন হুঁশ হবে, দেখবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট শূন্য। আদালত ওকে দেউলিয়া ঘোষণা করবে। এরপর কি যেন? ও হ্যাঁ, নিরাপত্তা।

‘কিছু প্রফেশন্যাল গুণ্ডা ভাড়া করব আমি। কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে কাজ করবে ছেলেরা, দিনরাত নজর রাখবে হুইটনির ওপর। পথে-ঘাটে যেখানেই পাবে, বেধড়ক আড়ং ধোলাই দিতে থাকবে, যতক্ষণ না লোকটা বুঝতে পারে যে খোলা জায়গা তার জন্যে মোটেই নিরাপদ নয়। এরপর কোন মানুষ বেঁচে থাকতে চাইবে, রানা, তুমিই বল?’

বলবে কি, হ্যাঁ করে শেরম্যানের দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা। বুঝতে পেরেছে একটাও ফাঁকা বুলি আওড়াননি, যা বললেন করে দেখাবার ক্ষমতা আছে বলেই বলেছেন।

‘তবে আমার ধারণা,’ আবার বললেন তিনি। ‘রবার্ট হুইটনি তার আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। তোমার ওপর আমার পুরো আস্থা আছে, চাইলে বের করে ফেলতে পারবে তুমি লোকটাকে। সব অপরাধী-ই পিছনে কোন না কোন কু রেখে যায়, ইউ নো। এ-ও রেখে গেছে নিঃসন্দেহে। ওটা খুঁজে পেলো বাকিগুলোও পেয়ে যাবে।’

‘বেশ। আমি দেখব ব্যাপারটা,’ বলল রানা।

‘ধন্যবাদ, রানা। তবে যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারবে ততই সুবিধে। মুখে যা-ই বলুক, পুলিশকে বিশ্বাস নেই। ওরা ঠিকই গোপনে-গোপনে তদন্ত চালাবে হুইটনিকে ধরার

জন্মে । তোমার আগেই যদি তারা সফল হয় তাহলেই ঝামেলা । আমি চাই না আমার মেয়ের প্রেগনেসি নিয়ে কথা উঠুক । খবরের কাগজে কাহিনী ছাপা হোক । কিন্তু ও পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাই-ই হবে । কিছুতেই চেপে রাখা যাবে না ব্যাপারটা ।

‘অবশ্য তার মানে এই নয় যে ধরা পড়লেই ওর ব্যাপারটা ভুলে যাব আমি । উঁহু, তা হতে দেব না । প্রয়োজনে খুনের অভিযোগ থেকে ও যাতে অব্যাহতি পায়, প্রথমে সে ব্যবস্থা করব । তাতে টাকা যা লাগে পরোয়া নেই । তাছাড়াও, ধর যদি ক্ষমতা দেখানোর দরকার পড়ে, ইটালিয়ান সরকারকে দেখাব আমি ক্ষমতা কাকে বলে,’ নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠুকলেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান । ‘মুক্ত করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেব রবার্ট হুইটনিকে । তারপর শুরু করব আমার খেল ।’

হঠাৎ করে হাসলেন মানুষটি । ‘হুইটনিকে যাতে এই অপরাধের চরম খেসারত দিতে হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব । টাকা কোন ব্যাপার নয়, রানা । খরচ কর পানির মত । কিন্তু আমার এই উপকারটুকু করে দাও । সোফিয়া আমার একমাত্র সন্তান ছিল । আরেক দেশের নোংরা মর্গে ওর এই পরিণতি চোখে দেখতে হবে স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করিনি । সন্তানহারা পিতার দুঃখ তুমি বুঝবে না, রানা । আমার কষ্ট আমি বুঝি । তুমি...’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে,’ তাড়াতাড়ি বলল রানা । ‘অত উতলা হবেন না । বললাম তো, আমি আমার যথাসাধ্য করব ।’

একটা হালকা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন শেরম্যান । ‘থ্যাঙ্কস । ইউ জাস্ট ফাইণ্ড হিম, রানা—আই উইল ফিক্স হিম ।’

বার

যেন ধারাল এক ক্ষুর ধরিয়ে দিয়েছেন শেরম্যান রানার হাতে। বলছেন, জলদি কর, নিজের গলায় ঢালাও এটা। দু'ফাঁক করে ফেল।

খুঁজে পেতে লাউঞ্জের সাইডবোর্ড কাবার্ড থেকে এক বোতল হুইস্কি বের করল রানা। গ্রাসে ঢালার ধৈর্য নেই, ছিপি খুলে সরাসরি গলায় ঢালল হাফ পাইন্ট আন্দাজ স্পিরিট। ঢোক গিলেই মুখটা বিকৃত করল ও, কোনদিক থেকে কোনদিক চলেছে জিনিসটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যেন।

পায়ে পায়ে সামনের বারান্দায় চলে এল রানা। রেলিং ঘেঁষে দুটো চেয়ার রয়েছে। বসে পড়ল একটায়। আবার এক ঢোক হুইস্কি নিল, তবে এবার অল্প। আস্তে আস্তে গিলে ফেলল। আনমনে সামনের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা। চেয়েই আছে শুধু, দেখছে না।

নিজেকে ফিরে পেতে পুরো পাঁচটি মিনিট ব্যয় হল রানার। সামনে তাকাল ও, বেলা ডিসটা থেকে সাপের মত ঠাঁকেবেঁকে নেমে গেছে সন্ধ্যা রাস্তাটা। অনেক দূরে প্রায় খেলনার মত দেখা যাচ্ছে লেটেস্ট মডেলের প্রকাণ্ড ক্যাডিলাকটাকে, তীরবেগে ছুটছে

ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানকে নিয়ে । ঘন্টাখানেক আগে নিজের হোটেলে ফোন করে তাঁর জন্যে একজন শোফার আনিয়ে দিয়েছে ও । সে-ই চালাচ্ছে গাড়ি ।

ক্যাডিলাকটা আর প্রয়োজন হবে না মাসুদ রানার । ওকে সোফিয়ার লিঙ্কন কনভার্টিবলটা ব্যবহার করতে বলেছেন শেরম্যান ।

‘সবকিছু তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি, রানা,’ যাওয়ার আগে বলে গেছেন তিনি । ‘এসব কাজে তোমাকে পথ বাতলে দেবার মত জ্ঞান আমার নেই । প্রয়োজন হলে দিন হোক রাত হোক যে-কোন সময় আমাকে পাবে তুমি । যখনই দরকার টেলিফোন কোরো, টেলেক্স করতে গেলে সময় নষ্ট হবে । আমার সেক্রেটারিকে বলে রাখব ।

‘ওর গাড়ি ব্যবহার কোরো । কাজ শেষ হলে ওটাসহ সোফিয়ার আর যা যা আছে সব বিক্রি করে দিয়ো কোন সেলিং এজেন্টকে দিয়ে । টাকা যা আসবে এতিমখানায় দান করে দেবে । ওর ডেডবডি নিয়ে কাল সকালে নিউ ইয়র্ক ফিরে যাব ভাবছি । আর হ্যাঁ, সকালে কষ্ট করে একবার আমার হোটেলে এস । সোফিয়ার রোম অ্যাপার্টমেন্টের চাবিটা দেব তোমাকে । অল রাইট?’

মাথা দোলাল রানা ।

ওর হাতটা জোরে জোরে ঝাঁকালেন কিছুক্ষণ শেরম্যান । ঘুরে দাঁড়াবার আগে নিচু গলায় বললেন, ‘ফাইণ্ড দ্যাট পাস্ক, রানা । ফাইণ্ড হিম ফর মি ।’

‘আমি চেষ্টা করব,’ আশ্বাস দিয়েছে রানা ।

‘ওতেই হবে, সন। আর...লারসেন ফিরে এলে বোলো, ওর ওপর আমার কোন রাগ নেই। নিউ ইয়র্কের ফরেন ডেস্কে খুব শিগগিরই নিয়ে যাব আমি ওকে।’

একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। ভাবনার তল পাচ্ছে না। রবার্ট হুইটনিকে খুঁজে বের করার অনুরোধ করে গেছেন ওকে শেরম্যান। তাঁর বিশ্বাস লোকটা সোফিয়ার প্রেমিক। অথচ রানা জানে, কথাটা সত্যি নয়। ও সোফিয়ার প্রেমিক নয়। জানে, কিন্তু বলতে পারছে না কাউকে। তার মানে আর কেউ আছে এর মধ্যে। কে সে?

সেদিনের সেই রহস্যময় বিশালদেহী? কেন এসেছিল সে বেলা ভিসটায়? কি খুঁজছিল? চুরির উদ্দেশে যে আসেনি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তাহলে দোতলার ড্রেসিং টেবিলের ওপর সোফিয়ার দামি জুয়েলারির বাক্সটা পড়ে থাকত না। তাহলে? আর কিছু খুঁজছিল লোকটা? কি হতে পারে সেটা?

নাহ্, হচ্ছে না। অন্য লাইনে খুঁজতে হবে। প্রায় হতাশ হয়ে পড়ল রানা। সোফিয়ার স্বল্পকালীন রোম জীবন সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানা নেই ওর। এমন কোন সূত্র চোখে পড়ছে না যা অনুসরণ করবে। এখন একমাত্র উপায় সেই লোকটিকে যে ভাবে হোক খুঁজে বের করা। সেটাও অবশ্য সহজ কাজ হবে না। দূর থেকে কেবল লোকটার ফিগারই দেখেছে রানা, চেহারা দেখতে পায়নি অন্ধকারে। ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত নিল রানা, রোম ফিরে গিয়েই ওর এজেন্সির ছেলেদের লাগাবে ও একাজে। আশা করা যায় কাজ হবে তাতে।

বোতলটা মুখে তুলতে গিয়েও থেমে গেল ও। না, আপনমনে

মাথা দোলাতে লাগল; কাজটা ঠিক হবে না। যে-কোন কেস হাতে নেবার আগে একটা ফাইল খুলতে হয়, তাতে পুরো কেস-হিস্ট্রি তোলা হয় প্রথমেই। রানার ক্ষেত্রেও তা-ই করতে হবে। হোক না ও এজেন্সির চীফ, তাতে কি? কেস কেসই। নিয়ম নিয়মই। ওর জন্য নিয়ম-কানুন ব্যাহত হবে, তা হতে পারে না। ফাইল ওপেন করে তাতে রানা-সোফিয়ার প্রেম উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করতে হবে।

কি দাঁড়াবে তাহলে ব্যাপারটা? মোনিকা জানবে, ছেলেরা জেনে যাবে, তাদের বস্ কোন এক সুন্দরীর রূপের মোহে পড়ে ছুটে গিয়েছিল সরেনটোয় তাকে নিয়ে অবসর যাপন করতে। এখন ফাটা বাঁশে আটকে গিয়ে সাহায্য চাইছে। উঁহু, চলবে না। বড্ডো নোংরা ব্যাপার হবে সেটা। তার চেয়ে বরং কোন নামকরা এ-দেশী প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নেবে রানা। তাতে জানাজানির ভয় থাকবে কম।

উঠল রানা। ঠিক করল তাই করবে ও। কাল রোমে ফিরেই যোগাযোগ করবে ওদের কারও সঙ্গে। দোতলায় উঠে এল রানা। সোফিয়ার বেডরুমে নজর বোলাতে চায় একবার। আগেও দুই একবার এসেছে ও এখানে, কিন্তু ভাল করে দেখা হয়নি কিছুই।

চারদিকে তাকিয়ে কেমন একটা অনুভূতি হল রানার। ওর জন্যেই সোফিয়া এত সুন্দর করে ঘরটা সাজিয়েছিল ভেবে সত্যিই খারাপ লাগল। সামনের ওই পুরু গদিওয়ালা বিশাল ডবল খাট, কার্পেট, বেডশীটের সাথে ম্যাচ করা দরজা-জানালায় পর্দা, সবকিছু...।

মেয়েটি কি ভালবেসে ফেলেছিল মাসুদ রানাকে? কাজের মহিলাকে কেন বলেছিল সে যে ওর স্বামী সাংবাদিক? কোথাও তিস্ত অবকাশ-১

স্থির হতে পারছে না ভাবনাগুলো, শুধু সময়-ই নষ্ট হচ্ছে। প্রশ্নগুলোর উত্তর একমাত্র সোফিয়া দিতে পারত, কিন্তু সে আর মুখ খুলবে না কোনদিন। পুরো ভিলা তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। যদিও কি যে খুঁজছে নিজেই জানে না। শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত তেমন কিছু না পেয়ে থামল একসময়।

বড় বড় তিনটে সুটকেসে সোফিয়ার যাবতীয় জিনিসপত্র ভরে সেগুলো গাড়িতে তুলল রানা। মনে মনে বলল নিজেকে, এখানে নয়, অনুসন্ধান শুরু করতে হবে রোমে। আর কিছু রয়ে গেল কি না, দেখে নিয়ে পুলিশ স্টেশনে টেলিফোন করল ও। লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজিকে পাওয়া গেল না, লাইনে এল লেফটেন্যান্ট গুইডো।

‘মাসুদ রানা বলছি।’

‘ইয়েস, সেনর। বলুন, কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?’

ভুরু কুঁচকে উঠল ওর লোকটার অতি বিনয়ী কথাবার্তায়। ব্যাটা কি ঠাট্টা করছে নাকি? খেলাচ্ছে? ‘মিস সোফিয়ার ক্যামেরার খবর কি? ফিল্ম ডেভেলপ করিয়েছেন?’

‘ভেতরে ফিল্ম ছিল না ওটার,’ ফ্ল্যাট গলায় বলল গুইডো।

‘ছিল না?’ তাজ্জব হয়ে গেল রানা। ‘আপনি শিওর?’

‘শিওর।’

ক্যামেরাটার ফুটেজ ইণ্ডিকেটরের কথা মনে পড়ল রানার। ওখানে পরিষ্কার দেখেছে বারো ফুট ফিল্ম এক্সপোজ করা হয়েছে। লাল অক্ষরে ফুটে ছিল, ‘12’। ফিল্ম ভরামাত্র এসব ক্যামেরার ফুটেজ মিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘0’-তে চলে আসে। ফিল্ম এক্সপোজ না করা পর্যন্ত একচুল নড়ে না সংখ্যাটা। ‘আই সী,’ অন্যমনস্কের মত বলল রানা। ‘লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি কি

ভাবছেন এ ব্যাপারে?’

‘এ নিয়ে ভাবাভাবির তেমন কিছু আছে কি?’ পাল্টা প্রশ্ন করল সে। ‘ব্যাপারটা খুবই সিম্পল। ভেতরে কোন ফিল্ম ছিল না।’

‘ফুটেজ মিটারের ইণ্ডিকেশনের ব্যাখ্যাটা কি হচ্ছে তাহলে?’
কঠিন গলায় বলল রানা। মেজাজ গরম হয়ে উঠছে।

‘আমার জানা নেই, সেনর। ফ্রেনজি ফিরলে তাকে জিজ্ঞেস করব।’

‘ওয়েল, থ্যাঙ্কস। ক্যামেরাটা কোথায় আছে?’

‘আমার কাছেই।’

‘সোফিয়ার জিনিসপত্র কালেক্ট করছি আমি।’

‘ওটা আমাদের আর প্রয়োজন নেই। আপনি চাইলে নিয়ে যেতে পারেন।’

‘ও. কে। এক ঘন্টার মধ্যে আসছি আমি।’

‘ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, সেনর।’

‘আর একটা কথা।’

‘বলুন?’

‘বেলা ডিসটা থেকে মিস সোফিয়ার জুয়েলারি বক্সটা ছাড়া অন্য আর কিছু কি নিয়েছেন আপনারা? আই মীন ...’

‘না, আর কিছু নিইনি।’

‘ও.কে, থ্যাঙ্ক ইউ।’

ব্যাপারটা কিরকম হল, রিসিভার রেখে ভাবতে লাগল মাসুদ রানা, ভেতরে ফিল্ম না থেকে পারে কি করে? নাহ্, অসম্ভব। এ হতেই পারে না। অবশ্যই ফিল্ম ছিল চেম্বারে। নিশ্চয়ই কেউ বের করে নিয়েছে। কাজটা এমনভাবে করা হয়েছে যে ফিল্ম গেট

খোলার প্রয়োজন হয়নি। ওটা খুললে মিটারটা আবার ফিরে যেত '০'-তে। কিন্তু তা হয়নি।

তাছাড়া আরও একটা চিন্তার ব্যাপার আছে এখানে। রানা যেভাবে ভাবছে সত্যিই যদি সেভাবে ফিল্মটা বের করা হয়ে থাকে তাহলে নষ্ট হয়ে গেছে তা নিঃসন্দেহে। কাজটা সোফিয়াই করুক, আর যে-ই করুক, এভাবে কেন করল? পরস্পরেই বুঝল রানা, ছবিগুলো নষ্ট করার জন্যেই এই কাজটা করা হয়েছে।

সে ক্ষেত্রে সোফিয়া নিশ্চয়ই করেনি। করেছে অন্য কেউ। কে হতে পারে সে? কেন করা হল কাজটা? ছবিগুলো ধ্বংস করার জন্যে? কেন? কিসের ছবি তুলেছিল সোফিয়া?

একটু একটু করে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল মাসুদ রানা। পর পর আরও দুটোক হুইস্কি গলায় ঢালল। সত্যিই কি তাহলে হত্যা করা হয়েছে সোফিয়াকে? এটাই কি সেই কু, শেরম্যান যার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন? প্রশ্নটা বারবার ঘুরেফিরে মনে জাগছে। কে করল এ কাজ? কেন করল? কি লুকোতে চাইছিল সে?

ভাবতে ভাবতেই দ্বিতীয় সূত্রটা চোখে পড়ে গেল রানার। রোমে সোফিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে সেদিন পুরো দশ কার্টন ফিল্ম দেখেছিল ও, ছবি তুলবে বলে কিনেছিল মেয়েটি। কোথায় সেগুলো? এখানে তো নেই! ওদিকে গুইডো বলছে এখান থেকে কিছুই নেয়নি ওরা। তাহলে?

পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরেকবার পুরো ভিলা চক্কর দিল মাসুদ রানা। না। নেই কার্টনগুলো। বেরিয়ে এল ও। সামনের দরজায় তালা মেরে চাবিটা পকেটে পুরল। আরেকবার ঘুরে দেখতে চায় দুর্ঘটনাস্থলটা। ভিলার পিছনে চলে এল ও। দ্রুত

পায়ে হেঁটে চলল সেদিকে ।

দু নম্বর ভিলার মাথার ওপর পৌছেই থমকে দাঁড়াল রানা ।
রঙচঙে ছাতাটার নিচে একজোড়া ফর্সা পা চোখে পড়েছে । প্রায়
উরু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার—একটা মেয়ে । বসে আছে
ছায়ায় । পরনে সুইম কস্টিউম । ছাতার কিনারার জন্যে মুখটা
দেখতে পারছে না ও । দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল । কিন্তু মেয়েটি
ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না ।

আবার তার দিকে মন দিল রানা । পাথরের মূর্তির মত
একভাবে বসেই আছে সে, নড়ছে না একচুল । আরও কিছুক্ষণ
অপেক্ষা করার পর অধৈর্য হয়ে উঠল রানা । অসহ্য লাগছে সূর্যের
তাপ । কাছেপিঠে তেমন বড় কোন গাছও নেই যার আড়ালে
দাঁড়িয়ে রোদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে । যেখানে আছে
সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে গেলে আবার ভিলাটা চোখের আড়ালে চলে
যাবে ।

তারচেয়ে চুড়োর কাজটা আগে সেরে আসা যাক, ভাবল মাসুদ
রানা । এদিকটা পরে দেখলেও চলবে । গা থেকে কোটটা খুলে
ফেলল ও অতিষ্ঠ হয়ে । বাঁ তর্জনিতে কলারটা বাধিয়ে কাঁধে
ঝোলাল ওটাকে । তারপর রুমাল দিয়ে ঘামে ভেজা মুখ মুছতে
মুছতে হাঁটা ধরল ।

প্রথমে ক্রিফের কিনারায় এসে ঘুরে দাঁড়াল ও । চারদিকে নজর
বোলাতে লাগল সতর্কতার সাথে । এ জায়গাটা প্রায় ফাঁকা—
কয়েকটা ছোট ছোট বুনো ঝোপ ছাড়া আর কিছু নেই । দূরে
গাছের ডালে পাখি ডাকছে । মাঝে মধ্যে দমকা গরম বাতাস এসে
আছড়ে পড়ছে নাকেমুখে ।

একটা সিগারেট বের করে ধরাল রানা। তারপর মাটির দিকে নজর রেখে ধীরপায়ে চক্কর দিতে শুরু করল জায়গাটা। নির্দিষ্ট কিছু খুঁজছে না, এমনিতেই নজর বোলাচ্ছে—ফিল্মগুলো বা আর কিছু যদি পাওয়া যায়, এই আশায়। বেশি ঘুরতে হল না, দু মিনিটের মধ্যেই জিনিসটা চোখে পড়ল।

একটা বর্মা চুরুট!

থমকে গেল রানা। আধখাওয়া একটা চুরুট পড়ে আছে পথের পাশে, একটা কাঁটাঝোপের সামনে। একভাবে জিনিসটার দিকে চেয়ে থাকল রানা ঝাড়া ত্রিশ সেকেণ্ড। তারপর ওটার পাশে বসে পড়ল আস্তে করে। দু আঙুলে চুরুটটা তুলল আলতো করে, চোখের সামনে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

কে ফেলল চুরুটটা এখানে? ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান? আপনমনে মাথা দোলাল রানা। সিগার খান বটে ভদ্রলোক, কিন্তু এই ব্র্যাণ্ড নয়। তাহলে? হঠাৎ করেই জমে গেল ও। কেন যেন মনে হচ্ছে, পিছন থেকে কেউ নজর রাখছে ওর ওপর। লোকটা যে-ই হোক, খুব বেশি দূরে নেই। ঘুরে তাকাতে গিয়েও একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাল রানা। ঠিক হবে না কাজটা। সত্যিই যদি কেউ নজর রেখে থাকে, ও ঘুরে তাকালেই সতর্ক হয়ে যাবে। হয়ত সরেই পড়বে জায়গা ছেড়ে।

স্বাভাবিকভাবেই উঠে দাঁড়াল রানা। চুরুটটা চট করে ছেড়ে দিল কোটের পকেটে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। যেন পাহাড়ী বনভূমির শোভা মুগ্ধ করেছে ওকে, এমনভাবে পিছনের গাছপালার দিকে তাকাল। আসলে আড়চোখে ঘন ঘন এদিক-ওদিক চাইছে, খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে অনুসরণকারীকে।

অনেকগুলো বড় বড় ঝোপ দেখা যাচ্ছে—রানার বিশ গজের মধ্যেই। ওর যে-কোন একটার পিছনে থাকতে পারে লোকটা। অথবা মোটা কাণ্ডওয়ালা কোন গাছের আড়ালেও হতে পারে। কিন্তু অনেকক্ষণ সতর্ক নজর বুলিয়েও লাভ হল না, তেমন কিছু চোখে পড়ল না। শেষে বিরক্ত হয়ে আসল কাজে মন দিল রানা।

কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতেই গরমে জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা হল। মনে হল চাঁদি ফুঁড়ে একলাফে বেরিয়ে আসবে বুঝি ফুটন্ত মগজ। বাধ্য হয়ে ফিরতি পথ ধরল রানা। বড় ঝোপ বা গাছের পাশ কাটাবার সময় প্রতিবার পেশীগুলোকে শক্ত লোহা বানিয়ে চলতে হল ওকে সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে। সারাটা পথ শির শির করল ঘাড়ের পিছনটা। সতর্ক থাকা সত্ত্বেও দু তিনবার ঘুরে পিছনে তাকাতে যাচ্ছিল ও মনের ভুলে। বহু কষ্টে ইচ্ছেটা সামলেছে শেষ পর্যন্ত।

ভিলায় পৌঁছে আর দেরি করল না রানা, সরেনটোর উদ্দেশে ছুটল লিঙ্কন কনভার্টিবল নিয়ে। শহরে পৌঁছে প্রথমেই বেলা ভিসটার এস্টেট এজেন্টের অফিসে এল ও। ভিলার চাবি এবং সোফিয়ার দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ওখান থেকে পুলিশ স্টেশনে এল সোফিয়ার ক্যামেরাটা সংগ্রহ করতে। খবর দেয়া সত্ত্বেও আজ ওর সাথে দেখা করতে এল না গুইডো, বা ভেতরে ডেকেও পাঠাল না। ব্যাপারটা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল রানাকে। এর অর্থ কি? পুরো আধঘন্টা ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রাখা হল ওকে। তারপর এক সার্জেন্টকে দিয়ে ক্যামেরাটা পাঠিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট।

একটা রসিদে সই করে ক্যামেরাটা নিল রানা। সার্জেন্টকে তিষ্ঠ অবকাশ-১

জিঙ্কেস করে জানা গেল, ফ্রেনজি নেই। ফিরে গেছে রোমে। লাঞ্চ
সেরে হোটেলে ফিরে এল ও। রিসেপশন ডেস্ক থেকে স্যুইটের
চাবি নিল। সেই সাথে একটা খাম এগিয়ে দিল রিসেপশনিস্ট।
বলল, ‘আপনার জন্যে টেলিফোনিক মেসেজ, সেনর।’

‘কে করেছিল টেলিফোন?’

‘ইল সেনর শেরম্যান।’

“ও.কে। থ্যঙ্কস।” ওখানে দাঁড়িয়েই খামটা খুলল রানা। ছোট
একটা বার্তাঃ রানা, নেপলস ফিরে যাচ্ছি সোফিয়ার ডেডবডি
নিয়ে। ওটা দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। হোটেল
ইন্টারকনে উঠব। কাল দুপুরে তোমার অপেক্ষায় থাকব।
ধন্যবাদ।

মেসেজটা পকেটে ঢোকাল রানা। স্যুইটে এসে কাপড় ছাড়ল।
তারপর সোজা ঢুকল গিয়ে বাথরুমে। পুরো বিশ মিনিট
শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানিতে ভিজল। শীত লেগে উঠতে তোয়ালে
দিয়ে গা মুছে বেরিয়ে এল। বাথরুমে ঢোকার আগে এয়ারকুলারটা
চালিয়ে রেখে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা জুড়িয়ে গেল ওর।

চুল শুকোবার জন্যে দশ মিনিট সময় দিল ও, তারপর উঠে
পড়ল বিছানায়। মন থেকে সমস্ত ভয়, উৎকর্ষা আর দুশ্চিন্তা দূর
করে দিল। এবং দু মিনিট যেতে না যেতেই গভীর ঘুমের কোলে
তলিয়ে গেল মাসুদ রানা।

ঠিক ছ-টায় চেক আউট করল ও। তখনও প্রায় সমান তেজে
গরম ছড়িয়ে চলেছে পড়ন্ত সূর্যটা। সোফিয়ার গাড়িটা রানার
বকশিশের ওণে ঝকঝকে চেহারা পেয়েছে। সূর্যের আলো
ঠিকরাচ্ছে মসৃণ ধাতব গা থেকে। ওটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল

রানা। চলল রেল স্টেশনের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়া সরেনটো-নেপলস হাইওয়ের দিকে।

পুলিস স্টেশন ছাড়িয়ে মাইলখানেক এগোবার পর হঠাৎ করেই রিয়ার ভিউ মিররে চোখ গেল রানার। কনভার্টিবলের বিশ গজ পিছনেই আরেকটা গাড়ি দেখল ও—একটা নীল রেনল্ট। ওর সাথে সমান তালে এগোচ্ছে। কেমন সন্দেহ হল রানার। চট করে দুপুরের অদৃশ্য অনুসরণকারীর কথা মনে পড়ে গেল। সে ব্যাটা না তো? অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওটাকে লক্ষ্য করল ও। ড্রাইভার ছাড়া আর কোন আরোহী নেই। ভেতরের একটা গাড় নীল সানশীল্ডের জন্যে মুখ দেখা যাচ্ছে না লোকটার। টেনে নামিয়ে রাখা হয়েছে ওটা, তার খুতনির ওপরের কিছুই দেখতে পারছে না রানা বাধাটার জন্যে। ফলে সন্দেহটা আরও বেড়ে গেল। দেখা যাক, ভাবল রানা, কোনদিকে যায় ব্যাটা। দ্রুত বেগে ছুটল ও। স্টেশনের একটু আগে ডানে বাঁক নিয়ে নেপলস-এর পথ ধরল। হ্যাঁ, পিছু লেগে আছে রেনল্ট, তবে ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে। কম করেও একশো গজ দূরে আছে ওটা এ মুহূর্তে।

মিনিট দশেক চল্লিশ মাইল গতিতে এগোলো রানা, তারপর একলাফে ষাটে উঠে এল। প্রথমে সামান্য পিছিয়ে পড়েছিল রেনল্ট, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আবার গ্যাপটা পূরণ করে নিল গতি বাড়িয়ে। রানা গতি কমালে সে-ও কমায়, বাড়ালে সে-ও বাড়ায়।

আধ ঘন্টা চলার পর নেপলসগামী অটোস্ট্রাডায় উঠে এল রানা। এবং বিনা নোটিসে ফুটবোর্ডের সাথে চেপে ধরল এক্সিলারেটর। হুঙ্কার ছেড়ে সামনে ঝাঁপ দিল নতুন কনভার্টিবল,

পলকে স্পিডোমিটারের কাঁটা নব্বুই ছুঁয়ে ফেলল। ছুটতে লাগল
তীরবেগে। কয়েক সেকেন্ড ধরে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়তে থাকল
রেনল্ট, তারপর একসময় থেমে গেল তা। আরও কয়েক মুহূর্ত
পেরিয়ে যেতে মাঝখানের দূরত্ব কমতে শুরু করল—গতি বাড়িয়ে
দিয়েছে ওটাও।

এবার আর কোন সন্দেহ রইল না রানার মনে। সত্যিই ওকে
অনুসরণ করছে গাড়িটা। চালকের চেহারাটা কি করে দেখা যায়,
ফন্দি আঁটতে লাগল ও। হঠাৎ করেই বুদ্ধিটা এল মাথায়। আর
কয়েক মাইল সামনেই থামতে হবে অটোস্ট্রাডা থেকে বেরিয়ে
যাওয়ার সময়। অটোস্ট্রাডার টিকেট হস্তান্তর করতে হবে একটা
চেকপোস্টে, নেপলস-এ ঢোকান আগে। ওখানটায় একটা চান্স
নিতে হবে। অন্তত ওটার নাম্বারটা দেখে রাখার চেষ্টা করতে
হবে।

কিন্তু হল না। দাঁড়াবার সুযোগই পাওয়া গেল না। প্রচণ্ড ভিড়
জায়গাটায়। জানালা দিয়ে টিকেট হস্তান্তর করতে না করতেই
পিছন থেকে অনেকগুলো গাড়ির সম্মিলিত ধমক খেতে হল
ওকে—এগোতে বলছে। রেনল্ট তখন সাত-আটটা গাড়ির পিছনে।
ইচ্ছে করেই আড়াল নিয়েছে জায়গা বুঝে। এ এমন এক জায়গা,
সাইড করে গাড়ি দাঁড় করাবারও উপায় নেই। সেরকম ইচ্ছে
থাকলে আরও দু মাইল এগিয়ে সাইড রোডে ঢুকে তবে দাঁড়াতে
হবে।

ঠিক আছে, তাই সই, ভাবল রানা। এগোতে লাগল ও। কড়া
নজর রেখেছে রেনল্টটার গতিবিধির ওপর। অটোস্ট্রাডার নিয়ম-
নীতির তোয়াক্কা করছে না এখন ওটার চালক, সামনের

গাড়িগুলোকে একে-একে ওভারটেক করতে শুরু করে দিয়েছে।
কারও আপত্তিকে পাত্তা দিচ্ছে না। কারণ বুঝতে পেরেছে সে,
এখন আর দূরে থাকা ঠিক হবে না। নেপলস-এর ঘন ট্রাফিকের
ভিড়ে একবার ঢুকে পড়লে ওকে অনুসরণ করা দুরূহ হয়ে উঠবে,
তাই যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকতে চাইছে।

একে-একে ছয়টা গাড়িকে ওভারটেক করে উঠে এল রেনল্ট।
রানার আর তার মাঝখানে এখন কেবল একটা বুগাটি। এই সময়
সামনের বাঁ দিকের সাইড রোডটা চোখে পড়ল রানার। কোন
সিগন্যাল না, কিছু না, আচমকা টার্ন নিল রানা সত্তুর মাইল
গতিতে। অ্যাসফল্টের অটোস্ট্রাডায় তীক্ষ্ণ, কান ফাটানো আওয়াজ
উঠল—সাঁ করে ব্রাঞ্চ রোডে ঢুকেই কড়া ব্রেক কষল রানা, প্রায়
জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল কনভার্টিবল।

এ ধরনের অড্রাইভারসুলভ আচরণ ওর কাছ থেকে একেবারেই
আশা করেনি রেনল্ট। পাল্টা কিছু করার সুযোগ পেল না সে, তার
আগেই সময় পেরিয়ে গেছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে
অটোস্ট্রাডার দিকে চেয়ে থাকল রানা। প্রথমে বুগাটিটা ওর পাশ
কাটিয়ে সাঁ করে ছুটে গেল সামনের দিকে। রানার উদ্দেশে
ভূমূল গতিতে খিস্তি খেউর করছে ওটার চালক। বাঁ হাতে ঘুসি
দেখাচ্ছে।

এর পরপরই এল রেনল্ট, রানার দশ-বারো ফুট দূর দিয়ে
এগিয়ে গেল। শেষ সময় ঝট করে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে
নিয়েছিল চালক, তাই চেহারাটা দেখা গেল না। কিন্তু তাতে খুব
একটা কিছু আসল-গেল না। তার বিশাল চওড়া কাঁধ দেখেই যা
বোঝার বুঝে নিল মাসুদ রানা। কোন সন্দেহ নেই, এ সেই লোক।

একেই সেদিন বেলা ভিসটায় দেখেছে রানা।

গাড়িটার নাম্বার প্লেটের ওপর নজর বুলিয়ে নিতেও ভুল হল না ওর।

কেস থেকে বের করল রানা পেইলারড বোলেক্স ক্যামেরাটা। সম্ভবত সরাসরি কোন বোল্ডারের ওপর আছড়ে পড়েছিল, বডিটা তুবড়ে গেছে বিশ্রীভাবে। টেলিফটো লেন্সটা নেই। গায়েব হয়ে গেছে। ছিটকে দূরে কোথাও গিয়ে পড়েছে হয়ত, খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সাবধানে ওটার পিছনের ফিল্ম গেটের ক্যাচ খুলল মাসুদ রানা। গেটটা সামান্য ফাঁক করে ধরতেই ভেতর থেকে ইঞ্চি তিনেক লম্বা, ছেঁড়া ফিল্মের একটা টুকরো ঝরে পড়ল ওর কোলের ওপর। কিছুক্ষণ ওটার দিকে চেয়ে থাকল রানা। তারপর আবার নজর দিল ক্যামেরার দিকে। ফিল্ম স্পুল তো নেই-ই, সেই সাথে দু'দিকে ফিল্ম ধরে রাখার যে টেক-আপ থাকে, সেই দুটোও হাওয়া।

উল্টেপাল্টে দেখল রানা ক্যামেরাটা। তারপর ওটা রেখে ফিল্মের টুকরোটা তুলে নিল। ওর ধারণাই ঠিক, গায়েব জোরে পুরো রোলটা ছিঁড়ে বের করে নিয়েছে কেউ ভেতর থেকে। টানের চোটে টেক-আপ দুটো পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছে। অথচ ফুটেজ মিটারে লালের পটভূমিতে সাদা অক্ষরে ফুটে আছে '12'।

টুকরোটা আলোর সামনে তুলে ধরল ও। কিছু নেই। কালো। ওটা জায়গামত রেখে ক্যামেরাটা কেসে ঢোকাল রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে আনমনে টানতে লাগল। ডুবে গেছে গভীর

চিন্তায় ।

বোঝা যাচ্ছে, সোফিয়া এমন কিছু ছবি তুলেছিল যা অন্যের চোখে পড়ে গেলে মারাত্মক ক্ষতি হত কারও । ফলে সে-ই করেছে এ কাজ, জোর করে বের করে নিয়েছে ফিল্ম স্পুল । বা এমনও হতে পারে, ক্লিফ হেডে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিল সোফিয়া । এই সময় পিছন থেকে এগিয়ে আসে সে, পায়ের শব্দে চালু ক্যামেরাসহ ঘুরে দাঁড়ায় সোফিয়া ।

হয়ত ওটাই কাল হয়েছে মেয়েটির । নিজের সচল ছবি কাউকে দেখতে দিতে চায়নি সে । যে কারণে বল খাটাতে হয়েছে তাকে সোফিয়ার হাত থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নিতে ।

জোর খাটাতে হয়েছে!

আপনমনে মাথা দোলাল রানা, ঠিক । হয়ত ক্যামেরা দিতে চাইছিল না মেয়েটি । সম্ভবত তখনই লোকটি তার পেটে আঘাত করে । এবং তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে পড়ে যায় সোফিয়া । চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে থাকল রানা । এখন আর কোন সন্দেহ নেই । হত্যা করা হয়েছে সোফিয়াকে । ওকে হত্যা করে ফিল্মটা গায়ের জোরে টেনে বের করে আনা হয়েছে চেম্বার থেকে ।

দুর্ঘটনাবশত পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়নি সোফিয়া শেরম্যানের । আত্মহত্যাও করেনি সে । তাকে খুন করা হয়েছে । নিজের বিপদটা টের পেতে দেরি হল না মাসুদ রানার । বুঝতে পারল, আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে গেছে ও এর মধ্যে । যে করেই হোক নিজেকে মুক্ত করতে হবে ওকে এই বিচ্ছিরি ঝামেলার হাত থেকে । কাজটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মঙ্গল ।

এবং সদা সতর্ক থাকতে হবে । চারদিক ভালমত দেখেগুনে

নিয়ে তবে পা বাড়াতে হবে। নইলে চোরাবালিতে আটকে যেতে পারে পা।

তের

‘হ্যালো, মিস্টার মাসুদ রানা!’

কফির কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছিল রানা মুখ নামিয়ে, থেমে গেল মাঝপথে। ঘাড় ফিরিয়ে বাঁয়ে তাকাল। পাশেই দাঁড়িয়ে প্যামেলা শেরম্যান। পরনে ধূসর লিনেনের স্কার্ট-ব্লাউজ। সরু কোমরে সাদা বোতামের কারুকাজ করা চওড়া লাল বেল্ট। পায়ে লাল স্পাইক হিল শূ। মাথায় লাল স্কারল-ক্যাপ, ধপধপে সাদা একটা হাঁসের পালক গোঁজা রয়েছে তাতে। সব মিলিয়ে দারুণ আকর্ষণীয় চেহারা।

রাঙা ঠোট জোড়া কুঁচকে আছে হাসির ভঙ্গিতে। রানার কাঁধে ঝোলানো সোফিয়ার সিনে ক্যামেরাটার দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি ঘন ঘন। কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল রানা। নড করল প্যামেলাকে।

‘হ্যালো!’ বলল ও।

এক পা এগিয়ে এল মেয়েটি। ‘বসতে পারি?’

‘শিওর। প্লীজ, সিট ডাউন।’

‘ধন্যবাদ।’ ওর মুখোমুখি বসল প্যামেলা। লিপস্টিক চর্চিত
ঠোঁটের হাসিটা সামান্য বদলে গেছে যেন, নার্ভাস লাগছে। ‘কখন
এলেন?’

‘মিনিট পাঁচেক।’

‘তা, কি মনে করে?’

‘মিস্টার শেরম্যান আসতে বলেছিলেন।’

মৃদু ভাঁজ পড়ল প্যামেলার সুন্দর চিকন দুই ভুরুর মাঝখানে।
‘তাই নাকি?’

‘আপনার জন্যে কিছু ড্রিন্‌কস...’

‘না, ধন্যবাদ। এইমাত্র লাঞ্চ সেরেছি। জানেন তো, একটু পর
চলে যাচ্ছি আমরা নিউ ইয়র্ক?’

‘জানি।’ কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।
মেয়েটির ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা বলতে চায়। কিন্তু
ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

‘কিছু বলবেন?’

‘হ্যাঁ, মানে...’, আমতা আমতা করতে লাগল প্যামেলা।
‘কথাটা খুবই জরুরী, মিস্টার রানা। এবং গোপনীয়ও।’

‘আচ্ছা!’

‘আমার স্বামী আপনাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, সে
কাজে নামার আগে কথাগুলো আপনার জানা দরকার।’

কিছু বলল না মাসুদ রানা। একমনে সিগারেট টেনে চলেছে।
চেহারায় ‘গোপনীয়’ কথা শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা না
গেলেও ভেতরে ভেতরে রয়েছে ষোল আনাই।

‘কথাগুলো হয়ত ভাল লাগবে না আপনার,’ বলল সে। ‘হয়ত
তিক্ত অবকাশ-১

ভাববেন সোফিয়াকে আমি দেখতে না বলে ওর বদনাম করছি। আসলে তা নয়, বিলিভ মী। আবার না বলেও পারছি না। মিস্টার রানা, আমার স্বামী খুব নিষ্ঠুর এবং শক্ত মনের মানুষ। রসকষহীন, ভীষণ রকম কাঠখোটা। আবার তেমনি সেন্টিমেন্টাল। ওর ভেতরে ভালবাসা বলে যেটুকু আছে, তার সবটুকুই ছিল মেয়ের জন্যে। হয়ত বিশ্বাস হবে না, কিন্তু মেয়েটা ছিল ওর কলজের টুকরো।

‘যদিও ব্যাপারটা মেয়েকে সে বুঝতে দেয়নি কখনও। মেয়ের জন্যে চিন্তা করত সব সময়। এবং বেশি পয়সা হাতে পেলে মেয়ে বখে যেতে পারে এই ভয়ে টাকা-পয়সা তেমন একটা দিত না তাকে। যা পরে বুঝেও হয়ে দেখা দিয়েছে।’

চোখ তুলল প্যামেলা শেরম্যান। দু হাতে ভর দিয়ে সামান্য ঝুঁকে বসল সামনের দিকে। লো-কাট ব্লাউজের গলা দিয়ে তার উঁচু, ফর্সা বুকের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ‘আপনার ব্যাপারে ফ্র্যাঙ্কলিন খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে। আমি জানি সে সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার অনুরোধ করেছে আপনাকে। তার স্থির বিশ্বাস, খুন হয়েছে সোফিয়া। লোকটাকে আমি চিনি, মিস্টার মাসুদ রানা। জানি, পাহাড় টলবে, কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিন এক চুলও টলবে না তার এই বিশ্বাস থেকে। অথচ উপস্থিত সাক্ষ্য-প্রমাণ বলছে মৃত্যুটা দুর্ঘটনা। পুলিশ এবং করোনারও একই মত দিয়েছে। মনে হয় আপনিও তাই ভাবছেন।’

অনেকটা আত্মস্থ মনে হচ্ছে এখন প্যামেলা শেরম্যানকে। কেন জানে না, হঠাৎ করেই তার উপস্থিতি অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে

রানাকে। প্যামেলার চাউনির মধ্যে যেন কি একটা আছে, বুঝতে পারছে ও। কিন্তু সেটা যে কি, ধরতে পারছে না। বলল, 'আমি শিওর নই, মিসেস শেরম্যান। আগে তদন্ত করে দেখতে হবে।'

'হ্যাঁ। এবং সেজন্যেই আপনাকে এসব বলতে বাধ্য হলাম। সোফিয়ার বাবা জানত তার মেয়ের মত সুবোধ মেয়ে আর হয় না। ভদ্র শান্ত পড়াশুনার ব্যাপারে সিরিয়াস, আসলে তা সে কোনদিনই ছিল না। মৃত কারও সমালোচনা করতে পছন্দ করি না আমি। কিন্তু আজ করছি বাধ্য হয়ে। টাকার বিনিময়ে সোফিয়া করতে পারত না এমন কোন কাজ ত্রিভুবনে নেই, মিস্টার রানা। অর্থই ছিল ওর কাছে আসল। অথচ ফ্র্যাঙ্কলিন মেয়ের চাহিদার কথা না ভেবে বোকার মত খুব সামান্য টাকা দিত ওকে হাত খরচের জন্যে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। আমার জানা মতে প্রতি সপ্তায় অন্তত হাজার ডলার ব্যয় করত সোফিয়া নিউ ইয়র্কে। এরকম নীতি বিবর্জিত নোংরা চরিত্রের মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি।'

প্যামেলার কাঁপা গলার ঘৃণা মিশ্রিত মন্তব্যগুলো শুনে বিস্মিত হল রানা।

'একটুও বাড়িয়ে বলছি না আমি। সোফিয়ার মৃত্যুর কারণ তদন্ত করতে গেলেই ওর অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে আপনাকে, আপনি চান আর না চান। তখন নিজেই বুঝতে পারবেন। শুধু এবারই নয়, আগেও বহুবার প্রেগনেন্ট হয়েছে সোফিয়া। এ ওর কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। ওর ওঠাবসা ছিল দুনিয়ার যত থার্ড ক্লাস ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে। ওর খুন হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। ওভাবে মৃত্যুই ওর পাওনা ছিল।'

‘কিন্তু আপনি ভাবছেন সোফিয়া খুন হয়নি?’ বলল রানা।

একটু থমকাল প্যামেলার চাউনি। ‘আমি জানি না। শুধু জানি পুলিশ মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনা বলে মেনে নিয়েছে। কেবল আপনি আর আমার স্বামী বাকি। ওর মৃত্যু-রহস্য উদঘাটন করতে হলে অনেক নোংরা ঘাঁটতে হবে আপনাকে, মিস্টার রানা। আমি শিওর, নিউ ইয়র্কের মত রোমেও সোফিয়া চরম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। আপনি যখন আসল তথ্যগুলো বের করবেন, সেগুলো অবশ্যই শেরম্যানের কানে যাবে। এবং চরম আঘাত পাবে, যা কোনদিন ভুলতে পারবে না সে। শেরম্যান হার্টের রুগী। বেশি আঘাত পেলে এ ধরনের মানুষের কি পরিণতি হয়, তা আপনিও জানেন।’

আরেকটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। মাথার মধ্যে চিন্তা ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ‘একটা কথা জানতে চাইব, যদি কিছু মনে না করেন।’

‘অফকোর্স!’

‘মিস্টার শেরম্যানের সাথে আপনার বিয়ে হয়েছে ক বছর?’

‘দেড় বছর। কেন?’

‘সোফিয়া সম্পর্কে এত খবর এইটুকু সময়ের মধ্যে কি করে জানলেন আপনি?’

ঠোট বেঁকে গেল প্যামেলার। হাসছে। টিটকিরির ভঙ্গিতে। ‘বিয়ের অনেক আগে থেকেই ওকে চিনতাম আমি, মিস্টার রানা। নিজের চোখে ওর অনেক নোংরামি দেখেছি আমি।’

অ্যাশটেতে ছাই ঝাড়ল রানা। ‘আপনি জানেন, মিস্টার শেরম্যানের নির্দেশ অমান্য করলে আমার কি অবস্থা হবে।

আগামী কিছুদিনের মধ্যে নিউ ইয়র্কে বদলি হবার কথা আছে আমার, ফরেন ডেস্কে। তা তো হবেই না, মাঝখান থেকে হয়ত...'

'হবে,' ওকে থামিয়ে দিল মেয়েটি। আত্মহের আতিশয্যে টেবিলে কনুইয়ের ভর চাপিয়ে ঝুঁকে এল সামনে। 'আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, হবে। শুধু মাথা থেকে তদন্তের ধারণাটা বাদ দিন, বাদবাকি আমি দেখব। শুনুন, আঘাত পেয়ে এ মুহূর্তে খেপে আছে ওর বাবা। কিন্তু নিউ ইয়র্ক ফিরে কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লে নিজেকে ঠিকই সামলে নিতে পারবে। দু-চারদিন পরে টেলিফোনে যদি শেরম্যানকে আপনি জানান যে তার খারগা ভুল, কেউ খুন করেনি সোফিয়াকে, সত্যিই ও ছবি তুলতে গিয়ে পড়ে গেছে, তাহলে দেখবেন ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না সে। আপনি যদি আমার কথামত চলেন, আপনার বদলির ব্যাপারটা আমি দেখব। আমি কথা দিচ্ছি, মিস্টার রানা। অনর্থক কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করবেন না, লোকটা মরে যাবে। আগে একবার স্ট্রোক করেছে শেরম্যানের। আবার তেমন কিছু ঘটলে সত্যিই মরে যাবে ও।'

রিসেপশন হলের দিকে মুখ করে বসে ছিল রানা। ওদিকের পশাপাশি চারটে লিফটের একটা দরজা খুলে যেতেই ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানকে দেখতে পেল। বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

'মিস্টার শেরম্যান আসছেন,' বলল ও। হাত তুলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'আমার কথাগুলো মনে রাখবেন, মিস্টার রানা,' চাপা গলায় প্রায় মিনতির সুরে বলল প্যামেলা।

রানা কিছু বলার সুযোগ পেল না। তার আগেই এসে পড়লেন ভদ্রলোক। ‘হ্যালো, সন। সরি। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তোমাকে?’ বলেই প্যামেলার দিকে ফিরলেন তিনি জিজ্ঞাসু চোখে।

‘ইয়ে, মিস্টার রানা সোফিয়ার ক্যামেরাটা নিয়ে এসেছেন। ওটার ব্যাপারে কথা বলছিলাম আর কি,’ বলল সে।

ঘরের মধ্যে আচমকা বাজ পড়েছে যেন। চমকে গেল রানা। যদিও চেহারাটা স্বাভাবিক রাখল প্রাণপণে। এটা সোফিয়ার ক্যামেরা, কি করে বুঝল প্যামেলা? ও তো একটা কথাও বলেনি এ প্রসঙ্গে!

‘ঠিক আছে,’ বললেন শেরম্যান। ‘তুমি গাড়িতে গিয়ে বোসো। রানার সাথে কথা সেরে আসছি আমি। লাগেজ সব তোলা হচ্ছে কি না দেখ।’

মুখ কালো করে উঠে গেল মেয়েটি। ও বেরিয়ে যেতে রানার দিকে ফিরলেন শেরম্যান। ‘রানা, ক্যামেরাটা...।’

‘ভেবেছিলাম আপনি হয়ত দেখতে চাইবেন, তাই নিয়ে এসেছি।’

‘না। কোন দরকার নেই। ও দেখে কি-ই বা বুঝবে আমি। তোমার কাছেই রেখে দাও। ভিলায় কোন সূত্র পেল?’

‘তেমন কিছু চোখে পড়েনি,’ কথাটা ঘুরিয়ে বলল রানা।

‘চেষ্টা চালিয়ে যাও, সন। তুমি পারবে। আশা করি তুমি নিরাশ করবে না আমাকে। সে যাক, আজ সকালে ফোনে রোম পুলিশ চীফের সাথে কথা বলেছি। করোনারের সাথে তো আগেই কথা হয়েছে, তুমি জান। ওঁরা দু’জনেই সোফিয়ার মৃত্যুটাকে

অ্যাক্সিডেন্টাল হিসেবে মেনে নিয়েছে। কাজেই পুলিশ আর কোন ঝামেলা করবে বলে মনে হয় না। তুমি নিশ্চিত্তে এগোতে পার এখন।' পকেট থেকে একটা ইয়েল লকের চাবি বের করলেন তিনি। 'এটা রাখ। সোফিয়ার রোম অ্যাপার্টমেন্টের চাবি। ওর সবকিছু বিক্রি করে টাকাটা কোন অরফানেজে দিয়ে দিয়ো।'

'আচ্ছা,' চাবিটা পকেটে পুরল রানা।

এবার একটা চেক বের করলেন শেরম্যান। প্রায় জোর করেই গুঁজে দিলেন রানার হাতে। অঙ্কটা দেখল রানা—এক মিলিয়ন ডলার। রানা এজেন্সি, রোম শাখার ওপর ইস্যু করা। 'যত লাগে খরচ কোরো। আর কখন কি অগ্রগতি হয়, আমাকে টেলিফোনে জানিয়ো। খুব খুশি হব। তোমাকে ঝামেলায় ফেলে গেলাম। তবু..., 'অপ্রত্যাশিতভাবে রুদ্ধ হয়ে এল গলা। মনে হল ভেঙে পড়তে যাচ্ছেন কঠিন-হৃদয় ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান।

'চিন্তা করবেন না,' বলল রানা। 'আপনার মেয়ের হত্যাকারী-কে খুঁজে বের করবই আমি।'

'থ্যাঙ্কস, সন।'

একটু পর শেরম্যান দম্পতিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ক্যাডিলাকটা। মুখ ঘুরিয়ে পিছনদিকে তাকাল একবার প্যামেলা, চোখাচোখি হল রানার সাথে। রাজ্যের উদ্বেগ, সেই সাথে নীরব আকৃতি ফুটে আছে তার সুন্দর চোখ দুটোয়।

চোদ্দ

রোম পৌছুল রানা ঠিক ছ-টায় ।

আশায় আশায় থাকলেও সারাপথে একটিবারের জন্যেও নীল রেনল্টটিকে চোখে পড়েনি আজ ওর । যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে সান ক্যাপরিয়ানা পৌছতে প্রচুর সময় লাগল । এত পথ গাড়ি চালিয়ে আসতে নিতম্ব অবশ হয়ে গেছে রানার । ধরে গেছে কোমর ।

ঢাল বেয়ে বাংলায় উঠে এল রানা সোফিয়ার লিঙ্কন নিয়ে । গেট খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে । নিজের ব্রিফকেসটা নিয়ে নেমে এল গাড়ি থেকে । সোফিয়ার সুটকেসগুলো আর নামাল না । একটুপরই ওগুলো নিয়ে যেতে হবে ওর অ্যাপার্টমেন্টে । প্যাক করতে হবে সব ।

সোজা বেডরুমে চলে এল মাসুদ রানা । কোণের রাইটিং টেবিলের ওপর ব্রিফকেসটা রাখল । তারপর গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি আর সোডা ঢেলে নিয়ে টেলিফোনের পাশে এসে বসল । পুশ বাটন টিপতে লাগল একটা একটা করে । কথা বলবে লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজির সাথে । প্রথমে এক সার্জেন্ট ধরল টেলিফোন, পাঁচ সেকেন্ড পর লাইনে এল অফিসার ।

‘মাসুদ রানা বলছি।’

‘কখন ফিরলেন?’

‘এইমাত্র।’

‘ইল সেনর শেরম্যান কি চলে গেছেন নিউ ইয়র্ক?’

‘হ্যাঁ, নেপলস থেকেই চলে গেছেন পুন চাটার করে।
ডেডবডিটা নিয়ে গেছেন।’

‘আই সী! তারপর, আর কি খবর?’

‘খবর তো আপনাদের কাছে। ও হ্যাঁ, করোনারের সাথে কথা
হয়েছে মিস্টার শেরম্যানের। মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে মেনে
নিয়েছেন করোনার।’

‘তাই? জানি না তো!’

‘হ্যাঁ। কাল রাতে আপনার চীফের সাথেও কথা বলেছেন তিনি
ফোনে। তাঁরও ওই একই মত।’

‘ইন্টারেস্টিং!’ সতর্কতার সাথে বলল ফ্রেনজি। ‘তদন্ত শেষ না
হতেই মত দিয়ে ফেলেছেন?’

‘হ্যাঁ। সে যাক, একটা জরুরী কথা বলার জন্যে ফোন
করেছি। একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।’

‘অবশ্যই, বলুন?’

‘একটা কারের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লিখে নিন। নেপলস-এ
রেজিস্টার্ড, নীল রেনল্ট। গাড়িটা কার জানতে চাই আমি।’

‘সার্টেনলি,’ নাম্বারটা লিখে নিল লেফটেন্যান্ট। তারপর বলল,
‘ডাবনা নেই। ফোনের পাশে থাকুন। খোঁজ নিচ্ছি আমি। পনের
মিনিটের মধ্যেই রিওব্যাক করছি।’

‘থ্যাঙ্কস।’

রিসিভার রেখে দিল মাসুদ রানা। গ্লাসটা তুলে নিয়ে নরম সোফায় হেলান দিয়ে বসল। মৃদু চুমুক দিতে দিতে ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের কথা ভাবতে লাগল। যে ভাবে করোনার আর পুলিশ চীফকে ম্যানেজ করেছেন ভদ্রলোক, রীতিমত অবাকই লাগছে ভাবতে।

অন্য দেশে যে মানুষের এত প্রভাব, নিজ দেশে না জানি তার কত ক্ষমতা। ফিগার, চেহারা, চাল-চলন, কথা বলার ভঙ্গি মোটকথা সবকিছুর মধ্যেই আলাদা একটা স্বাতন্ত্র্য আছে ভদ্রলোকের। তাঁর ইচ্ছের কাছে নতি স্বীকার করবে ইটালিয়ানরা, প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলেন তিনি। দেখা যাচ্ছে ঘটেছেও তাই।

শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা টেলিফোনের পাশে নামিয়ে রাখল মাসুদ রানা। এ ধরনের মানুষ যখন যা চায়, ভাবছে ও, প্রায় সব ক্ষেত্রেই পেয়েও থাকে। ঐর প্রভাব বলয়টা আবার একটু বেশিই বিস্তৃত। একে নামকরা পত্রিকার মালিক-সম্পাদক, তার ওপর টাকার কুমির।

ভালই, ভাবছে রানা। আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছেন ভদ্রলোক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে। এতে স্বাভাবিকভাবেই সময় কিছুটা বেশি পাবে ও, যা এ-মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার। পর্যাপ্ত সময় পেলে সোফিয়ার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে ফেলতে সক্ষম হবে রানা। হয়ত।

একই সাথে প্যামেলা শেরম্যানের কথাও ভাবল ও। মেয়েটির এত ভয় পাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? কেন সোফিয়ার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করল সে ওকে? সোফিয়ার নোংরা অতীত উন্মোচিত হলে তাঁর কি এমন

ক্ষতি? সত্যিই কি ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন সে, না অন্য কোন কেচ্ছা আছে এর ভেতরে?

দশ মিনিট পর ফোন করল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। 'নাস্ভারটার ব্যাপারে আপনি শিওর, সেনর? কোন ভুল হয়নি তো?'

'মনে হয় না। কেন?'

'এ নাস্ভারের কোন গাড়ি নেপলস-এ রেজিস্ট্রি হয়নি।'

প্রেটটা তাহলে ভুয়া? চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে লাগল মাসুদ রানা। 'আই সী।' ব্যাপারটা এখানেই ধামাচাপা দেয়া ভাল। ফ্রেনজি নইলে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। বলল, 'তাহলে বোধহয় ভুলই দেখেছি, লেফটেন্যান্ট। শুধু শুধু কষ্ট দিলাম আপনাকে। সরি।'

'এর সঙ্গে লা সেনরিনার মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই তো, সেনর?'

'না না, সে-সব কিছু না,' অবলীলায় বলল ও। 'সরেনটোয় কয়েকবার দেখেছি গাড়িটাকে। তাই ভাবলাম, ওটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে রাখি। দ্যাট'স অল। আর কিছু নয়।'

'ভাল করেছেন, সেনর। অন্য আর কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে সাথে সাথে রিং করবেন। কোন দ্বিধা করবেন না যেন। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই করব। থ্যাঙ্কস।'

'ওড বাই। সী ইউ অ্যারাউও।'

অ্যারাউও কথাটার ওপর ব্যাটা খুব জোর দিল মনে হচ্ছে? চোখ কুঁচকে গেল রানার। পরক্ষণেই মৃদু হাসল। চোরের মন পুলিশ-পুলিস। সবকিছুতেই সন্দেহ।

ঘুরেফিরে প্যামেলার আকৃতিমাখা মুখের ছবি ভেসে উঠতে লাগল মনের পর্দায়। আরও জোরেশোরে তদন্ত চালাতে হবে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা। নিজের জন্যে তো বটেই, সেই সাথে লারসেনের ব্যাপারটাও দেখতে হবে। ওর ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের পথে সোফিয়ার মৃত্যু যাতে কোন বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে সেটা ওকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। খুঁজে বের করতেই হবে সোফিয়ার হত্যাকারীকে। শেরম্যান যতই বলুন, রানার ধারণা ও এ-কাজে ব্যর্থ হলে ফরেন ডেস্ক কোনদিনই জুটবে না লারসেনের।

কিন্তু ব্যাটা গেল কোথায়? সাতদিনের কথা বলে সেই যে গেল, আজ এগার-বার দিন পার হতে বসেছে, এখনও ফেরার নাম নেই। অন্তত এক-আধবার টেলিফোন করেও তো খবর নিতে পারত। এ কেমন ছেলেমানুষী? একটা সিগারেট ধরাল রানা। লারসেনের ওপরের রাগ ঝাড়তে লাগল ওটার ওপর। কষে একটার পর একটা টান দিয়ে গরম করে তুলল।

সিগারেট শেষ করে উঠল রানা। গোসল করে পেটে কিছু দিতে হবে আগে। তারপর বেরোবে ও। টনি আমান্দোর সাথে দেখা করতে হবে প্রথমে, ওখান থেকে যাবে ভায়া ক্যাভোর। সোফিয়ার জিনিসপত্র সব গোছগাছ করতে হবে।

ক্যামেরাটা বের করল রানা ব্রিফকেস থেকে। রাইটিং টেবিলের নিচের ড্রয়ারে ভরে তালা লাগিয়ে দিল। মনে পড়ল, রোম ফিরেই ফোন করবে বলে লিজাকে কথা দিয়েছিল ও। রিসিভার তুলে নাম্বার ঘোরাল রানা। কিন্তু অফিসে পাওয়া গেল না মেয়েটিকে। পাঁচবার রিঙ হতেও যখন ফোন ধরল না, তখন

লাইন কেটে দিয়ে ওর ফ্ল্যাটে ফোন করল মাসুদ রানা। সেখানেও সাড়া পাওয়া গেল না। বিরক্ত মুখে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সে।

‘মেয়েটি রোমে এসেছে আগে জানলে তোমাকে সতর্ক করতে পারতাম আমি,’ বলল টনি আমান্দো। ‘তাহলে হয়ত এ ঝামেলায় পড়তে হত না তোমাকে।’

সিগারেটে টান দিতে গিয়েও থেমে গেল মাসুদ রানা। ভুরু কুঁচকে তাকাল বন্ধুর দিকে। ‘সতর্ক করতে! কোন্ ব্যাপারে?’

‘সোফিয়া শেরম্যানের ব্যাপারে।’

‘বুঝলাম না। সোফিয়ার ব্যাপারে সতর্ক করার কি থাকতে পারে?’

‘মানে, ওর স্বভাব চরিত্রের ব্যাপারে, আর কি। চরিত্র খুব একটা ভাল ছিল না মেয়েটির। অপঘাতে সোফিয়ার মৃত্যুটা দুঃখজনক। কিন্তু হলপ করে বলতে পারি মেয়েটি বেঁচে থাকলে আজ এর চাইতেও অনেক বড় বিপদে পড়তে হত তোমাকে।’

‘কিছুই বুঝতে পারছি না। খুলে বল।’

‘সোজা কথায়, সোফিয়া ছিল একটা ব্যাকমেইলার। পুরুষের ব্যাপারে কোন বাছবিচার ছিল না। যার-তার সঙ্গে রাত কাটাত। এবং সময় সুযোগ বুঝে তাকে ব্যাকমেইল করত। এ কাজে বিশেষ করে সাংবাদিকদের প্রেঙ্কার করত সে। তুমি জান না, নিউ ইয়র্ক ডিশনের প্রায় সব সাংবাদিকই ওর শিকার হয়েছে। ওর দাবি মেটাতে বাধ্য হয়েছে তারা, নইলে বাপকে বলে শায়েস্তা করার ছমকি দিত মেয়েটি। চাকরির ভয়ে সবাই সবকিছু সহ্য করে গেছে মুখ বুজে। তোমাকেও ধরেছিল আসলে ওই ভেবেই।’

তোমার আসল পরিচয় জানলে হয়ত এর কিছুই ঘটত না।’

কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে চেয়ে থাকল রানা টনি আমান্দোর মুখের দিকে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। ‘বল কি? সোফিয়া...কিন্তু তুমি এসব জান কিভাবে? কোথেকে শুনেছ?’

‘লারসেনের কাছে শুনেছি।’

‘কিন্তু শুনলাম লারসেন নাকি চেনে না সোফিয়াকে?’

‘তাতে কি? এসব গরম খবর কি চাপা থাকে কখনও? একদিন দু দিন বাদেই তো নিউ ইয়র্ক ডেস্কের সাথে কথা হয় ওর টেলিফোনে। তাদের মুখে শুনেছে। শুধু সোফিয়া ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের মেয়ে বলে বেঁচে গেছে। নিউ ইয়র্কে বুড়োর সাংঘাতিক হোল্ড, অন্যান্য পত্রিকা মালিক পর্যন্ত সমঝে চলে লোকটাকে। যে কারণে এসব খবর ছাপতে সাহস করেনি তারা। নইলে প্রতি সপ্তায় অন্তত একবার করে লীড নিউজে আসত সোফিয়া। অবশ্য এর আরও একটা কারণ আছে। নিউ ইয়র্কের কুখ্যাত ইটালিয়ান গুণ্ডা আলবার্তো ফেলিনির বান্ধবী ছিল ও। ফেলিনিকে ভয় করে না এমন মানুষ নিউ ইয়র্কে একজনও আছে বলে মনে হয় না আমার। নিউজ চেপে যাওয়ার পিছনে ফেলিনিও একটা কারণ। সোফিয়ার বিরুদ্ধে কিছু লিখলে ওর বাপ বড়জোর চাকরিহারা করতে পারত বেয়াড়া সাংবাদিককে। কিন্তু ফেলিনি তাকে জীবিত ছাড়ত না নিশ্চয়ই। যেই ফেলিনি খুন হল, অমনি নিউ ইয়র্ক ছাড়ল সোফিয়া। অনেকের ধারণা, হত্যাকারী সোফিয়ার সাহায্যেই ফেলিনিকে খুন করতে পেরেছে। নইলে কাজটা সহজ ছিল না।’

আলবার্তো ফেলিনির খুন হওয়ার ব্যাপারটি রানা শুনেছে
আগেই। কিন্তু সোফিয়া শেরম্যান ওই মানুষটির বান্ধবী ছিল
ভাবতেই পারছে না ও। ‘সোফিয়া ফেলিনির বান্ধবী ছিল, তুমি
শিওর?’

কাঁধ ঝাঁকাল আমান্দো, ঠিক ভিটেলা ফ্রেনজির মত করে।
‘এখানে বসে শিওর হই কি করে, বল? তবে নিউ ইয়র্কের বেশির
ভাগ ক্রাইম রিপোর্টারের একই মত, সোফিয়াই সেই মেয়ে। ব্লুও।
ওখানকার যে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে খুন হয়েছে ফেলিনি, তার
ভাড়া সে-ই দিত। এত টাকা লোকটার, কল্পনাই করা যায় না।
তেমনি ছিল প্রভাব। সপ্তায় দু’দিন সেখানে বান্ধবীকে নিয়ে মৌজ
করত সে। শুনেছি শনিবার দুপুরের পর তার বান্ধবী প্রথমে আসত
সেখানে। আর সন্দের পর ও এসেছে কি না, টেলিফোনে খবর
নিয়ে তবে আসত আলবার্তো ফেলিনি, সশস্ত্র বডিগার্ডদের
পাহারায়। তারা প্রথমে ভেতরে ঢুকে পুরো অ্যাপার্টমেন্ট তন্ন তন্ন
করে সার্চ করত। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পরে ফেলিনি ঢুকত।
প্রথম প্রথম কিছুদিন দরজার বাইরে বসে গার্ড দিত ওকে বডি-
গার্ডরা, সোমবার ভোর পর্যন্ত। একবারে ফেলিনিকে নিয়ে ফিরত।
কিন্তু পরে কি জন্যে যেন আলবার্তো নিজেই সে ব্যবস্থা বাতিল
করে দেয়। ওকে ভেতরে রেখে ফিরে যেত গার্ডরা। আবার
সোমবার এসে নিয়ে যেত। সোফিয়াই যে সেই মেয়ে, তাতে
কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু মুশকিল যে কেউ তার চেহারা দেখেনি
সামনা-সামনি। গার্ডরা যখন ভেতরে ঢুকত সার্চ করতে, তখন
জানালায় কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত মেয়েটি পিছন ফিরে। ফলে
চেহারা দেখা যেত না তার। মেয়েটির ফিগার এবং অন্যান্য যে

সব বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে সবাই, এমনকি পুলিশ পর্যন্ত শিওর এ সোফিয়া শেরম্যান না হয়েই যায় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিচ্ছুটি করার নেই তাদের। ব্যাপারটা, আই মীন সোফিয়ার আসল পরিচয় ওই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের জেনিটর জানত একমাত্র। কিন্তু পুলিশ লোকটাকে ধরার আগেই টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। এ সব ওপেন সিক্রেট, রানা, নিউ ইয়র্ক ভিশনের ওখানকার প্রতিটি সাংবাদিক-কর্মচারী জানে।’

‘আই সী।’ নীরবে খানিকক্ষণ গাল চুলকাল রানা। ‘কে খুন করেছিল আলবার্তো ফেলিনিকে?’

‘সবার ধারণা, ইটোলা গ্র্যান্ডি। ওর রাইভাল। ও ব্যাটাও ইটালিয়ান। ড্রাগ-মাদক ব্যবসায়ী। লোকটাকে পরে অবাস্তিত ঘোষণা করে আমেরিকান গভর্নমেন্ট। অনুমান, ইটালিতেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে গ্র্যাণ্ডি।’

তাই কি? আনমনে ভাবছে রানা, সত্যিই কি ওকে ব্যাকমেইল করতে চেয়েছিল সোফিয়া? এই জন্যেই ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সরেনটো? মনটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলতে লাগল মাসুদ রানার। এত পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে কেন এরকম নোংরা মানসিকতার হবে? কেন ব্যাকমেইলার হবে? না হয় প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ দিতেন না ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। তাই বলে ব্যাকমেইলার হতে হবে? যার-তার সাথে রাত কাটাতে হবে, শুধুই টাকার জন্যে?

কেন? এত টাকা দিয়ে কি করত সোফিয়া? কিসে খরচ করত? ভাবতে ভাবতে চমকে উঠল ও, ড্রাগ এডিক্ট ছিল না তো মেয়েটি? হ্যাঁ, ঠিক তাই। নিশ্চয়ই হেরোয়িন বা আর কোন দামি

ড্রাগ নিত ও । সেজন্যেই এত অধঃপাতে গিয়েছিল । নইলে আর কি কারণ থাকতে পারে এর পিছনে?

চমক ভাঙল রানার । টনির দিকে ফিরল ও । ‘কিছু বলছিলে?’

‘বলছি, পরিস্থিতি কেমন মনে হয়? তোমার এর সাথে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কতটুকু?’

‘জড়িয়ে তো অলরেডি পড়েইছি, দোস্তু,’ হাসল রানা । ‘এখন চেষ্টা করছি কি ভাবে ছাড়ানো যায় প্যাঁচটা ।’

‘আমি কি তোমার কোন সাহায্যে লাগতে পারি না এ-মুহূর্তে?’

টনি আমান্দোর ডান হাত মুঠো করে ধরে মৃদু চাপ দিল মাসুদ রানা । ‘তুমি আমার জন্যে উদ্বিগ্ন ভেবে সত্যিই আমি গর্বিত, টনি । তোমার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার । পুরো ঘটনা শুনেও ঝুঁকি নিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাইছ ...’

ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সাংবাদিক । তেড়েই এল প্রায় । ‘ফের আমার সাথে গালচালাকি? যা জিজ্ঞেস করছি স্রেফ তার উত্তর দাও ।’

হেসে ফেলল রানা । ‘ঠিক এ-মুহূর্তে তোমার কিছু করার নেই, টনি । প্রয়োজন হলে পরে তোমাকে জানাব আমি ।’

‘প্রমিজ?’

‘প্রমিজ ।’

একটু পর বেরিয়ে এল রানা টনি আমান্দোর বাংলো থেকে । ছুটল ভায়া ক্যাভোর । পঁচিশ মিনিট লাগল পৌঁছতে । অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের অন-ডিউটি অ্যাটেনডেন্টকে সোফিয়ার ফ্ল্যাটে চার-পাঁচটা বড় প্যাকিং বাক্স পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে সুটকেস তিনটে নিয়ে লিফটে উঠল রানা । শেরম্যানের দেয়া চাবি দিয়ে তিস্ত অবকাশ-১

ফ্ল্যাটের ভারি এক পাল্লার দরজাটা খুলল। পা রাখল বিশাল লাউঞ্জে। হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচটা টিপে দিতেই এখানে-ওখানে অনেকগুলো আলো জ্বলে উঠল। ঝলমল করে উঠল সুসজ্জিত লাউঞ্জ। সোফিয়ার হাঙ্কা, মিষ্টি পারফিউমের সুবাস ভেতরের বাতাসে ভর দিয়ে ভাসছে এখনও। কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল মাসুদ রানা।

তারপর দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে সিটিং রুমের উদ্দেশে পা বাড়াল। চারদিক তাকিয়ে মনে হল, যেন একটু আগেই ওর সাথে সরেনটো যাওয়ার প্ল্যান আঁটছিল সোফিয়া এই ঘরে বসে। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই মেয়েটিকে শেষবারের মত চুমু খেয়েছিল ও।

পায়ে পায়ে ডেস্কটার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। এটার ওপরই ছিল ফিল্মের কার্টনগুলো, কিন্তু এখন নেই। সরেনটোর ভিলাতেও ভাল করে খুঁজে দেখেছে রানা, সেখানেও ছিল না। গেল কোথায় তাহলে? কেউ সরিয়ে ফেলেছে?

ডেস্কটার সামনে বসল রানা কার্পেটে হাঁটু মুড়ে। ডানদিকে দুটো ড্রয়ার। খোলাই আছে। সাধারণ নিত্য ব্যবহার্য টুকিটাকি ছাড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছু নেই ওতে। উল্টেপাল্টে দেখল রানা ওগুলো। ওপরেরটায় একটা ছোট নোট প্যাড, দুটো দামি বলপেন, কিছু রাবার ব্যাণ্ড, চুলের ক্লিপ ইত্যাদি অগোছাল অবস্থায় পড়ে আছে। নিচেরটা খালি। বোঝা যায় এর আগে কেউ নিশ্চয়ই হাতিয়ে গেছে ড্রয়ারগুলো। কে হতে পারে? পুলিশ? না আর কেউ?

ডোর বেলের ডং ডং আওয়াজে প্রায় চমকে উঠল রানা।

তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে উঁকি দিল। করিডরে কয়েকটা ফোল্ড করা প্যাকিং বক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাটেনডেন্ট। মোটা বকশিশ দিয়ে তাকে বিদেয় করল রানা। ওগুলো হলরুমের এক কোণে ফেলে রেখে ভেতরদিকে এগুলো আবার।

সোফিয়ার বেডরুমে এসে নজর বোলাল চারদিকে। বড়সড় রুমটার এক কোণে প্রকাণ্ড এক ক্লজিট। প্রতিটি ড্রয়ার সোফিয়ার দামি দামি ড্রেসে ঠাসা। সব লেটেস্ট মডেলের পোশাক। অবাক হয়ে ভাবল রানা, সামান্য এই ক দিনের মধ্যে এত পোশাক কি ভাবে জোগাড় করল মেয়েটি? এর একটাও ওকে পরতে দেখেনি রানা। অর্থাৎ কিনে রেখে দিয়েছে, পরার সুযোগ হয়নি। এর কোনটার দামই পাঁচশো ডলারের নিচে হবে না।

তৃতীয় ক্লজিটের এক ড্রয়ার ভর্তি শুধু কোট। গুনে দেখল রানা—কুড়িটি। এছাড়া এক ড্রয়ারে দশ-বারো জোড়া শূ এবং সব শেষের ড্রয়ারে শুধু শর্টস। ওটার ভেতরে মাঝারি সাইজের একটা ব্রিফকেস পাওয়া গেল। পাঁচ-ছয় সেট জুয়েলারি আছে ওর মধ্যে। অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল রানা। ভেবে পাচ্ছে না একা এতসব জিনিস কি করে গোছগাছ করবে। লিজার কথা মনে পড়ল। মেয়েটা থাকলে সুবিধে হত। আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক, ফোনের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে ভাবল রানা, পাওয়া যায় কি না। ভাগ্যটা ভালই, প্রথমবার রিঙ হতেই সাড়া পেল ও লিজার।

‘কোথায় তুমি? নেপলস থেকে ফিরে না ফোন করার কথা ছিল?’

‘ছিল। এবং করেওছিলাম। পাইনি। সে যাক, তোমাকে খুব তিক্ত অবকাশ-১

জরুরী দরকার আমার । বেরোতে পারবে?’

‘কোথায় যেতে হবে?’

অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের ঠিকানাটা দিল ওকে রানা । ‘ট্যাক্সি নিয়ে চলে এস এখনই । আমি অপেক্ষা করছি ।’

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও থেমে গেল রানা । সামনের দেয়ালের গায়ে কয়েকটা আবছা কালচে সংখ্যা চোখে পড়েছে । ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সংখ্যাগুলো দেখল রানা । পেন্সিল দিয়ে তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে । ওটা সম্ভবত কোন টেলিফোন নাম্বার হবে, ভাবল রানা, রোমের । কিন্তু দেয়ালে কেন লিখে রেখেছে সোফিয়া?

এক মুহূর্ত ভাবল ও । তারপর দ্রুত রিসিভার তুলে নাম্বারটা ঘোরাল । প্রায় সাথে সাথে ওপ্রান্ত থেকে মৃদু কির-কির-কির-কির শব্দ উঠল । রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল রানা । ছ বার রিঙ হওয়ার পর কেউ ধরছে না দেখে ফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ‘ক্লিক’ করে আওয়াজ উঠল লাইনে ।

পরক্ষণে যেন বোমা পড়ল রানার কানের কাছে । ভীষণ মোটা, কর্কশ একটা কণ্ঠ প্রায় ধমকে উঠল ইটালিয়ান ভাষায় । ‘কাকে চাই?’

ঝটকা মেরে রিসিভারটা ছ ইঞ্চি দূরে সরিয়ে নিল ও । এমন অমার্জিত, বিকট কণ্ঠ আর কখনও শোনেনি রানা । চুপ করে থাকল ও । একটা চিকন গলার গান শোনা যাচ্ছে, সম্ভবত রেডিও বাজছে । কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আবার খেঁকিয়ে উঠল ইটালিয়ান । ‘হ্যালো! হু ইজ ইট?’

লোকটার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে নখ দিয়ে

রিসিভারের মাউথপীসে খড়মড় আওয়াজ তুলল রানা।

‘হ্যালো! কথা বলছেন না কেন?’

এর পর পরই একটা সুরেলা নারীকণ্ঠ কানে এল ওর।
কণ্ঠধারিণী যে আমেরিকান, বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না।

‘কাকে ধমকাচ্ছ, সনি? কে টেলিফোন করেছে?’

‘কি জানি,’ ইংরেজিতে বলল এবার লোকটা। ‘কথা বলছে না।
হারামজাদা,’ দড়াম করে আছড়ে ফেলল সে রিসিভার।

আলতো করে রেখে দিল রানা রিসিভার। সনি...ভাবছে ও,
এবং তার সঙ্গে আমেরিকান মেয়ে। কি মীন করে ব্যাপারটা? না
কি কিছুই মীন করে না? সোফিয়ার সাথে কি সম্পর্ক ছিল এদের?
সম্পর্ক যাই হোক, ফোন নাম্বারটা দেয়ালে কেন লিখে রেখেছিল
সে? টেলিফোনে আলাপ করার সময় নাম্বারটা ওকে দিয়েছিল সনি
বা মেয়েটা? এবং হাতের কাছে কাগজ না পেয়ে তাড়াতাড়ি
ওখানে লিখে রেখেছে?

উঁহঁ, আপনমনে মাথা নাড়ল রানা, মিলছে না। তাই যদি হত,
তাহলে ফোন রেখে নাম্বারটা ব্যক্তিগত নোটবুকে টুকে রাখত
সোফিয়া শেরম্যান, মুছে ফেলত দেয়ালের লেখাটা। সেটাই ছিল
স্বাভাবিক। তাহলে? হলরুমে লিজার সাড়া পেতে ভাবনাটা
ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখল রানা।

‘ব্যাপার কি, রানা?’ লিজার চোখে সন্দেহের ছায়া দেখতে
পেল রানা পরিষ্কার। ‘একা একা কি করছ এখানে?’

‘সোফিয়ার যাবতীয় জিনিসপত্র বিক্রি করার নির্দেশ দিয়ে
গেছেন শেরম্যান। তাই এসব প্যাক করতে এসেছি।’

‘বিক্রি করে দিতে বলেছেন? কেন?’

‘জানি না। বিক্রি করে যা আসবে, কোন অরফানেজকে সে টাকা ডোনেট করতে হবে।’

‘আচ্ছা!’

‘আমার দ্বারা এসব হবে না। একটু হেল্প কর, প্লীজ।’

‘কোন চিন্তা নেই।’

খোলা ক্লজিটের কাছে গিয়ে সোফিয়ার পোশাক, জুতো, জুয়েলারির ওপর নজর বোলাল লিজা। ‘মাই গড!’ বলল সে, ‘লা সেনরিনা বাপের পয়সার শ্রাদ্ধ করেছেন দেখছি রোমে।’

‘ঠিকই বলেছ।’

‘এটার যা দাম,’ একটা ড্রেস তুলে ধরল লিজা, ‘তা আমার এক মাসের বেতনের চাইতেও বেশি,’ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়তে লাগল সে। বলল, ‘বেচারি!’

ওর মন্তব্যটা কানে যায়নি রানার। সনির কথা ভাবছে ও। কেন যেন মনে হচ্ছে এই লোকই সেই নীল রেনন্টের আরোহী।

‘তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে ভাবছিলাম, রানা,’ ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল লিজা। ‘অবশ্য তুমি যদি মাইও না কর।’

‘শিওর। কি কথা?’

‘সেনরিনা সোফিয়া সেদিন ফোনে নিজেকে মিসেস রবার্ট হুইটনি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন কেন?’

চমকে উঠল রানা। ‘হোয়াট! কি বললে?’

এক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে লিজা। ‘আমি দুঃখিত, রানা। কিন্তু মৃত্যুর আগের দিন সেনরিনা যখন ফোন করলেন তোমাকে, তখন নিজেকে তিনি মিসেস রবার্ট হুইটনি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আগে দুয়েকবার টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে

আমার । তাঁর গলা আমি চিনি ।’

হতভঙ্গের মত মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে থাকল রানা ।
বুকের ভেতর টিপ টিপ করছে । সর্বনাশ! ভাবল ও, ক্যামেরার
ফিল্টার কিনে নিয়ে যাওয়ার কথা জানাতে যে ফোন করেছিল
সোফিয়া, কথাটা বেমালুম ভুলেই বসে ছিল ও এতদিন । কি উত্তর
দেয়া যায় এ প্রশ্নের ভেবে পেল না রানা ।

‘আর একটা প্রশ্ন করি?’

সম্মোহিতের মত মাথা দোলাল রানা ।

‘লা সেনরিনার মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই, আই
বিলীভ?’

‘ওহ্, নো! ফর গড্‌স সেক!’ প্রায় চৈঁচিয়ে উঠল রানা ।
‘আমাকে তুমি...’

‘অল রাইট, রানা । তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি না । তবে
কোথাও অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটে গেছে, গত কয়েকদিন
তোমার চেহারার পরিবর্তন দেখে বুঝতে পেরেছি আমি । তাই
জানতে চাইলাম । সে যাক, এস, এগুলো প্যাকিং শেষ করি
আগে । পরে কথা হবে ।’

রানাকে প্রায় কিছুই করতে হল না । সব কাজ লিজা একাই
করে চলেছে । কাজের ফাঁকে ফাঁকে এটা-ওটা নিয়ে আলাপ করছে
রানার সাথে । কিন্তু জমাতে পারছে না, আগের চেয়ে অনেক গভীর
হয়ে গেছে রানা । কথা বলছে না পারতপক্ষে । চেয়ে-চেয়ে দেখছে
লিজাকে ।

কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে লিজা, এমন সময় বেজে উঠল
ডোরবেল । হাত থেমে গেল মেয়েটির, রানার দিকে তাকাল

জিজ্ঞাসু নেত্রে । নীরবে একে অন্যের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ ।

‘কে?’ আস্তে করে বলল মেয়েটি একসময় ।

উত্তর দিল না মাসুদ রানা । বেরিয়ে এল সিটিংরুম থেকে । বড়সড় হলরুমটা পেরিয়ে এসে দরজার নবে হাত রাখল । আবার বেজে উঠল ডোরবেল । আস্তে করে পাল্লাটা মেলে ধরল রানা ।

গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে লেফটেন্যান্ট ভিটোলা ফ্রেনজি । ‘গুড ইভনিং,’ ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল লোকটা । রানার মনে হল যেন ভেংচে উঠল । ‘মে আই কাম ইন?’

পনের

বেঁটে লোকটার শীতল, অভিব্যক্তিহীন মুখের দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা । ওর চোখের পাতা বারকয়েক পিট পিট করল । এ লোকটিকে এরকম মুহূর্তে মোটেই আশা করেনি ও । অমন স্থির চোখে চেয়ে আছে কেন ব্যাটা? নাড়ীর স্পন্দন খানিকটা দ্রুততর হল রানার । আবার কোন খারাপ খবর নিয়ে আসেনি তো? রানা-ই যে রবার্ট হুইটনি, জেনে গেছে? খানিকটা হলেও অনুভব করল রানা, পুলিশের সামনে আচমকা পড়ে গেলে অপরাধীর মনের অবস্থা কেমন হয় ।

টের পেল, ওর পেছনে সিটিংরুমের দোরগোড়ায় এসে

দাঁড়িয়েছে লিজা। ‘গুড ইভনিং, লেফটেন্যান্ট,’ বলল সে।

বো করল লোকটা তার উদ্দেশে। দৃষ্টি এখনও রানার মুখের ওপর সঁটে আছে।

একটু হাসির ভঙ্গি করল রানা জোর করে। সরে দাঁড়াল একপাশে। ‘শিওর। ভেতরে আসুন, লেফটেন্যান্ট।’

সঙ্গে আরও একজন আছে। দরজার আড়ালে ছিল বলে দেখতে পায়নি এতক্ষণ ওরা কেউ। এ লোক আরও বেঁটে। খুব শক্তপোক্ত দেহের গঠন। তার ভীষণ চওড়া কজি দেখে রীতিমত ঈর্ষা বোধ করল রানা। ভেতরে এসে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে আগন্তুকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের। ‘সার্জেন্ট মেনিট্রি।’

সিটিংরুমে এসে দাঁড়াল ওরা। সার্জেন্ট এল না। দরজার ফ্রেমে কাঁধের ভর চাপিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কাত হয়ে। না তাকিয়েও পরিষ্কার টের পাচ্ছে রানা কঠিন দৃষ্টিতে ওকে মাপছে লোকটা।

‘ইঠাৎ কি মনে করে, লেফটেন্যান্ট?’ গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রানা। ‘আমরা এখানে আছি জানলেন কি করে?’

‘এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম,’ এদিক-ওদিক তাকাল ফ্রেনজি। বড় বড় প্যাকিং বাক্সগুলোর দিকে তাকাল। ‘আলো জ্বলছে দেখে ভাবলাম একবার ঘুরে যাই।’

‘বসুন।’

‘নো, থ্যাঙ্কস।’ ঘুরে ঘুরে প্যাকিং বাক্সগুলো দেখতে লাগল ফ্রেনজি। দু হাত কোটের পকেটে। দু পা এগিয়ে খোলা জানালা তিষ্ঠ অবকাশ-১

দিয়ে নিচের রাস্তা দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে দাঁড়াল।
'সেনর রানা, আজ দুপুরে সেনরিনা শেরম্যানের ক্যামেরাটা নিয়ে এসেছেন আপনি, তাই না?'

'হ্যাঁ। লেফটেন্যান্ট গুইডো বলল ওটা আর আপনাদের কোন কাজে লাগবে না, তাই নিয়ে এসেছি।'

'আমিও অবশ্য সেরকমই ভেবেছিলাম প্রথমে,' পকেট থেকে নিজের পছন্দের কটুগন্ধি ইটালিয়ান সিগারেট বের করে ধরাল লেফটেন্যান্ট। জানে এ জিনিস রুচবে না রানার, তাই সাধল না।
'ওটা যদি আরেকবার নিয়ে যেতে চাই আমি, আপনি কি আপত্তি করবেন?'

'না না, কিসের আপত্তি? কাল সকালেই আপনার অফিসে পৌছে দেব ওটা।'

'আজই দিয়ে দিন না। নেই এখানে?'

'সরি, না। ওটা আমার বাংলায়।'

'আমি যদি আপনার সঙ্গে গিয়ে ওটা কালেক্ট করি, অসুবিধে হবে?'

'মোটাই না। কিন্তু ব্যাপার কি?'

'ওর ভেতরে কোন ফিল্ম ছিল না, ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ক্যামেরাটা খুবই দামি, এবং জটিল। চেম্বারে ফিল্ম নেই, অথচ ফুটেজ মিটার ইনডিকেট করছে বারো ফিট ফিল্ম এক্সপোজ করা হয়েছে। এ নিয়ে এক্সপার্টের সাথে আলাপ করেছি আমি। তার মতে ভেতরের ফিল্ম কেউ বের করে নিয়েছে। অবশ্য, নট ইন প্রপার ওয়ে, অফকোর্স। তাই আরেক-বার চেক করে দেখতে চাই।'

‘বেশ তো।’

‘আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন কে করেছে কাজটা?’

‘কোনটা?’

‘কে বের করেছে ফিল্মটা?’ আগের চাইতে আরও তীক্ষ্ণ, আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে ফ্রেনজির দু-চোখ। মুহূর্তের জন্যেও রানার মুখের ওপর থেকে নজর সরাচ্ছে না সে।

‘মনে হয় সোফিয়াই করেছে।’

‘সম্ভাবনা কম। ওটা জোর খাটিয়ে বের করা হয়েছে ফিল্ম চেম্বারের গেট না খুলেই। অর্থাৎ আলোয় নষ্ট হয়ে গেছে পুরো বারো ফিট ফিল্ম। জেনেশুনে অমন কাজ কেন করতে যাবেন লা সেনরিনা?’

দু পা পিছিয়ে একটা চেয়ারে বসল রানা। ‘লেফটেন্যান্ট,’ বলল ও। ‘ব্যাপারটা তো মিটেই গিয়েছিল। তাহলে আবার এসব নিয়ে কেন খোঁচাখুঁচি করছেন?’

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রেনজি। ‘আমি জানতে পেরেছি, লা সেনরিনা সরেনটো যাবার আগে পুরো দশ কার্টন ফিল্ম কিনেছিলেন। অথচ তার একটাও খুঁজে পাইনি আমি, না এখানে, না সরেনটোয়। আপনার জানা নেই, আজ এখানে এসেছিলাম আমি, তন্ন তন্ন করে সার্চ করে গেছি। পাইনি ওগুলো।’

‘তাই নাকি? জানতাম না তো!’

‘আপনি কি সেনরিনার জিনিসপত্র সব সরিয়ে নিতে এসেছেন?’ বাক্সগুলো দেখালো সে ইশারায়।

‘হ্যাঁ। ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের সেরকমই নির্দেশ আছে।’

ডান হাতের আঙুলগুলোর নখ পরীক্ষা করে দেখল কিছুক্ষণ

ফ্রেনজি। চোখ না তুলেই বলল, 'কিন্তু আমি দুঃখিত। কাজটা আপাতত বন্ধ রাখতে হবে আপনাকে, মৃত্যু-রহস্য তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অ্যাপার্টমেন্টটা সীল করে রেখে যাব আমি।'

কিছু বলল না মাসুদ রানা। আড়চোখে একবার লিজার মুখের দিকে তাকাল। ধরা পড়ে গেল সাথে সাথে। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকেই চেয়ে ছিল মেয়েটা।

'কিছু না,' আবার বলল লেফটেন্যান্ট। 'রুটিন ওঅর্ক বলতে পারেন একে।'

'কিন্তু আপনাকে তো বলেইছি, অফিসার, মিস্টার শেরম্যান আমাকে বলে গেছেন ব্যাপারটা মিটে গেছে। করোনার মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনাজনিত বলে রেকর্ড করতে সম্মত হয়েছেন। আপনার চীফও...।'

মৃদু হাসি ফুটল ফ্রেনজির মুখে। রানার সামনের একটা সোফায় বসল সে। 'ঠিক। কিন্তু সে সিদ্ধান্তটা ছিল তাৎক্ষণিক-ভাবে পাওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে লা সেনরিনার মৃত্যুটা আসলে হোমিসাইডাল।'

'আপনার তৎপরতায় খুব একটা সন্তুষ্ট হবেন না শেরম্যান।'

'আমার দুর্ভাগ্য।'

'আপনি কি আপনার চীফের সাথে আলোচনা করে নিয়েছেন এ ব্যাপারে? তাঁর সাথেও কথা বলে গেছেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান।'

কার্পেটের ওপর ছাই ঝাড়ল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। ঘুরে দোরগোড়ায় দাঁড়ানো সার্জেন্ট মেনিট্রির দিকে তাকাল এক পলক। 'হ্যাঁ, কথা বলেছি। চীফ আমার সাথে একমত। তবে আমি জোর দিয়ে বলছি না যে সত্যিই খুন হয়েছেন লা সেনরিনা সোফিয়া।

মৃত্যুটা দুর্ঘটনাজনিত হবার চান্স এখনও আছে। কিন্তু নিখোঁজ ফিল্ম, এই দীর্ঘদেহী লোকটা, যাকে ওইদিন সরেনটোয় দেখা গেছে ইত্যাদি দুই একটা ব্যাপার একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না আমরা। যে-জন্যে বাধ্য হয়েছি আমি নতুন করে তদন্ত শুরু করতে। ইউ নো, আরও একটা ব্যাপার ধাঁধায় ফেলেছে আমাকে। সেনরিনার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সাথে কথা বলেছি আমি আজ। শুনেছি, তিনি প্রতি সপ্তায় মাত্র আটশো ডলার পেতেন ইল-সেনর শেরম্যানের কাছ থেকে। রোমে আসার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল দুটো মাত্র সুটকেস। অথচ এগুলো দেখুন,' তর্জনী দিয়ে বাক্সগুলো ইঙ্গিত করল লেফটেন্যান্ট। 'এত সব দামি দামি পোশাক সামান্য এই ক দিনের মধ্যে কি করে কিনলেন সেনরিনা? ওরকম দামি একটা গাড়ি কেনার মত এত টাকা কোথায় পেলেন? এই অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়ার বিষয়টাও বিবেচনা করতে হবে। তিনশো ডলার, সেনর রানা, এর প্রতি সপ্তার ভাড়া,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা অসহায় ভঙ্গি করল লোকটা। 'আমার অসুবিধেটা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই?'

অজান্তেই মাথা ঝাঁকাল ও, বুঝতে পেরেছে। সোফিয়ার অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছে লেফটেন্যান্ট, এবং সঠিক পথেই এগোচ্ছে। প্যামেলা শেরম্যানের ফ্যাকাসে মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার। কথাগুলো কানে ভাসছে পরিষ্কার। "প্লীজ, মিস্টার মাসুদ রানা, দয়া করে এসব নোংরা ঘাঁটতে যাবেন না"।

'হুম্!' বলল রানা, 'বুঝতে পারছি।'

'চলুন, আপনার ওখানে যাই,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'ক্যামেরাটা

পেলে আপনাকে আর বিরক্ত করার দরকার পড়বে না।’

‘ও. কে,’ চেয়ার ছাড়ল রানা। ‘চলুন। লিজা, তুমিও চল। ক্যামেরাটা অফিসারকে দিয়ে ডিনার সেরে নেব বাইরে।’

ডান হাত সামনে বাড়াল ফ্রেনজি। ‘অ্যাপার্টমেন্টের চাবিটা, সেনর রানা। ভাববেন না, দু-চারদিনের মধ্যেই ওটা ফিরিয়ে দিতে পারব আপনাকে। আশা করি।’

বিনা বাক্যব্যয়ে চাবিটা দিয়ে দিল রানা। হাত বদল হয়ে চলে গেল ওটা সার্জেন্ট মেনিটির পকেটে। ওরা তিনজন লিফটে উঠল এসে। সার্জেন্ট এল না।

‘ভাল কথা, সেনর রানা, তখন যে গাড়ির নম্বরটা আমাকে দিয়েছিলেন, ওটার সাথে কি সেনরিনা সোফিয়ার কোন সম্পর্ক আছে?’ বলল লেফটেন্যান্ট।

খানিকটা কঠিন শোনাল এবার রানার গলা। ‘আই টোল্ড ইউ, লেফটেন্যান্ট, ওটাকে কয়েকবার সরেনটোয় দেখেছি আমি। ব্যাস। তার সাথে ওটার সম্পর্ক ছিল কি ছিল না জানা নেই আমার।’

‘আই সী।’

লিফট থেকে নেমে কার পার্কে এল ওরা। একটা পিলার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সোফিয়ার গাড়িটার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। ‘আপনি কি আমাদের সঙ্গে আসবেন?’

‘হ্যাঁ,’ ঘুরে নিজের জীপগাড়িটার দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। ‘ওটা মেনিটি নিয়ে আসবে,’ পিছনের সিটে উঠে বসল সে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ি চালান রানা। রাত যত বাড়ছে, ট্রাফিকের ভিড়ও যেন ততই বাড়ছে। ফোরামের চারদিকে

পিঁপড়ের মত গিজগিজ করছে অগণিত গাড়ি।

‘সেনর, সেনরিনা সোফিয়ার দু একজন ফ্রেণ্ডের নাম জানাতে পারেন আমাকে?’

‘সরি, অফিসার,’ রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে লোকটার মুখের ভাব দেখার চেষ্টা করল রানা। ‘এ নিয়ে সম্ভবত আগেও একবার কথা হয়েছে আমাদের।’

‘রাইট,’ নাকের ডগা চুলকাল ফ্রেনজি, ‘সরি।’

ফ্লোর বোর্ডে ধূপ ধূপ আওয়াজ উঠছে। পা ঠুকছে চিন্তিত গোয়েন্দা। ‘সেনরিনার সাথে আপনার আলাপ হয়েছে নিশ্চয়ই?’

‘অবশ্যই। কিন্তু নিজের ফ্রেণ্ডদের ব্যাপারে কখনই কিছু বলেনি সে আমাকে। আমিও অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি।’

‘সেনরিনা মারা যাওয়ার দু’দিন আগে তাকে নিয়ে ট্রেভি রেষ্টুরেন্টে ডিনার করেছিলেন আপনি, ঠিক না?’

আচমকা কেউ যেন ভয়ঙ্কর এক পাঞ্চ কষেছে রানার হৃৎপিণ্ডের ঠিক নিচে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ওর। আর কি কি জানে ব্যাটা?

‘হ্যাঁ। গিয়েছিলাম। আমি একাই যাচ্ছিলাম অবশ্য। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তাই...ভদ্রতার খাতিরেই...’

‘দ্যাট’স অল রাইট, সেনর। কোন মেয়েকে নিয়ে ডিনার করার মধ্যে আমি অন্যায় কিছু দেখি না। ওই একবারই বেরিয়ে-ছিলেন আপনারা দু জনে?’

একটা বাঁক নিয়ে গাড়ি সিঁধে করল রানা। পরিষ্কার শুনতে পেল সশব্দে দম নিচ্ছে লিজা।

‘পার্ডন?’

‘ফরগেট ইট ।’

এক মিনিট পর নিজের বিলাসবহুল বাংলোর গেটের সামনে
গাড়ি থামাল রানা । গেট খুলে ভেতরে ঢোকাল গাড়ি ।

‘তোমরা এগোও,’ দরজা খুলে নেমে গেল লিজা । ‘আমি
আসছি গেট বন্ধ করে ।’

পোর্চের নিচে এসে থামল রানা । দু’পাশের দরজা দিয়ে ও আর
লেফটেন্যান্ট একই সাথে পা রাখল মাটিতে ।

‘আসুন,’ বলল রানা । ঘাড়ের পিছনটা কেন যেন শিরশির করে
উঠল ওর । মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা একটা ভয়ের স্রোত নেমে গেল
নিচের দিকে । বুঝতে পারছে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে বেঁটে
গোয়েন্দা ।

দু পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল ও । বাংলোর সামনের দরজাটা
খোলা, খানিকটা ফাঁক হয়ে আছে দেখা যাচ্ছে ।

‘এনিথিং রং, সেনর রানা?’ পিছন থেকে বলল ফ্রেনজি ।

‘হ্যাঁ । ফ্রন্ট ডোরটা খোলা দেখছি । অথচ...পরিষ্কার মনে
আছে, তালা মেরে রেখে গিয়েছিলাম আমি ।’

‘আপনি শিওর?’

‘অফকোর্স,’ দৃঢ়স্বরে বলল ও । ‘দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে
পড়ার মত ভুল কখনই হয় না আমার ।’ দ্রুত পা বাড়াতে যাচ্ছিল
রানা, পিছন থেকে ওর কজি চেপে ধরল ফ্রেনজি শক্ত করে ।

‘প্লীজ, আমাকে আগে যেতে দিন,’ বলল সে । ওকে পাশ
কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল দরজার দিকে । আঁসতে করে দরজা ধাক্কা
দিয়ে মেলে ধরল পুরোটা । ঘরের ভেতরে দুশো মাইল বেগে
টাইফুন বয়ে গেছে যেন । সমস্ত জিনিসপত্র লওভও হয়ে আছে ।

সবগুলো বাতি জ্বলছে ভেতরের ।

পুরো বাংলো এক চক্কর দিয়ে এল ওরা । রানার বেডরুমের কাবার্ড হা হা করছে । ভেতরের কাপড়-চোপড় সব গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে । রাইটিং টেবিলের ড্রয়ারগুলো খোলা—ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কাগজপত্র । নিচের ড্রয়ারটার তালা ভাঙা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল রানা ।

ভেতরে চোখ বোলাবার প্রয়োজন বোধ করল না । ওটার মধ্যে ছিল সোফিয়ার সিনে ক্যামেরাটা । ছিল । এখন নেই!

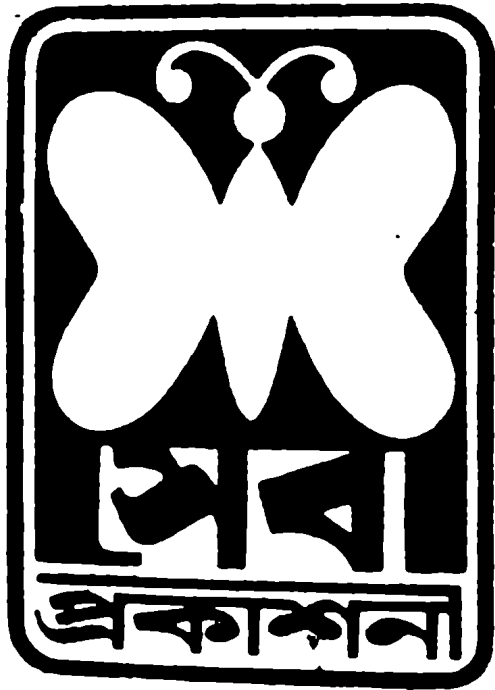
আগামী খণ্ডে সমাপ্য ।

মাসুদ রানা

তিলু অবকাশ

কাজী আনোয়ার হোসেন





তেইশ টাকা

ISBN 984 -16 - 7198 - 0

প্রকাশক :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৯২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ শরাফত খান

রচনাঃ বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রাকরঃ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

দূরালোপনঃ ৪০৫৩৩২

জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো রুমঃ

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-198

TIKTO ABOKASH

Part-II

By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে ।
বিচিত্র তার জীবন । অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি ।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর ।

একা ।

টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না ।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায় ।

পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি ।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই ।

সীমিত গতিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে ।

আপনি আমন্ত্রিত ।

ধন্যবাদ ।

এক

সাদা পোশাকের ডিটেকটিভরা ঘুর ঘুর করছে বাংলোর সবখানে। প্রতিটি কামরা প্রতিটি কোনা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ফিঙ্গার প্রিন্টের আশায়। ঘন ঘন ক্যামেরার ফ্ল্যাশগান ঝলসচ্ছে, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই তার ছবি তোলা হচ্ছে সামনের দরজার ভাঙা ইয়েল লকের এবং রাইটিং টেবিলের নিচের ড্রয়ারটার ছবি তোলা হয়েছে চার-পাঁচটা করে, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। ডিটেকটিভদের সঙ্গে এ-কামরা ও-কামরা ছোট্টাছুটি করছে ভিটেলা ফ্রেনজি। মহাব্যস্ত।

রানার আশপাশ দিয়ে এর মধ্যে কম করেও বার দশেক আনাগোনা করেছে লোকটা, কিন্তু একবারও তাকায়নি ওর দিকে। এমন ভাব করছে যেন রানার অস্তিত্বই নেই। রানা নিজেও ব্যস্ত। লাউঞ্জের একটা ওন্টানো সিঙ্গেল সোফা সিধে করে নিয়ে বসে আছে তার ওপর গ্যাট হয়ে। আধঘন্টা আগে পৌঁছেছে ডিটেকটিভের দল ফ্রেনজির টেলিফোন পেয়ে, এইটুকু সময়ের মধ্যে পর পর চারটে সিগারেট ধ্বংস করেছে।

লোকগুলো আসার একটু আগে নিজাকে প্রায় জোর করেই বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছে রানা। যেতে চাইছিল না মেয়েটি। শেষে ভিক্ত অবকাশ-২

রানার চাপাচাপিতে বাধ্য হয়েছে যেতে।

ভাঙা ড্রয়ার এবং ক্যামেরাটার উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রানার বক্তব্য শুনে নিয়েছে ফ্রেনজি প্রথমেই। রানার ধারণা ওর একটা কথাও লোকটা বিশ্বাস করেনি। অবশ্য বলার সময় একবারও রানাকে বাধা দেয়নি সে। শুধু শুনে গেছে। রানা থামতে কেবল, 'হুঁ' বলে ফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফোন করেছে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।

লোকটার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে রানারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। ড্যাম কেয়ার ভাব এসে গেছে ভেতরে। যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। অবশেষে সোয়া এগারটার সময় তল্লাশি শেষ হল। এক এক করে সব কজন ডিটেকটিভ লাউঞ্জে এসে ভিড় করতে লাগল।

একটা চেয়ার এনে রানার মুখোমুখি বসল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। 'ব্যাপারটা কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছে, সেনর রানা,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'মাত্র কয়েক ঘন্টা হল ক্যামেরাটা এনেছেন আপনি, এরমধ্যেই চুরি হয়ে গেল সেটা। এমন অস্বাভাবিক একটা ঘটনা...'। থেমে গেল সে বক্তব্য শেষ না করেই।

'শুধু ক্যামেরাই নয়, সেই সাথে এক সুটকেস ভর্তি আমার কাপড়-চোপড়, কিছু ক্যাশ ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই চুরি হয়েছে। প্রথমেই জানিয়েছি আপনাকে। ভুলে গেছেন বোধহয়,' কড়া গলায় বলল মাসুদ রানা।

'না, সেনর। ভুলিনি। কিন্তু সারা বাংলা খুঁজেছি আমরা, আপনার ছাড়া কোথাও অন্য কারও ফিঙ্গার প্রিন্ট পাইনি একটিও।'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। কাঁধ ঝাঁকাল। হাতের সিগারেটটা উপচে পড়া অ্যাশট্রে-তে ফেলে দিল আগুন নিভিয়ে। নতুন আরেকটা চিভার খোরাক দিয়েছে ওকে লেফটেন্যান্ট। এতবড় তোলপাড় হয়ে গেল, অথচ একটা ফিঙ্গার প্রিন্টও পাওয়া গেল না? এছাড়া আরও ব্যাপার আছে ভেতরে।

রানা নিশ্চিত, আসলে শুধু ক্যামেরাটার জন্যেই এসেছিল...সে যেই হোক। কিন্তু সেই সাথে নিয়ে গেছে আরও কিছু জিনিসপত্র। কেন? উত্তরটাও পেয়ে গেল ও একটু ভাবতেই। যে কাজটা করেছে, সে পুলিশকে বোঝাতে চাইছে, শুধু ক্যামেরাটা চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল না তার। কি অর্থ দাঁড়াচ্ছে এর?

যেন রানাকে সন্দেহ করা হয়। চুরির ঘটনাটাকে একটা ধাপ্পা বলে ভাবুক পুলিশ। ও নিজেই এ ঘটনা সাজিয়েছে বলে মনে করুক। কিন্তু কেন? কেন ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে?

‘ঘটনাটা আমার চীফকে রিপোর্ট করতে হচ্ছে,’ বলল ফ্রেনজি। চিন্তিত ভঙ্গিতে চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে।

এবার উত্তর দিল রানা। চাঁছাছোলা গলায় বলল, ‘চাইলে প্রেসিডেন্টের কাছেও রিপোর্ট করতে পারেন।’ সোফা ছাড়ল ও। ‘এবার আসুন, লেফটেন্যান্ট। আগে চোরাই মালগুলো উদ্ধার করুন, তারপর কথা হবে আবার। সো লও।’

‘লা সেনরিনার হত্যার তদন্ত চলছে, সেনর। এ মুহূর্তে ক্যামেরা হারানোটা একটা গুরুতর ক্ষতি হিসেবে দেখছি আমরা। নিঃসন্দেহে তদন্ত বিঘ্নিত হবে এতে।’

‘ওটা আপনার শবযাত্রা, লেফটেন্যান্ট। আমার নয়। ক্যামেরাটা যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাহলে রেখে দিতেন! কেন তিক্ত অবকাশ-২

গুইডো দিল ওটা আমাকে? এমনভাবে কথা বলছেন যেন আপনাকে সমস্যায় ফেলার জন্যে চুরির ঘটনাটা আমিই সাজিয়েছি!’

রানা উত্তেজিত হয়ে উঠছে দেখে নরম গলায় বলল ফ্রেনজি, ‘আপনি অনর্থক রেগে যাচ্ছেন, সেনর। আমি তা ভাবছি না।’

সাথে সাথে গলা খাদে নামাল মাসুদ রানা। তার অনুকরণে বলল, ‘ভুল করছেন আপনি। আমি রাগ করিনি। এখন দলবল নিয়ে যদি বিদেয় হন খুশি হব। ঘরদোর গোছগাছ করতে হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে।’

কিন্তু যাই যাই করেও আরও আধঘন্টা পার করে দিল গোয়েন্দা অফিসার। তার নির্দেশে আরও একবার বাংলো সার্চ করে দেখল অন্যরা, পিছু ধাওয়া করার মত অন্য কোন সূত্র ফেলে গেছে কি না চোর, সেই আশায়। কিন্তু ব্যর্থ হতে হল। একসময় সবাইকে বিদেয় করে দিয়ে নিজেও বেরিয়ে যাচ্ছিল ফ্রেনজি। কি মনে করে ঘুরে দাঁড়াল দোরগোড়ায় পৌছে।

‘পুরো ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়ল এর ফলে, সেনর,’ বলল সে। ‘আপনাকে ক্যামেরাটা দিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি গুইডোর।’

‘জানি। কিন্তু সেজন্যে আমাকে নয়, গুইডোকে দায়ী করতে পারেন আপনি, অফিসার। ব্যাপারটা দুঃখজনক। এ ব্যাপারে বড়জোর দুঃখ প্রকাশ করতে পারি, নাথিং মোর।’ আড়মোড়া ভাঙল রানা। হাই তুলল লম্বা করে। যেন নিজেকে শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলল, ‘বড্ড ঘুম পাচ্ছে।’

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও বলল না ভিটেলা ফ্রেনজি। নিজস্ব ঢঙে কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ

বোলাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে । পরিষ্কার বুঝল রানা, বেশ কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিল সে ওকে । কেন বলল না কে জানে ।

দরজা বন্ধ করে সিটিং রুমের দিকে নজর দিল রানা । চারদিক তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা । মন বলছে, এ সেই লোক ছাড়া আর কেউ নয় । সেই প্রকাণ্ডদেহী-ই দায়ী এ জন্যে । সনি, খুব সম্ভব ।

টেলিফোনে গুইডোর সঙ্গে কথা চলছে ফ্রেনজির ।

‘আমাকে না জানিয়ে ক্যামেরাটা ওকে দিয়ে দেয়া মোটেই উচিত হয়নি,’ বলল সে ।

‘দুঃখিত । ভেবেছিলাম ওটা আর কাজে লাগবে না,’ বলল লেফটেন্যান্ট গুইডো । ‘সত্যিই কি মনে হয় ঘটনাটা ও-ই সাজিয়েছে?’

‘এছাড়া আর তো কিছু মাথায় আসছে না আমার । চেম্বারে ফিল্ম ছিল না, কারও কোন হাতের ছাপও পাইনি আমরা ওটার গায়ে । তাহলে ওটা চুরি করতে যাবে কে? কিসের জন্যে? একটা কারণ তো চাই ।’

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল গুইডো । তারপর বলল, ‘তাহলে ...আমরা যাকে খুঁজছি তাকে বোধহয় পেয়ে গেছি, না কি?’

‘তাই তো মনে হয় ।’

‘ট্যাক্সি ড্রাইভারটাকে খুঁজে পেয়েছি । ও যা বলছে তাতে আমি শিওর, ও ব্যাটাই সেই । আমিই ফোন করতাম তোমাকে । আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের জন্যে মাসুদ রানাকে দরকার হবে আমার ।’

‘ওয়েল, কবে?’

‘কাল। বা পরশু হলেও চলবে।’

‘অল রাইট। পেয়ে যাবে।’

সবে সিটিং রুমটা মনুষ্য বাসোপযোগী করার কাজ শেষ করেছে মাসুদ রানা। এমন সময় গাড়ির আওয়াজ এল পোর্চ থেকে। আবার কে এল? পরমুহূর্তে নক হল দরজায়। ফ্রেনজি-ই এসেছে হয়ত আবার। হয়ত নতুন কোন প্রশ্ন মনে পড়ে গেছে।

লিজা ভ্যালিটি দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

‘কি ব্যাপার, তুমি?’

‘ইয়ে...মানে, কি কি চুরি গেছে জানতে এলাম,’ কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল মেয়েটি।

কয়েক সেকেণ্ড তার দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। তারপর দরজা ছেড়ে পিছিয়ে এল। ‘এসো।’

দরজার ভাঙা লকটার ওপর চোখ বুন্ডিয়ে নিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। নিঃশব্দে ভিড়িয়ে দিল দরজা।

‘খুব বেশি কিছু নিতে পেরেছে, রানা?’

‘তেমন কিছু নয়। কিছু কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা, ব্যাস। বসো। ড্রিস্কস?’

‘থ্যাঙ্ক ইউ। ব্র্যাণ্ডি, পুঁজি।’ একটা চেয়ারে বসল লিজা ভ্যালিটি। রানার ওপর থেকে চোখ সরাস্তে না।

নিজের জন্যে এক পেগ হুইস্কি আর ওর জন্যে ব্র্যাণ্ডি টেলে সেন্টার টেবিলে এনে রাখল রানা। বসল মুখোমুখি। নীরবে পান করছে দুজনে, কারও মধ্যে কথা বলার কোন লক্ষণ নেই। থেকে

থেকে চোখাচোখি হচ্ছে কেবল ।

গ্রাস শেষ করে সিগারেট ধরাল রানা । ভুরু নাচাল লিজার উদ্দেশে । ‘আসলে কি জন্যে আসা হয়েছে?’

‘ঘরে বসে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না, রানা । ফোন করার চেষ্টা করেছি কয়েকবার । রিঙ হয়, অথচ ধরো না তুমি । তাই...’

চোখ কোঁচকাল রানা । ‘কখন?’

‘সেই দশটা থেকে চেষ্টা করছি ।’

অবাক হল রানা । রাগও হল কিছুটা । ‘অসম্ভব! আমি কোথাও যাইনি । ঘরেই ছিলাম । রিঙ হলে নিশ্চয়ই শুনতে পেতাম ।’

হঠাৎ কি খেয়াল হতে উঠল ও । রিসিভার তুলে কানে লাগাল । ডেড! আশ্চর্য! অথচ একটু আগেই এখান থেকে পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে ফোন করেছিল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি । চোখ কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল রানা । ব্যাপারটা কি?

পরক্ষণেই মেঝেতে পড়ে থাকা টেলিফোনের প্লাগটার ওপর চোখ পড়ল । কখন কার পায়ে পঁচিয়ে গিয়েছিল তার, টান খেয়ে ছুটে এসেছে ওটা সকেট থেকে । লক্ষ্যই করেনি ও এতক্ষণ । ‘তাই তো!’ বিড়বিড় করে বলল । প্লাগটা জায়গামত ঢুকিয়ে দিতেই ফিরে এল ডায়াল টোন ।

‘সরি, লিজা,’ অপ্রস্তুতের মত হাসল মাসুদ রানা ।

‘তা-ও ভাল,’ বলল মেয়েটি । ‘আমি ভয় পাচ্ছিলাম...’

‘আমাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ভেবে, তাই না?’ লিজাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল ও । ‘আমাকে নিয়ে দূর্ভাগ্যে আছ ভেবে ভালই লাগছে । ধন্যবাদ ।’

মুখ লাল হুঁপে উঠল মেয়েটির । চোখ নামিয়ে চেয়ারের হাত-

তিক্ত অবকাশ-২

লের কোণ খুঁটতে খুঁটতে বলল সে, 'আমার বাসায় ফোন করেছিল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। সেনরিনার ব্যাপারে এটা-ওটা প্রশ্ন করছিল। তোমার ব্যাপারেও। বলার সুযোগ পাইনি তোমাকে।'

'আচ্ছা! কখন?'

'আজ সকালে।'

'তারপর?'

'লোকটাকে আমি সেনর শেরম্যানের কাছ থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে বলেছি।'

'কি বলল ফ্রেনজি?'

'বলেছে, তারচে' ও বরং কোন ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও রাজি আছে।' হেসে উঠল লিজা ভ্যালেরি। 'উনি কি আছেন এখনও, না চলে গেছেন?'

'চলে গেছেন। সোফিয়ার ডেডবডি নিয়ে।'

আবার কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল। টের পেল রানা, ভেতরে ভেতরে উসখুস করছে মেয়েটি। সব জানার জন্যে ছটফট করছে, কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছে না।

মৃদু হাসল রানা। 'আমি জানি, খুব অস্থির হয়ে উঠেছ তুমি সব শোনার জন্যে,' বলল ও। 'কিন্তু দুঃখিত, এ মুহূর্তে বিস্তারিতভাবে তোমাকে জানাতে পারছি না কিছু। ধৈর্য ধর, দুএকদিনের মধ্যেই জানতে পাবে।'

'ঠিক আছে। ধরছি।'

'ওড গার্ল।'

দুই

ধীরেসুস্থে নাশতা সারল মাসুদ রানা। ধূমায়িত কফির কাপটা নিয়ে বসল এসে টেলিফোনের পাশে। গভীর চিন্তায় মগ্ন। বুঝতে পারছে না কোন পথে এগোবে। একমাত্র সনির টেলিফোন নাম্বারটা ছাড়া এ-মুহূর্তে হাতে আর কোন সূত্র নেই। নীল রেনল্টটার সূত্র ধরে এগোবে, সে পথ বন্ধ। ওটার নাম্বার প্লেটটা ভুয়া। ও পথে এগিয়ে লাভ নেই। রোমে নীল রেনল্টের সংখ্যা একেবারে কম হবে না। তাছাড়া কে জানে, এতক্ষণে হয়ত আগের নাম্বার বদলে ফেলা হয়েছে।

রিসিভার তুলল রানা। ফোন করল রানা এজেন্সিতে। মোনিকা আলবিনো ধরল। 'রানা? কোথায় ছিলে এতদিন? তোমার না সোমবার ফিরে আসার কথা ছিল?'

'মুশকিল! এত প্রশ্নের উত্তর দেই কি করে একসাথে?'

'কাল খবরের কাগজে দেখলাম...ব্যাপারটা সত্যি না কি, রানা?'

'সত্যি।'

'কিন্তু, তুমিও তো ওখানেই...'

'ঠিক ধরেছ, গভীর গলায় বলল রানা। 'কিন্তু বসের ব্যক্তিগত

লাইফ নিয়ে অত প্রশ্ন করতে নেই। এখন যা বলি, শোন।’

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মোনিকা। ‘বেশ, বল।’

‘একটা টেলিফোন নাম্বার লেখ। চেষ্টা করে দেখ, আজই জানাতে পার কি না, এটা কার নাম্বার।’

নাম্বারটা লিখে নিল মোনিকা। ‘মনে কর জেনে গেছি। আর কিছু?’

‘আপাতত এটুকুই।’

‘আজ বিকেলে আসছ না অফিসে?’

‘ঠিক নেই। সম্ভব হলে আসব। রাখছি।’

কফিতে চুমুক দিয়েই আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল রানার।
ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। আবার রিসিভার তুলল ও,
লিজা ভ্যালেন্টিনের বাসায় রিঙ করল। সাড়ে আটটা বাজে সবে।
এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয় বেরিয়ে পড়েনি সে।

একবার রিঙ হতেই সাড়া দিল লিজা। ‘হ্যালো!’

‘মাসুদ রানা।’

‘হ্যাঁ, বল।’

‘প্যামেলাকে তুমিই তো জানিয়েছিলে যে আমি আর, মিস্টার
শেরম্যান সরেনটো আছি, তাই না? তুমিই তো তাকে সোফিয়ার
মৃত্যুর খবর দিয়েছিলে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘আমি?’ বিস্মিত হল লিজা। ‘কবে? না তো!’

চুপ করে থাকল রানা। মনে আছে, শেরম্যান বলেছিলেন
লিজার কাছে খবর পেয়েই সেখানে গিয়েছিল প্যামেলা।

‘ব্যাপার কি, রানা?’

‘না, কিছু না। এমনিতেই জিজ্ঞেস করলাম।’ লাইন কেটে দিল

রানা। চিন্তার খোরাক আরেকটা পাওয়া গেল। দেখা যাচ্ছে অনেক খবরই অ্যাডভান্স পেয়ে গিয়েছিল প্যামেলা শেরম্যান। ওদের সরেনটো উপস্থিতি এবং রানার কাঁধে যে সোফিয়ারই ক্যামেরা ছিল সেদিন, অন্তত এ দুটো খবর সে-সত্যই প্রমাণ করে। কোথায় পেল সে এসব খবর?

তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা। লা ইটালিয়া ডেল পোপোলোয় যাবে প্রথমে। প্যামেলা সম্পর্কে টনি আমান্দো কিছু জানে কি না, শুনতে হবে। এর ব্যাপারে আগে নিশ্চিত হতে হবে।

বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারায়। মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে রোমের আকাশ। ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে আজ সারাদিনেও হয়ত সূর্যের মুখ দেখা যাবে না। রোমের এই আবহাওয়া একদম পছন্দ হয় না রানার। বৃষ্টি নেই তো নেই। কিন্তু যখন শুরু হবে, তখন আর থামার নামটি করবে না। ঘাস লতাপাতা পচিয়ে গন্ধে বাতাস ভারি করে তবে থামবে।

রানার প্রশ্ন শুনে ব্যাস্গাত্তক সুরে বলল টনি, 'ইনিও আছেন নাকি এর মধ্যে?'

'চেন নাকি ওকে?'

'চিনি না মানে? রোমে কে না চেনে অমন জ্যান্ত বোমাটিকে? বছরের সাত-আট মাসই তো পড়ে থাকে এখানে আর প্যারিসে শপিঙের নাম করে।'

'আসলে কে মেয়েটি? শেরম্যানের সাথে পরিচয় কিভাবে?'
নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা।

'এ-ও আলবার্তো ফেলিনির আরেক বান্ধবী। ওর নাইট ক্লাবের সবচে সুন্দরী এবং নামকরা গায়িকা ছিল এক সময়।'

সোজা হয়ে গেছে রানা। আবার ফেলিনি! ‘ওখানেই তাহলে সোফিয়ার সাথে পরিচয় ওর?’

‘হতে পারে,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ক্রাইম রিপোর্টার। ‘কেন?’

‘প্যামেলা বলছিল অনেক আগে থেকেই সোফিয়াকে সে চেনে। যাক, শেরম্যানের সঙ্গে ওর পরিচয় কিভাবে?’

‘শুনেছি, ওই নাইট ক্লাবেই নাকি প্যামেলাকে দেখেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর যাকে বলে দেখেই কাৎ। ইন ফ্যাক্ট, ওখানে, ওইদিনই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন শেরম্যান। তিনদিনের মাথায় শুভকাজ সম্পন্ন হয়।’

‘হুম!’

‘আরে, কি হল, উঠছ যে?’ রানাকে আর কোন কথা না বলে হাঁটা দিতে দেখে বলে উঠল টনি। ‘বোসো! এক কাপ কফি অন্তত...’

‘এখন আর বসব না। কাজ আছে দেখা হবে পরে,’ বলতে বলতে বেরিয়ে এল ও।

সবে সকাল সাড়ে দশটা, অফিসের কাশের ভাব দেখলে মনে হয় যেন রাত নেমেছে। বাধ্য হয়ে ট্রিট লাইট জ্বেলে দিয়েছে করপোরেশন। ট্রাফিকের ভিড় অনেক কম। ওয়াইপার চালু করে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা। নীল ইয়র্ক ভিশন যাবে।

মাইলখানেক এগুতে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই নীল রেনল্টটার ওপর চোখ পড়ল ওর। একটা ব্রাঞ্চ রোড থেকে বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় উঠল। রানার বিশ-পঁচিশ গজ পিছন পিছন আসছে। রাস্তার দু’পাশে একটা ঝলমলে শপিং সেন্টারের আলোয় ওটার বৃষ্টিভেজা গা চিক চিক করে উঠল।

নাথার প্রেটটা পরিষ্কার দেখা গেল—সেই একই নাথার।

ব্যাপারটা সম্ভবত দৈব-সংযোগ, ভাবল রানা। ড্রাইভার ওকে দেখেনি। তবুও পরীক্ষা করে দেখা দরকার। গতি সামান্য বাড়াল ও লিঙ্কনের, ব্রেন চলছে ফুল স্পীডে। কি করে ওটাকে নিজের সামনে আনা যায় ভাবছে। ঝুঁকিপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিল রানা। ঠিক করল, মাঝখানের দূরত্বটা আরও একটু বাড়াবে প্রথমে, কোন নির্জন রাস্তায় টেনে নিয়ে যাবে রেনল্টটাকে। তারপর আচমকা ব্রেক কষে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবে লিঙ্কন ওটার চালক কিছু টের পাওয়ার আগেই। এতে একেবারে মুখোমুখি হতে পারবে সে রেনল্টের। রাস্তা ভেজা থাকায় সুবিধে হবে।

কিন্তু খানিক এগিয়েই টের পেল রানা, ওর ধারণা আসলে ভুল। দৈব-সংযোগ নয়, ওর পিছনেই আসলে লেগেছে রেনল্ট। সেদিনকার মতই ওর গতির সঙ্গে সমান তাল রেখে এগোচ্ছে। দাঁড়াও, শালা! দাঁতে দাঁত চেপে বিচ্ছিরি একটা গাল দিল রানা। বিড়বিড় করে বলল, ‘তোমার চেহারা মোবারক না দেখে আজ ছাড়ছি না, মোষ বাবাজী!’

রেনল্টটাকে পঞ্চাশ গজ পিছনে রেখে কলোসিয়ামের সামনে এসে পড়ল মাসুদ রানা। প্রবল বৃষ্টির ফলে কলোসিয়ামের চত্বর আর কার পার্ক বলতে গেলে একদম ফাঁকা। এই তো চাই! স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে প্রকাণ্ড ইমারতটার পিছন দিকে চলে এল রানা। এই ফাঁকে চট করে রিয়ার ভিউ গ্লাসে চোখ বুলিয়ে নিল। আসছে! মাঝখানের দূরত্ব এ মুহূর্তে সম্ভবত চল্লিশ গজ মত হবে।

লিঙ্কনের স্পীডোমিটারের কাঁটা এক লাফে আশিতে উঠে পড়ল, প্রকাণ্ড লাফ দিল গাড়িটা। পরক্ষণেই গ্যাস পেডালের ওপর

থেকে সরে গেল রানার পা। প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল ও ব্রেকের ওপর। কাজ হল ওতেই, স্টিয়ারিং ঘোরাবার দরকার হল না। ভেজা রাস্তায় তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে সাঁৎ করে ঘুরে গেল গাড়ি, একেবারে মুখোমুখি এখন লিঙ্কন আর রেনল্ট। এমন অঘটনের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না রেনল্টের ড্রাইভার। খতমত খেয়ে গাড়ি প্রায় দাঁড় করিয়েই ফেলেছিল সে, কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারল পর-মুহূর্তে। রানা তখন এসে পড়েছে তার বিশ গজের মধ্যে।

ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েই আবার ছুট লাগাল রেনল্ট, লিঙ্কনের পাশ ঘেঁষে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে বেরিয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে পলকের জন্যে ড্রাইভারের মুখটা দেখতে পেল মাসুদ রানা। উল্টে বেকুব বনে গেল ও এবার। সেই বৃষক্ক নয়। একটি মেয়ে চালাচ্ছে গাড়িটা। তার ছোট্ট ফর্সা মুখটা এবং ঘাড়ের নিচ পর্যন্ত ছড়ানো একমাথা ঘন চুল দেখতে পেয়েছে ও পরিষ্কার।

দু'পাশে পানি ছিটিয়ে সাঁই সাঁই ছুটছে রেনল্ট উল্টোদিকে, ওটার টেইল লাইট ক্রমশ ছোট হয়ে চলেছে। সচকিত হল মাসুদ রানা। ব্রেক ছেড়ে দাবিয়ে ধরল এক্সিলারেটর, চোখের পলকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ধাওয়া করে চলল ওটাকে। ততক্ষণে আরও এগিয়ে গেছে রেনল্ট, কামানের গোলার মত ছুটে চলেছে ভায়া দেই কোরি ইম্পেরিয়ালির দিকে।

পলায়নপর শেয়ালকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে যেন নেকড়ে। প্রশস্ত মসৃণ রাস্তায় চড় চড় চড় চড় আওয়াজ উঠছে, সবগুলো কাঁচ তুলে রাখার পরও বিরক্তিকর আওয়াজটা কান দুটোকে পীড়া দিচ্ছে রানার। রেনল্টের প্রায় দ্বিগুণ গতিতে ছুটছে রানা। কিন্তু তারপরও হেরে গেল ও প্রতিযোগিতায়। সামনে এসে পড়েছে

পিয়াযা ভেনেযিয়া—রোমের ব্যস্ততম বিপণীকেন্দ্র । প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই মহাব্যস্ত থাকে জায়গাটা ।

ঘন বৃষ্টির ফাঁক দিয়ে পিয়াযার আলোগুলোর ওপর চোখ পড়তে গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে রেনল্ট । মেয়েটি বুঝতে পেরেছে । অনুসরণকারীকে কলা দেখানোর এটিই মোক্ষম স্থান । রানাও টের পেয়েছে ব্যাপারটা, কিন্তু করার নেই কিছুই । ওদিকে স্কোয়াড কার লেগেছে পিছনে, দূর থেকে ওটার চড়া পর্দার উঁচুনিচু সাইরেন শোনা যাচ্ছে ।

গতি কমাতে বাধ্য হল মাসুদ রানা, নইলে চোখের পলকে ঘটে যেতে পারে কোন মারাত্মক ঘটনা । কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যই নেই রেনল্টের, টানা হর্ন বাজিয়ে একই গতিতে পিয়াযায় ঢুকে পড়ল ওটা । পর পর তিনটে গাড়িকে পাশ কাটাল ঐকেবেঁকে । ভাগ্য ভাল, দাঁড়িয়ে ছিল ওগুলো, নইলে সংঘর্ষ এড়ানোর কোন উপায়-ই ছিল না । দেখতে না দেখতে পিয়াযা ছেড়ে বেরিয়ে গেল রেনল্ট, তুমুল গতিতে টাইবার-এর দিকে ছুটে চলল ।

অপেক্ষমান গাড়ির ভিড়ে ঢুকে পড়ল রানা, থেমে দাঁড়াল চট করে । স্কোয়াড কারের সাইরেন অনেক কাছে এসে পড়েছে । পুলিশের সাথে নতুন আর কোন হাঙ্গামায় জড়াতে চায় না ও নিজেকে । এক মিনিট পেরোবার আগেই ঝড়ের বেগে পিয়াযায় এসে ঢুকল স্কোয়াড কারটা । কিন্তু দাঁড়াল না, রাস্তায় টায়ারের তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে বাক নিয়ে ছুটল টাইবার-এর দিকে ।

পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা । মাঝারি গতিতে ফিরতি পথ ধরল । ভায়া ক্যাভোর পেরিয়ে এসে ঘুরপথে তিষ্ঠ অবকাশ-২

কলোসিয়ামের দিকে চলল। কে মেয়েটা? আনমনে ভাবছে মাসুদ রানা, এই-ই কি সেই মেয়ে, যার গলা শুনেছিল ও কাল টেলিফোনে? লোকটার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? সামনে-পিছনে ভুয়া নাম্বার লাগিয়ে ঘুরছে কেন গাড়িটা?

কার্লো মনটি। দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকার কলামিস্ট। চেহারাটা সব মিলিয়ে লেডিকিলার গোছের। ছ'ফুট লম্বা। এক-মাথা কোঁকড়া সোনালি চুল। দীর্ঘ, খাড়া নাক। গাঢ় নীল চোখ। দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। ঢোলা আকাশী নীল টি-শার্ট আর সাদা ট্রাউজারে চমৎকার মানিয়েছে মনটিকে। রানার মুখোমুখি বসেছে সে। পাশে টনি আমান্দো।

‘আমার বন্ধু মানুষ,’ রানার সাথে মনটিকে পরিচয় করিয়ে দিল টনি। ‘সোফিয়ার সাথে পরিচয় ছিল এর। কাগজে ওর মৃত্যু সংবাদ পড়েছে। তোমার কাছে নিয়ে এলাম। ভাবলাম, আলাপ করলে হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে যেতেও পার।’

‘ধন্যবাদ, টনি। ভালই করেছ।’

‘লারসেনও ওর পরিচিত। তোমার ওপর শেরম্যান ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব দিয়েছেন জেনে নিজেই দেখা করতে চাইল।’

‘আচ্ছা।’

‘ব্যাপারটা দুঃখজনক,’ মন্তব্য করল কার্লো মনটি।

‘কোন সন্দেহ নেই,’ উঠে দাঁড়াল রানা। ‘উইল ইউ হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক?’

‘থ্যাঙ্কস। ব্র্যাণ্ডি, প্লীজ।’

‘তুমি?’ টনিকে জিজ্ঞেস করল ও।

‘ব্র্যাণ্ডি দাও।’

তিন গ্লাস পানীয় নিয়ে ফিরে এল রানা। বসল আবার মুখোমুখি।

‘আসলে-ই কি ছুটি কাটাতে সরেনটো গিয়েছিল সোফিয়া?’
এক চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখল মনটি।

মাথা দোলাল রানা। ‘হ্যাঁ।’

‘ব্যাপারটা তাহলে স্ট্রেইটফরোয়ার্ড, তাই না?’ রানার দিকে তাকাচ্ছে না কলামিস্ট। ‘আই মীন, সত্যিই তাহলে দুর্ঘটনা ছিল ওটা?’

প্রশ্নটার মধ্যে গূঢ় কোন অর্থ আছে। কিন্তু বুঝেও না বোঝার ভান করল ও। বলল, ‘আসলে, এ ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ আছে। ওর বাবার ধারণা হত্যা করা হয়েছে তাঁর মেয়েকে।’

কপাল কোঁচকাল কার্লো মনটি। কিন্তু তাকাল না মুখ তুলে। ‘পুলিস? ওদেরও কি একই ধারণা?’

‘সেরকমই মনে হচ্ছে। প্রথমে অবশ্য ওরাও এটাকে দুর্ঘটনা ভেবেছিল। এখন মনে হয় অন্য কিছু ভাবছে।’

এবার চাইল লোকটা। ওর চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল, ‘আমি বাজি রেখে বলতে পারি, সেনর রানা, সোফিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। ওটা দুর্ঘটনা নয়।’

একটা সিগারেট ধরাল রানা। খোলা প্যাকেটটা এগিয়ে দিল ওদের দুজনের দিকে। ‘কি করে এত নিশ্চিত হলেন?’

‘রোমে পা রেখেই একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছিল সোফিয়া। আমার ধারণা ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে বাধ্য হয়েই কাজটা করেছে কেউ। ঠেলে ফেলে দিয়েছে ক্লিফহেড

থেকে। মেয়েটা ছিল একটা ট্রাবলমেকার, সেনর রানা। এই কদিনেই আমার মত অনেকের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল সোফিয়া।’

‘খুলে বল,’ বলল টনি আমান্দো।

একটু ইতস্তত করল কার্লো মনটি। তারপর বলল, ‘ক্যান উই টক অফ্‌ দ্য রেকর্ড?’

‘অফ কোর্স,’ জোর দিয়ে বলল রানা। ‘গো অ্যাহেড।’

‘রোম আসার চার দিন পর এক পার্টিতে সোফিয়ার সাথে পরিচয় হয় আমার। প্রথম আলাপেই খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল মেয়েটি। আমিও বোকার মত...দু’রাত কাটায় সোফিয়া আমার সাথে,’ কাঁধ ঝাঁকাল মনটি। ‘ইউ নো, একটা মেয়ের ভেতর পুরুষ যা যা আশা করে। তার সবই ছিল সোফিয়ার। রূপ, ফিগার, সব। তারওপর, ওরও আত্মহের কোন কমতি ছিল না। প্রস্তার দিতেই রাজি হয়ে গেল। নিজের বাংলোয় তালা মেরে আমার ওখানে গিয়ে উঠল। কিন্তু...।’ থেমে গেল সে।

‘কিন্তু কি?’ বুঝতে পারছে রানা, এখনই হয়ত নোংরা ব্যাকমেইলের কাহিনী শুনতে হবে। কিন্তু তবুও শোনা দরকার।

‘তৃতীয়দিন সকালে অফিসে যাব, এই সময় সোফিয়া এসে টাকা চাইল আমার কাছে।’

‘ধার চাইল?’

‘ওয়েল, নো। দেহদানের বিনিময়ে টাকা দাবি করে বসল। টেকনিক্যালি যাকে ব্যাকমেইল বলে আর কি!’

‘কত টাকা?’

‘চার মিলিয়ন লিরা।’

‘কি করলেন আপনি?’

‘মেয়েটাকে অনেক করে বোঝালাম যে অত টাকা আমার নেই। কিন্তু শুনল না কিছুতেই। খেপে গেল। চেষ্টায়ে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে বসল। বারবার আমাকে হুমকি দিতে লাগল, যদি টাকা না দিই তো বাপকে বলে আমার বারটা বাজাবে। ওর বাবাকে চিনি আমি। জানি, দেশ-বিদেশের পত্রিকা জগতে কি প্রচণ্ড প্রভাব ভদ্রলোকের। সেনর শেরম্যানের একটা টেলিফোনেই আমার এত বছরের চাকরিটা চলে যেতে পারত। তাই আর ঘাঁটাতে সাহস পেলাম না। দ্যাট’স হোয়াই...।’

‘দিয়ে দিলেন টাকা?’

‘আসলেই অত টাকা ছিল না আমার। নিজের যা ছিল, তার সাথে ধারদেনা করে আরও কিছু মিলিয়ে ছেষটি হাজার লিরা দামের একজোড়া ইয়ার রিঙ কিনে দিয়েছিলাম সোফিয়াকে। যদিও জানতাম আমাকে ব্রাফ দিচ্ছে ও, বাপকে আসলে কিছু জানাবে না। ভয় দেখাচ্ছে। তবু কোন ঝুঁকি নিতে সাহস হয়নি আমার।’

‘তারপর?’ মনে পড়ল রানার, সোফিয়ার জুয়েলারির বাস্ত্রে একজোড়া ইয়ার রিঙ সত্যিই আছে।

‘আমার আগে আরও এক সাংবাদিক ওর ব্যাকমেইলিঙের শিকার হয়েছিল, পরে শুনেছি আমি একথা। লোকটা আমেরিকান। তবে তার পরিচয় বলা নিষেধ আছে, নেভার মাইও। প্রায় দুই মিলিয়ন লিরা দামের একটা ডায়মণ্ড কলার কিনে দিয়ে তবে রক্ষা পেয়েছে বেচারী। পরে আর কাউকে শিকার করেছে কি না সোফিয়া, জানি না।’

এটাও আছে বাক্সে । কিন্তু সেকথা ভাবছে না রানা । ভাবছে অন্য কথা । মনটির এই কাহিনী যদি লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজির কানে যায়, এবং যদি সে জানতে পারে যে ও-ই সেই রহস্যময় রবার্ট হুইটনি, তাহলে আর কষ্ট করে রানার সোফিয়া-হত্যার মোটিভ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তাকে । এইটাই মোটিভ । একেবারে সহজ সিদ্ধান্ত । রানার কাছে টাকা দাবি করেছে সোফিয়া । রানা তা দেয়নি বা দিতে পারেনি । এবং ওদের নিভৃতবাসের খবর সোফিয়া যাতে শেরম্যানকে জানাতে না পারে, সেই জন্যে ধাক্কা দিয়ে মেয়েটিকে ফেলে দিয়েছে ও ক্লিফহেড থেকে ।

ওর মুখ বন্ধ করতে হবে । ভাবল রানা, অন্তত আরও কয়েকটা দিন যেন চুপ থাকে কার্লো মনটি ।

‘এই জন্যেই আমি শিওর যে সোফিয়াকে হত্যা করা হয়েছে,’ বলল মনটি । ‘ও একা সরেনটো গিয়েছিল বলে মনে হয় না আমার । নিশ্চয়ই আর কেউ ছিল সঙ্গে । তাকে খুঁজে পাওয়া গেলেই সব জানা যাবে ।’

উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা । বক্তব্য শেষ করতে বলছে ।

‘পত্রিকায় মেয়েটির মৃত্যুর খবর পাবার পর নিজেকে পুলিশের সামনে হাজির করার চেষ্টা করেছি অনেক, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি । কে জানে, হয়ত আমাকেই ধরে বসবে ওরা । ভাববে ব্যাকমেইলিঙের প্রতিশোধ নিয়েছি আমি ওকে হত্যা করে ।’

‘ঠিক,’ মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা । ‘না গিয়ে ঠিকই করেছেন । পুলিশ জানলে শেরম্যানও অবশ্যই জানবেন ব্যাপারটা । সেক্ষেত্রে নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন আপনি ।’

‘এ নিয়ে ঘনিষ্ঠ কারও সাথে খোলাখুলি আলোচনা করার জন্যে খুব ছটফট করছিল মনটা। তাই আজ গিয়েছিলাম আমাদের অফিসে। ও বলল পুলিশের সামনে কিছু বলার আগে আপনাকে সব জানাতে।’

‘আমার মনে হয়,’ বলল রানা। ‘আপাতত পুলিশকে কিছু জানানো ঠিক হবে না আপনার। বরং অপেক্ষা করুন। ওদের অগ্রগতি দেখুন।’

‘কিন্তু, মনে করুন, ওরা যদি কখনও আমাদের অ্যাফেয়ারের কথা জেনে যায়?’

‘তাতে কি?’

‘না, মানে, যে ভয়টা করছি, আমাকেই যদি খুনি ভেবে বসে, তখন?’

‘আগে বলুন। শনিবার, মানে যেদিন মারা গেল সোফিয়া, সেদিন কোথায় ছিলেন আপনি।’

‘এখানেই। রোমে।’

‘প্রমাণ করতে পারবেন?’

‘অফকোর্স।’

‘তাহলে চিন্তার কিছু নেই। আপনার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না পুলিশ।’

খানিক ভাবল কার্লো মনটি। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। ‘ঠিকই বলেছেন। সন্দেহ করলেও কিছু প্রমাণ করতে পারবে না ওরা।’

‘ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান ভাবছেন কেউ তাঁর মেয়েকে হত্যা করেছে। এখন যদি এসব জানাতে যান আপনি, চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবেন ভদ্রলোক। মেয়ের শোকে এমনিতেই উন্মাদ হয়ে

আছেন, কি থেকে কি ঘটে যায় ঠিক নেই। এ মুহূর্তে কেসটা ডীল করছি আমি, প্রাইভেটলি। খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি কে হত্যা করতে পারে তাকে। মিস্টার শেরম্যান এ দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, সেই আমেরিকান সাংবাদিক কি করেছে এ কাজ?’

‘নোপ!’ দ্রুত মাথা দোলাল কার্লো মনটি। ‘সে রাতে একটা পার্টিতে ছিলাম আমি সেই লোক এবং আরও অনেক রিপোর্টার। হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে।’

‘আই সী। আর কে হতে পারে, কোন আইডিয়া?’

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কার্লো। ‘নাহ্!’

‘এক লোকের সাথে সোফিয়ার পরিচয় ছিল, যার প্রথম নাম সনি। চেনেন নাকি তাকে?’

‘আই ডোন্ট থিন্ক সো।’

‘আর কারও সাথে দেখেছেন কখনও সোফিয়াকে?’

গাল চুলকাতে লাগল মনটি। আড়চোখে তাকাল টনি আমান্দোর দিকে। ‘হ্যাঁ। দেখেছি,’ যেন কথাটা বলে মহা অন্যায় করে ফেলেছে, এমন একটা মুখভঙ্গি করল সে।

‘কার সাথে?’

চোখ নামিয়ে নিল কলামিস্ট। ‘আপনার সাথে। প্যারাডাইস থেকে বেরোচ্ছিলেন আপনারা মুভি দেখে।’

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। তারপর বলল, ‘মিস্টার শেরম্যান আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন সোফিয়াকে সঙ্গ দিই আমি। সে জন্যে দুতিনবার একসাথে বেরিয়েছিলাম আমরা। সে যাক, আমি ছাড়া আর কারও সাথে দেখেননি?’

‘হ্যাঁ। একবার লুইগি রেস্টোরাঁয় দেখেছিলাম আরেকজনের সাথে। লোকটা ছিল পালোয়ানের মত। যেমন লম্বা, তেমনি তার স্বাস্থ্য।’

কপাল কুঁচকে গেল রানার। ‘আরেকটু ডিটেল বর্ণনা দিন লোকটার, প্লীজ।’

‘লোকটা ইটালিয়ান, আমি শিওর। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর হবে বয়স। গায়ের রঙ চাপা। বুকের ছাতি বিশাল। নিয়মিত ব্যায়াম করে মনে হয়। চেহারাটাও বেশ ভালই, তবে খুব নিষ্ঠুর লাগে দেখতে। আর...ডান গালে একটা কাটা দাগ আছে। সাদা, আঁকাবাঁকা দাগ।’

‘লোকটা কে হতে পারে কোন ধারণা দিতে পারেন?’

‘না, সরি। তবে ও চেহারা একবার দেখলে জীবনেও ভুলতে পারবেন না, আমি শিওর।’

‘হুম!’ টনির দিকে তাকাল রানা।

‘ও, হ্যাঁ,’ তাড়াতাড়ি বলে উঠল মনটি। ‘লোকটার ডান কানে ছোট্ট একটা সোনার রিঙ দেখেছি।’

‘অল রাইট, অ্যাণ্ড থ্যাঙ্কস। আপাতত কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আগে এই পালোয়ানকে খুঁজে বের করি। বলা যায় না এ-ই হয়ত সেই লোক যাকে আমি খুঁজছি। খুব সম্ভব এই লোকই জড়িত আছে সোফিয়ার মৃত্যুর সাথে, বলা যায় না। যাক দুয়েকদিন। চিন্তা নেই। টনি আমান্দোর মাধ্যমে খবর দেব আমি আপনাকে।’

নার্ডাস এক টুকরো হাসি ফুটল মনটির মুখে। ‘ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন...।’ পাশে তাকাল সে, টনিকে বলল, ‘আমি তিফু অবকাশ-২

এবার উঠব ।’

‘আমিও যাব ।’

ওরা বেরিয়ে যেতে আগের জায়গায় এসে বসল মাসুদ রানা ।
অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল, সনির সাথে সত্যিই
পরিচয় ছিল সোফিয়ার । তার মানে সম্ভবত সেই মেয়েটিও
সোফিয়ার পরিচিত—রেনন্টের আজকের ড্রাইভার । সেই একই
মেয়ে তো, যার গলা শোনা গিয়েছিল সেদিন টেলিফোনে?

যেভাবে হোক, ভাবল রানা, আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই
খুঁজে বের করতে হবে সনিকে ।

রিসিভারটা কানের কাছে চেপে ধরল মাসুদ রানা । ‘একটা
মেয়ের?’

‘হ্যাঁ, রানা,’ ও প্রান্ত থেকে বলল মোনিকা আলবিনো । ‘এর
নাম্বার কোথায় পেলে তুমি?’

‘নেভার মাইও । অ্যাও ডোন্ট বি জেলাস । নামটা বল তার ।’

‘সারা গ্র্যানডি ।’

‘অনেক ধন্যবাদ,’ বলল রানা । সামনে রাখা একটা নোটপ্যাডে
লিখতে লাগল নামটা । ‘সারা গ্র্যানডি? জি আর এ এন ডি আই,
এই তো?’

‘হ্যাঁ ।’

‘ঠিকানা?’

‘ডিল্লি প্যালেস্ট্রা । ভেইল পাওলো । ভেরোনেস ।’

কি নাম যেন বলছিল টনি আলবার্তো ফেলিনির সম্ভাব্য
হত্যাকারীর? ইটোলা গ্র্যানডি না? সারা গ্র্যানডির সঙ্গে কোন

সম্পর্ক আছে নাকি তার? কে এই সারা—ইটোলার স্ত্রী, বোন, নাকি মেয়ে?

সচকিত হল রানা, কি যেন বলছে মোনিকা। আওয়াজটা কানের পর্দায় ড্রাম বাজাচ্ছে যেন। কিন্তু কথা বলার কোন গরজ দেখা গেল না রানার মধ্যে, রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও দড়াম করে। মুহূর্তে ডুবে গেল গভীর চিন্তায়।

সূত্র বোধহয় পাওয়া গেল এবার। ঠিক তাই। টনি আমান্দোর কথাই ঠিক, সত্যিই ফেলিনিকে হত্যা করার ব্যাপারে গ্র্যানডিকে সহায়তা করেছিল সোফিয়া। এবং সম্ভবত ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে পড়াশুনার কথা বলে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

সারা গ্র্যানডি যখন রোমে রয়েছে, সেক্ষেত্রে আশা করা যায় ইটোলা গ্র্যানডিও আছে এদেশেই।

আর সত্যিই যদি আলবার্তো ফেলিনির হত্যাকারী হয়ে থাকে এই লোক...।

উঠে দাঁড়াল রানা। উত্তেজিত হয়ে উঠছে ভেতরে ভেতরে। সম্ভবত পাওয়া গেছে সোফিয়ার হত্যাকারীকে। হয়ত ভিলা প্যালেস্ট্রাতেই পাওয়া যাবে তাকে।

আজই যেতে হবে ওখানে। দেরি করাটা ঠিক হবে না।

তিন

ঘড়ি দেখল রানা। সাতটা বাজে। সঙ্গে হতে এখনও অনেক দেরি। দুপুরের পর থেকে কমতে শুরু করে বৃষ্টি। একটু আগে থেমে গছে পুরোপুরি। কিন্তু মেঘের আনাগোনার কমতি নেই। আবার নামবে যে-কোন মুহূর্তে। ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের কথা ভাবল রানা। নিশ্চয়ই ওর টেলিফোনের অপেক্ষায় আছেন তিনি। অস্থির হয়ে পড়েছেন তদন্তের অগ্রগতি জানার জন্যে।

ভেবেচিন্তে আই. আই. এ.-কে, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সিকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। রোমে এদের নামডাক আছে। কাজও করে ভালই। বিশেষ করে, এদের সাথে রানা এজেন্সির তেমন একটা যোগাযোগ নেই। ভরসা আছে, রানাকে চিনতে পারবে না আই. আই. এ.।

অপারেটরের কাছ থেকে আই. আই. এ.-র নাম্বার জেনে নিয়ে ফোন করল রানা। একটু পরই খসখসে একটা গলা শোনা গেল। 'ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি। কে বলছেন, সেনর?'

অল্প কথায় নিজের প্রয়োজনের কথা খুলে বলল রানা। সেই সঙ্গে স্বরণ করিয়ে দিল, কাজটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গোপনীয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংস্থার শ্রেষ্ঠ অপারেটরকে এ

কাজে নিয়োগ করতে হবে।

‘সি, সেনর,’ রানার ঠিকানা লিখে নিয়ে লোকটা বলল, ‘আধঘন্টার মধ্যে সেনর গুইসেপ ম্যালেট্রি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।’

‘থ্যাঙ্কস,’ লাইন কেটে দিয়ে আরেকটা নাম্বারে রিঙ করল রানা। এটা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের রোম প্রতিনিধি হেনরি কোলম্যানের নাম্বার। পাঁচ বছর আগে এখানে বদলি হয়ে এসেছে লোকটা নিউ ইয়র্ক থেকে। সেখানেই রানার সঙ্গে পরিচয় কোলম্যানের।

সেবার মার্কিন নেভির একটা টপ সিক্রেট প্ল্যান আগেভাগে ফাঁস করে দিয়েছিল সে পত্রিকায়। সি. আই. এ.-র সহযোগিতায় লেবাননে বড় ধরনের একটা অন্তর্ঘাতমূলক কাজের পরিকল্পনা নিয়েছিল ইউ. এস. নেভি, যাতে হাজার হাজার নিরীহ ফিলিস্তিনি এবং লেবাননীর মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা ছিল। খবরটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনাটা বাতিল করে দিতে বাধ্য হয় ইউ. এস. নেভি। খেপে ওঠে কোলম্যানের ওপর।

এর ক’দিন পর সাজানো এক নারীঘটিত মামলায় প্রায় জড়িয়েই ফেলেছিল ওরা তাকে। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সহায়তায় কোনরকমে কোলম্যানকে উদ্ধার করে সেবার মাসুদ রানা। নইলে শেষ হয়ে যেত কোলম্যান। ধর্ষণ মামলায় কম করেও ষাট বছর জেল হত তার।

সাংবাদিকদের মধ্যে একটা শ্রেণী আছে, যারা মানুষের হাঁড়ির খবর পর্যন্ত রাখে। কোলম্যান সেই ধরনের সাংবাদিক। ওর কাছে সনি, ইটোলা গ্র্যানডি সম্পর্কে আরও কোন নতুন তথ্য পাওয়া তিক্ত অবকাশ-২

যেতে পারে, এই আশায় ফোন করেছে ও।

প্রায় দুসপ্তাহ ধরে রানা রোমে আছে, সময়ের অভাবে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি শুনে রাগে তোতলাতে শুরু করল কোলম্যান। অবশ্য প্রায় সাথে সাথেই সেরে গেল তোতলামি রানার রিজার্ভ স্টকের গোটাচারেক জঘন্যতম গাল শুনে।

‘কি রে?’ খতমত খেয়ে গেল কোলম্যান। ‘দোষ করে আবার উল্টে রাগ দেখাচ্ছিস যে?’

হাসল রানা। ‘না, দোস্ত। রাগিনি। কারও রাগ থামানোর দরকার হলে এই টেকনিকটা ব্যবহার করি আমি। নিজস্ব টেকনিক। কাজ দেয় চমৎকার। তোর নিজেকে দিয়েই দ্যাখ, কেমন থামিয়ে দিলাম।’

হো হো করে গলা ছেড়ে হেসে উঠল কোলম্যান। ‘শালা বিটকেল! স্বভাব একটুও পাল্টায়নি তোর!’

‘চোপ, শালা কোলাব্যাঙ! আগে কাজের কথা শোন।’

‘ঠিক আছে, বল।’

‘ফ্রি হচ্ছিস কখন?’

‘তোর জন্যে সব সময়-ই ফ্রি আমি।’

‘ওড। ঠিক সাড়ে আটটায় হ্যারি’স বারে থাকিস। ডিনার করব একসাথে। জরুরি কিছু আলাপ আছে।’

‘নো অসুবিধে। থাকব।’

রিসিভার রেখে সিগারেট ধরাল রানা। এই সময় বেজে উঠল বেল। উঠে এসে দরজা খুলে দিল ও। মাঝারি উচ্চতার এক ইটালিয়ান দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়, ডোরম্যাটের ওপর। লোকটা মোটা, বয়স চল্লিশের কিছু বেশি-ই হবে হয়ত।

এখানে ওখানে সুতো বেরিয়ে থাকা পুরানো ধূসর রঙের স্যুট পরে আছে লোকটা। মাথায় তেমনি মলিন একটা ভেলোর হ্যাট। আজ নিশ্চয়ই শেভ করেনি লোকটা, সারা গালে গিজ গিজ করছে কাঁচাপাকা দাড়ি। ডান চোখের নিচে খানিকটা জায়গা ফুলে আছে ফোঙ্কার মত। সাথে করে রসুনের দুর্গন্ধ নিয়ে এসেছে লোকটা, বিষিয়ে তুলেছে বাতাস।

ওর চোখে চোখ রেখে বলল লোকটা, 'ইল সেনর মাসুদ রানা?'

'ইয়েস।'

'ওইসেপ ম্যালেট্রি, ফ্রম আই. আই. এ।'

ম্যালেট্রির হ্যাণ্ডশেকের জন্যে বাড়ানো ডান হাতটা দেখেও না দেখার ভান করল রানা। পিছিয়ে গেল এক পা। 'কাম ইন।'

ভেতরে ঢুকল ম্যালেট্রি। রানার ইশারায় বসল সোফায়। হ্যাটটা নামিয়ে সেন্টার টেবিলের ওপর রাখল সে, হাত বোলাতে লাগল চকচকে টাকে। পিছিয়ে গিয়ে খোলা একটা জানালার উইণ্ডোসিলে নিতম্বের ভর চাপিয়ে বসল রানা। মুক্ত বাতাসের দরকার হয়ে পড়েছে, এইটুকু সময়ের মধ্যেই ঘরের বারটা বাজিয়ে দিয়েছে গারলিক ম্যালেট্রি।

সরাসরি কাজের কথা পাড়ল মাসুদ রানা। 'আমার কিছু ইনফরমেশন চাই। খরচের ব্যাপারে পরোয়া নেই। তবে তাড়াতাড়ি কাজ চাই আমি।'

হাসি ফুটল ম্যালেট্রির মুখে। কয়েকটা সোনা বাঁধানো দাঁত চিক চিক করে উঠল। কিন্তু রানার মনে হল, আচমকা হয়ত তলপেটে কামড়ানি শুরু হয়ে গেছে তার।

‘ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখতে হবে,’ বলে চলেছে রানা। ‘এই একই ব্যাপারে পুলিশও তদন্ত করছে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ওদের লেজে পা না পড়ে। তাহলে আপনারা তো বটেই, আমিও ঝামেলায় পড়ব।’

ম্যালেট্রির তথাকথিত হাসিটা মিলিয়ে গেল। চোখের পাতা সরু হয়ে এল। ‘আমরা পুলিশের বন্ধু। তবুও এমন কিছু আমরা করব না যাতে ওরা বিরক্ত হয়। এবং মক্কেলের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কিছুই করি না আমরা, সেনর। এবং গোপনীয়তা রক্ষার প্রশ্নে এদেশে আমরাই সবচেয়ে সিরিয়াস।’

‘আমিও তাই চাই।’ শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল রানা।

কোটের পকেট থেকে একটা ছোট নোটবুক এবং কাটা পড়তে পড়তে তিন ইঞ্চিতে এসে ঠেকা একটা কাঠ পেন্সিল বের করল ম্যালেট্রি। ‘কাজটা কি, সেনর?’

‘আমেরিকান একটি মেয়ে, রোমে তার গত বারদিন অবস্থানের বিস্তারিত রিপোর্ট চাই আমি। বিশেষ করে আপনাদের তার বয়স্কেওদের ব্যাপারে জানতে হবে। তাদের নাম, পরিচয় ইত্যাদি। মেয়েটির নাম সোফিয়া শেরম্যান। তার কয়েকটা ছবি দেব আমি আপনাকে। গত সাতাশ তারিখে একসেলশিয়র হোটেলে উঠেছিল সোফিয়া, একা। একদিনই মাত্র ছিল। পরদিন ভায়া ক্যাভোরের একটা বাংলোয় উঠে যায়। কম করেও পাঁচ-ছয়জন পুরুষ সঙ্গী ছিল মেয়েটির। আমি কি চাইছি, আশা করি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না আপনার?’

‘মোটাই না, সেনর,’ নোটবই থেকে মুখ তুলল প্রাইভেট

গোয়েন্দা। ‘লা সেনরিনা সোফিয়া সরেনটোয় এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, আই বিলীভ, সেনর? আমেরিকান এক নিউজপেপার ওউনার, ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের মেয়ে তিনি। তাই না?’

ব্যাটা কেবল রসুন-ই খায় না, খবর-টবরও রাখে বোঝা যাচ্ছে। ‘হ্যাঁ,’ বলল ও।

আবার সোনা বাঁধানো দাঁত দেখা গেল ম্যালেটির। এই কেসে পয়সার কথা ভাবতে হবে না বুঝতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। নোটবইটা বন্ধ করে পকেটে পুরলো। ‘আমি ইমিডিয়েটলি কাজ শুরু করছি, সেনর।’

‘এটা গেল প্রথম কাজ। আরও একটা কাজ আছে। একটা নীল রেনল্ট সম্পর্কেও জানতে চাই আমি। গাড়িটা কার জানতে হবে। এই নিন, গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার,’ এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল রানা। ‘পুলিসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, ওরা বলে এই নাম্বারে নাকি কোন গাড়ি নেই। কিন্তু আমি জানি আছে। আজও ওটাকে দেখেছি আমি। গাড়িটার দেখা পেলে শুধু অনুসরণ করবেন, আর চালককে চিনে রাখার চেষ্টা করবেন। দ্যাট’স অল ফর ইউ।’

‘লা সিনরিনার মৃত্যুটা সম্ভবত দুর্ঘটনাজনিত নয়, তাই না, সেনর?’

‘জানি না। তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তথ্যগুলো তাড়াতাড়ি জানার চেষ্টা করুন,’ উঠে দাঁড়াল রানা। ‘কোন তথ্য পেলে সাথে সাথে ফোন করবেন। লিখিত রিপোর্টের দরকার নেই।’ পকেট থেকে চেক বই বের করল রানা। ‘কত অ্যাডভান্স করতে হবে?’

তিক্ত অবকাশ-২

‘ইউজ্যুয়ালি সতের হাজার লিরা নিই আমরা ।’

‘আই. আই. এ.-র নামে ক্রসড চেক দিলে চলবে?’

‘সি ।’

বিশ হাজার লিয়ার অঙ্ক লিখে চেকের পাতাটা ফড়াং করে ছিঁড়ে বাড়িয়ে ধরল ও টেকোর দিকে । ‘টেক ইট, অ্যাণ্ড স্টার্ট ইওর জব ।’

‘শিওর ।’ অঙ্কটার ওপর চোখ বুলিয়ে আরেকবার সোনা দেখাল ম্যাগলেডি । টাকে হাত বুলিয়ে হ্যাট মাথায় চাপাল । তারপর কোটটা টানতে টানতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে ।

রানা বেরোল সোয়া আটটায় । প্রচুর গুঁড়ো বরফ মেশানো স্কচ পান করছিল কোলম্যান । রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে উঠে দাঁড়াল । কুশল বিনিময়ের পর বসল ওরা । খুব একটা কথাবার্তা বলল না রানা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত । ওকে গভীর আর চিন্তিত দেখে কোলম্যানও ঘাঁটাল না । ওর মুখ খোলার অপেক্ষায় থাকল ।

একসময় অধৈর্য হয়ে উঠল সে । বলব না বলব না করে বলেই বসল, ‘কি রে, কিছু বলছিস না যে?’

‘সারা গ্র্যান্ডি কে, জানিস?’

প্রতিক্রিয়াটা হল তাৎক্ষণিক । চোখেমুখে গভীর আগ্রহ ফুটে উঠল কোলম্যানের । ‘জানি । কেন?’ বলল সে ।

‘কে মেয়েটি?’ প্রশ্নটা না শোনার ভান করল রানা ।

‘ইটোলা গ্র্যান্ডির মেয়ে । বাপ কুখ্যাত এক ইটালিয়ান গুণ্ডা । নিউ ইয়র্কে থাকত ।’

‘এখন কোথায় আছে লোকটা?’

‘আছে এ দেশেই কোথাও। আত্মগোপন করেছে পুলিশের ভয়ে। তবে কেউ সঠিক জানে না কোথায় আছে। সম্ভবত পুলিশও জানে না। কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্ক থেকে পালিয়ে এসেছে। শুনেছি, মোটরবোটে প্রথমে নেপলস আসে ইটোলা। ওখানকার ভিসুভিয়াস হোটেলে ছিল একদিন। তারপর থেকে হাওয়া। কোন খবর নেই লোকটার। তবে এটুকু জানি, এখনও এদেশেই আছে সে।’

‘সারাও জানে না কোথায় আছে?’

‘হয়ত জানে। কিন্তু বলে না। আমি নিজে ওর ইন্টারভিউ নিয়েছি। প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ রোমে আছে সারা। আগে থাকত নিউ ইয়র্কে, বাপের সাথে।’

‘চলে এল কেন?’

‘বলে পড়াশুনা শেষ, তাই চলে এসেছে।’

‘তাই?’

‘বাপের সাথে নাকি অনেকদিন যোগাযোগ নেই। সে কোথায় আছে জানে না।’

ইশারায় একজন ওয়েটসকে ডেকে ব্র্যাণ্ডির অর্ডার দিল রানা। ‘ইটোলা গ্র্যান্ডি সম্পর্কে কি কি জানিস, সব বল আমাকে।’

একটু বিস্মিত মনে হল কোলম্যানকে। ‘বলিস কি! আমি তো জানতাম তুই সবই জানিস ওর ব্যাপারে।’

মাথা দোলাল রানা, জানে না।

‘হতে পারে। তবে তোর নিউ ইয়র্ক ব্রাঞ্চের ছেলেরা জানে সব।’

‘কি জানি, জিজ্ঞেস করিনি কখনও। তুই বল।’

তিস্তা অবকাশ-২

‘নিউ ইয়র্ক বেকারস’ অ্যাণ্ড ওয়েটারস’ ইউনিয়নের প্রধান ছিল ইটোলা গ্র্যানডি। লোকটা যেমন টাফ তেমনি বিপজ্জনক। ওই ইউনিয়নের ডিপুটি চীফ ছিল আরেক ইটালিয়ান গুণ্ডা, আলবার্তো ফেলিনি। গত কয়েক বছর ধরে ফেলিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছে ইলেকশনে গ্র্যানডিকে হারিয়ে তার পদটা দখল করবে। কিন্তু পারেনি। শেষে কায়দা করে গ্র্যানডির বাংলায় হেরোয়িনের বড় একটা প্যাকেট প্ল্যান্ট করে ফেলিনি এবং টেলিফোনে খবরটা জানিয়ে দেয় নারকোটিক ডিপার্টমেন্টকে। সাথে সাথে রেড করে তারা গ্র্যানডির বাংলায়।

‘ইনফরমেশন অনুযায়ী জায়গামতই পাওয়া যায় প্যাকেটটা। ইটোলা গ্র্যানডিকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ। কিন্তু কেসটা ছিল আসলে কাঁচা। ফেলিনি যদি আরও একটু মাথা ঘামিয়ে প্ল্যান্টা করত, তাহলে হয়ত উদ্দেশ্য হাসিল হত তার। প্রায় অনায়াসেই গ্র্যানডি জিতে গেল কেসে। ছাড়াও পেল। কিন্তু এই সুযোগটা নিল প্রেস। বিপজ্জনক ইটোলা গ্র্যানডিকে হাড়ে হাড়ে চেনে তারা। নিউ ইয়র্কের সবগুলো পত্রিকা তখন খেয়ে না খেয়ে তার পিছনে লাগল, এমন সব মন্তব্য করতে লাগল গ্র্যানডির বিরুদ্ধে যে ঘাবড়ে গেল প্রশাসন। জনমতের ভয়ে সরকার বাধ্য হল গ্র্যানডিকে অবাস্তিত ঘোষণা করতে।’

কাঁধ ঝাঁকাল কোলম্যান। ‘জন্মগত ভাবে ইটালীর নাগরিক লোকটা। এদেশে চলে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভেবে নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করে সে। কিন্তু গ্র্যানডির নেপলস উপস্থিতির খবর পাওয়ার সাথে সাথে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ, তাকে অ্যারেস্ট করার ছুতো খুঁজতে শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ওদের চাইতে

অনেক বেশি তৎপর ছিল লোকটা। বিপদ হওয়ার আগেই গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়।’

‘শুনেছি ও-ই নাকি খুন করিয়েছে ফেলিনিকে। সত্যি নাকি?’

‘মোর অর লেস, সত্যি।’

ব্র্যাণ্ডি দিয়ে গেল ওয়েস্টেস। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে যার যার গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিল রানা ও কোলম্যান।

‘নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করার আগে ফেলিনিকে হুমকি দিয়েছিল গ্র্যান্ডি। বলেছিল, প্রতিশোধ নেবে এর। এ-কাজ যে ও-ই করিয়েছে, আমার অন্তত তাতে কোন সন্দেহ নেই,’ বলল কোলম্যান।

‘কি করে ঘটল ব্যাপারটা? গ্র্যান্ডির হুমকি সিরিয়াসলি নেয়নি নাকি ফেলিনি?’

‘অবশ্যই নিয়েছিল। এক দঙ্গল সশস্ত্র বডিগার্ড ছাড়া এক পা-ও নড়ত না আলবার্তো ফেলিনি। কিন্তু গ্র্যান্ডি ওস্তাদ লোক, যে চাল চলেছিল...।’

এরপর যা বলল কোলম্যান, তা টনি আমান্দোর কাছে শোনা কাহিনীর সাথে মিলে গেল হুবহু। সেই সাথে যোগ করল, ‘পরদিন সকালে মৃত পাওয়া যায় ফেলিনিকে। অ্যাপার্টমেন্টের মেইনডোর খোলা ছিল।’

‘আর ওর বান্ধবী?’

‘মিলিয়ে গিয়েছিল হাওয়ায়। কেউ কিছু বলতে পারেনি মেয়েটির ব্যাপারে। তবে একটা বিষয়ে সবাই নিশ্চিত ছিল। তা হল, সে-ই ভেতর থেকে দরজা খুলে দিয়েছিল হত্যাকারীর জন্যে। কারণ দরজা অক্ষতই ছিল, বাইরে থেকে জোর করে খোলা হয়েছে

এমন কোন আলামত পাওয়া যায়নি।’

এটুকুও মিলে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত ভাবল রানা। তারপর বলল, ‘মেয়েটির পরিচয় সম্পর্কে জানিস কিছু?’

হাসল কোলম্যান। ‘জানি বৈকি! নিউ ইয়র্ক ভিশনের মালিক ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের মেয়ে ছিল ওটা, সোফিয়া শেরম্যান। বিশ্ব বখাটে। কিন্তু,’ অসহায় ভঙ্গি করল সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে। ‘প্রমাণ করতে পারব না।’

‘আই সী!’ আনমনে গ্লাসে চুমুক দিল রানা।

‘ব্যাপার কি, রানা? এসব পুরানো কাসুন্দি কেন ঘাঁটছিস তুই?’

‘সনি নামে কোন ইটালিয়ানকে চিনিস? এ-ও বেআইনী জগতের মানুষ। বিশালদেহী ষাঁড়ের মত। গালে আঁকাবাঁকা কাটা দাগ আছে।’

ঠোট ছুঁচোলো করে খানিক ভাবল কোলম্যান। তারপর মাথা দোলাল। ‘নাহ্! সরি।’

চার

মনটা তেতো হয়ে গেল মাসুদ রানার। প্রয়োজনের সময় এসব কথা শেরম্যানকে কি করে বলবে ও? প্যামেলা তাহলে ঠিকই

বলেছিল দেখা যাচ্ছে। এসব নোংরা কাহিনী শুনলে কি অবস্থা হবে মানুষটির? কিন্তু না বলেই কি থাকতে পারবে ও? আজ হোক, কাল হোক জানাতে তো হবেই।

বাংলোর গেট খোলা দেখে একটু অবাক হল রানা। কে খুলল গেটটা? গাড়ি নিয়ে পোর্চে এসে থামল ও। পোর্চের মৃদু আলোয় বারান্দায় খাটোমত একটা ছায়ামূর্তির ওপর চোখ পড়ল রানার। চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না। কে ও? ভাবতে ভাবতে নেমে এল ও গাড়ি থেকে।

এবার সামনে এগিয়ে এল লোকটা। সিঁড়ি বেয়ে দু'ধাপ নামতেই আলো পড়ল তার মুখের ওপর। লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি! দুটো হার্টবিট মিস হল রানার। একচুল নড়ছে না লোকটা। কোমরে হাত রেখে স্থির চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে। চাউনিটা যেন কেমন কেমন।

‘হ্যালো, লেফটেন্যান্ট,’ হাসির ভঙ্গি করল রানা। ‘আপনাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখিনি তো?’

‘এইমাত্র এসেছি আমি,’ গম্ভীর সুরে, একঘেয়ে গলায় বলল ফ্রেনজি। ঠোট কাঁপল না একটুও। ‘জরুরি কিছু কথা আছে আপনার সাথে।’

‘শিওর,’ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। সুইচ টিপে জ্বলে দিল আলো। ‘আসুন, ভেতরে আসুন।’

ডোরম্যাটে পা ডলে ঘরে ঢুকল ফ্রেনজি। তার আগে চকিতে একবার নজর বুলিয়ে নিল দরজটার ওপর। পাল্টে ফেলা হয়েছে ভাঙা তালাটা।

‘বসুন।’

‘থ্যাঙ্কস,’ বসল গোয়েন্দা। শিরদাঁড়া খাড়া। চাউনি তেমনি অচঞ্চল, সরাসরি চেয়ে আছে ওর দিকে।

‘আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, লেফটেন্যান্ট?’ রানাও বসল। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। বুঝতে পেরেছে, ভেতরে ভেতরে ঘটে গেছে কিছু একটা। কি সেটা? রবার্ট হুইটনির সঙ্গে মাসুদ রানাকে মিলিয়ে ফেলেছে নাকি?

‘আপনাকে প্রথমে একটা জরুরি খবর দিয়ে নিই, সেনর মাসুদ রানা। করোনার ইল সেনর ক্যানডালো তাঁর মৃত পাল্টেছেন। লা সেনরিনার মৃত্যুটাকে এখন আর দুর্ঘটনা ভাবতে রাজি নন তিনি। অবশ্য এজন্যে দুঃখও প্রকাশ করেছেন তিনি। ব্যাপারটা যদি আপনার বসকে জানিয়ে দেন, ভাল হয়।’

‘অবশ্যই জানিয়ে দেব,’ বলার সময় রানার চেহারায় কোন ভাবের রেখা ফুটল না।

‘আর আমরা, এখানে আমি, সরেনটোয় লেফটেন্যান্ট গুইডো, দু’জনে ফুল স্কেল ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দিয়েছি হত্যাকারীকে সনাক্ত করার ব্যাপারে। এরই মধ্যে সেই রহস্যময় রবার্ট হুইটনিকেও ট্রেস করতে পেরেছি আমরা, খুব সম্ভব।’

গলা শুকিয়ে উঠতে লাগল রানার। ‘রিয়েলি?’

‘উই থিঙ্ক সো।’

‘তাহলে ধরছেন না কেন এখনও?’

সামান্য হাসি ফুটল এবার বেঁটে গোয়েন্দার মুখে। ‘ধরব। আর একটু শিওর হওয়া বাকি আছে। পরশু সরেনটোয় আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের আয়োজন করা হয়েছে। ওটা হয়ে গেলেই...।’ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকল সে।

‘কোথায় আছে লোকটা?’ নিজের কানেই কৰ্কশ লাগল কথাগুলো।

‘এখানেই। রোমে।’

‘যদি পালিয়ে...’ থেমে গেল রানা লেফটেন্যান্টকে এপাশ ওপাশ মাথা দোলাতে দেখে।

‘পারবে না,’ আস্থার সঙ্গে বলল সে। ‘পুলিস চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখছে তার ওপর।’

‘আপনাদের নতুন তদন্ত শুরু করার আগে মিস্টার শেরম্যানকে জ্ঞানিয়ে নিলে ভাল হতো না?’

‘তার কোন দরকার দেখি না, সেনর। আমরা আমাদের কাজ করছি। তাঁকে জানাবেন কি না, সেটা আপনার ব্যাপার।’

লোকটিকে খুবই আস্থাশীল মনে হচ্ছে ওর এ-মুহূর্তে। অথচ দু’দিন আগেও ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের ভয়ে একে কেঁচো হয়ে যেতে দেখেছে সে। ব্যাপারটা কি? সাথে সাথেই উত্তরটা পেয়ে গেল রানা। এটা অন্য কোন ব্যাপার হলে শেরম্যানের দাবি অগ্রাহ্য করতে সাহস পেত না এরা। এখন পারছে। ‘কারণ সোফিয়ার নোংরামী জেনে গেছে পুলিস।

এর সাথে জড়িয়ে আছে শেরম্যানের মান-ইজ্জতের প্রশ্ন। কাজেই বেশি বাড়াবাড়ি করতে পারবেন না ভদ্রলোক, তা ওরা ভালই বোঝে। সব ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে উল্টে নিজেই চূপ হয়ে যাবেন।

‘লা সেনরিনার বেশ কয়েকজন পুরুষ বন্ধুর খোঁজ পেয়েছি আমি,’ আবার বলল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। ‘এ সব ব্যাপারে কোন বাহ্য বিচার ছিল না তাঁর।’

‘বলতে চাইছেন নীতি বিবর্জিত জীবন যাপন করত সোফিয়া?’

‘আ’র্যাম অ্যাফ্রেড সো।’

‘আপনি শিওর?’

মাথা দোলাতে লাগল গোয়েন্দা, ‘শিওর, শিওর! এদেরই কেউ হত্যা করেছে তাঁকে। লা সেনরিনার পুরুষ বন্ধুদের একটা তালিকা তৈরি করেছি আমি, সেনর। ওর মধ্যে আপনার নামও আছে।’

রেগে ওঠার ভান করল রানা। ‘তার মানে আপনি...’

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল লোকটা। ‘না না, তেমন কিছু মীন করছি না আমি। আমি ভেতরের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি এখনও। আপনি চিনতেন লা সেনরিনাকে, ঠিক?’

‘ঠিক।’

‘তাঁকে নিয়ে মুভি দেখতে গিয়েছেন, লাঞ্চ-ডিনার করেছেন, এগুলো মিথ্যে নয় নিশ্চয়ই?’

‘না। সত্যি।’

‘গুড। এবার দয়া করে বলুন, তাঁর মৃত্যুর দিন সন্দের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?’

অনেক আগেই এ প্রশ্নের উত্তর ভেবে রেখেছে ও। কিন্তু তখনই উত্তর দিল না। বরং শান্ত গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল। ‘আপনার কি মনে হয় সোফিয়াকে আমি হত্যা করেছি?’

‘আপনাকে বলেছি, সেনর, লা সেনরিনার পুরুষ বন্ধুদের একটা তালিকা তৈরি করেছি আমি। ‘ওইদিন সন্ধ্যায় তারা কে কোথায় ছিল জানার চেষ্টা করছি। এখন দয়া করে কথা না বাড়িয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। কোথায় ছিলেন আপনি তখন?’

‘এখানেই ছিলাম । আমার বাংলোয় । পরদিন সকালে মাছ...’

‘পরদিনের ব্যাপারে আমার কোন আশ্রয় নেই, সেনর,’ বলল ফ্রেনজি । ‘আমি শুধু জানতে চাই ওইদিন সন্দের সময় কোথায় ছিলেন ।’

‘এখানেই ছিলাম ।’

‘কি করছিলেন?’

‘মানে?’ ভুরু কোঁচকাল রানা ।

‘মানে, সন্কেটা কাটালেন কি ঘরে শুয়ে-বসেই? নাকি...’

‘বই পড়ে ।’

‘আই সী!’ চোখ নামিয়ে নিজের চকচকে পালিশ করা জুতো জোড়ার দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ লেফটেন্যান্ট । ‘ডিনার করেছেন কোথায়?’

‘ঘরেই । মাথা ধরেছিল খুব, তাই ইচ্ছে থাকলেও বেরোতে পারিনি ।’

‘কেউ দেখা করতে এসেছিল ওইসময় আপনার সাথে? বা টেলিফোন করেছিল কেউ? অথবা আপনি কাউকে...?’

‘অ্যা...,’ যেন চিন্তা করছে, এমন একটা ভাব করল রানা । ‘হ্যাঁ । আমি ফোন করেছিলাম ।’

‘তাই? কাকে?’

‘আমার পি.এ-কে ।’

‘ক’টার দিকে বলুন তো?’

‘ঠিক সময়টা মনে নেই । তবে আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ।’ বুদ্ধি করে লিজার বাইরে যাওয়ার সময়টা জেনে নিয়েছিল বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ও ।

‘কি নিয়ে আলাপ করেছিলেন সেনরিনার সাথে? আই মীন ব্যাপারটা যদি একান্ত ব্যক্তিগত না হয়...’

হাসল রানা। ‘আলাপ হয়নি।’

‘বুঝলাম না।’

‘আমি টেলিফোন করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু নিজাকে পাইনি। বাসায় ছিল না তখন সে। শপিং করতে গিয়েছিল।’

কতক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল ফ্রেনজি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ছোট্ট করে বলল, ‘অ।’

আবার নীরব হয়ে গেল লোকটা। জুতোর ডগা দিয়ে কার্পেট বিছানো ফ্লোরে ‘থ্যাপ’ ‘থ্যাপ’ আওয়াজ করছে। দু’চোখের মাঝখানে গভীর ভাঁজ পড়েছে। আবার যখন চোখ তুলে তাকাল, রানার মনে হল দু’চোখ জ্বলছে ব্রো-ল্যাম্পের মত।

‘ওয়েল, থ্যাঙ্ক ইউ, সেনর,’ উঠে দাঁড়াল গোয়েন্দা। ‘সমস্যাটা জটিল, বুঝতেই পারছেন। খোঁজ-খবর এবং একে-তাকে প্রশ্ন করে রহস্যের কিনারা করতে হবে আমাদের। এর কোন শর্টকাট উপায় নেই। বোধহয় আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। আশা করি কিছু মনে করবেন না।’

‘দ্যাট’স ও কে,’ বলল রানা।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফ্রেনজি। ঘুরে দাঁড়াল। ‘আর কিছু কি বাদ পড়ে গেল, সেনর? মানে, এমন কিছু কি ছিল আপনার যা বলতে ভুলে গেছেন?’

‘না, লেফটেন্যান্ট। আমি অ্যাবসেন্ট মাইণ্ডেড প্রফেসর নই।’

‘আমিও তাই ভাবি। তবুও বলা তো যায় না, মানুষের মন। হয়ত পরে মনে পড়বে আপনার।’

‘তেমনটি হলে সাথে সাথে জানাব আপনাকে।’

‘আই উইল বি গ্ল্যাড ইফ ইউ উড । ও হ্যাঁ, শুক্রবার নেপলস-এ একবার যেতে হচ্ছে আপনাকে । আমরা ওইদিন ফাইন্যাল রিপোর্ট দেব লা সেনরিনার মৃত্যুর ব্যাপারে । তৈরি থাকবেন ।’
দরজা খুলে বেরিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি ।

ভেতরের আলো নিভিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল রানা । আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে লোকটাকে । ঢাল বেয়ে দ্রুত পায়ে নেমে যাচ্ছে । সিগারেট ধরিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিল রানা । এখনও থম মেরে আছে আকাশ । পুরু কালো মেঘে ঢাকা । মাঝে মধ্যে ওর ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ—নিঃশব্দে । এবার নামলে সারারাত ধরে চলবে বৃষ্টি ।

মনের ভেতর বিপদ সঙ্কেত বাজছে । সোফিয়ার হত্যাকারীকে সনাক্ত করার ব্যাপারে একচুল এগোতে পারেনি ও । অথচ ফ্রেনজি তার কাজ প্রায় গুছিয়ে এনেছে । তাড়াতাড়ি মাঠে নামার তাগিদ অনুভব করল রানা । নইলে দেরি হয়ে যেতে পারে ।

টেলিফোনের আওয়াজে সচকিত হল মাসুদ রানা । সিগারেট ফেলে দিয়ে ভেতরে চলে এল তাড়াতাড়ি । রিসিভার তুলতেই লিজার গলা শোনা গেল । ‘রানা, কি করছ?’

‘তৈরি হচ্ছি ।’

‘তৈরি হচ্ছ মানে?’

‘জরুরি কাজ আছে । বেরোতে হবে ।’

‘এত রাতে...কি কাজ? আমি আসব?’

‘কেন?’

‘যদি তোমার কোন সাহায্য দরকার হয়!’

‘ধন্যবাদ । তার দরকার নেই । তুমি কিন্তু ধৈর্য ধরবে বলে কথা দিয়েছিলে কাল, লিজা ।’

‘হ্যাঁ, মনে আছে । কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় করছে, রানা ।’

‘ও কিছু না । ঘুম দাও, ঠিক হয়ে যাবে । রাখি, সকালে দেখা হবে ।’ তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার রেখে দিল ও । ঘড়ি দেখল । পৌনে বারটা । আরেকটু গভীর হোক রাত, ভাবল রানা । সেই সাথে যদি বৃষ্টি নামত, খুব সুবিধে হত । সময় কাটছে না । লাউঞ্জে এসে টিভি খুলল রানা । মারিয়া মেনেঘিনি কাল্লাসের গানের অনুষ্ঠান চলছে । পুচ্চিনির বিখ্যাত একটা গান গাইছে শিল্পী ।

আবার বেজে উঠল টেলিফোন । ভল্যুম কমিয়ে দিয়ে ফোন ধরল ও । ‘ইয়েস?’

শৌ শৌ, খুট খাট ইত্যাদি নানারকম আওয়াজ ছাপিয়ে সেই পুরুষালী মেয়ে কণ্ঠটা শোনা গেল—ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের পি. এস । নিউ ইয়র্ক থেকে লং ডিসট্যান্স কল । ধৈর্য ধরে থাকতে পারেননি ভদ্রলোক ।

‘মিস্টার মাসুদ রানা?’

‘বলছি ।’

‘মিস্টার ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান কথা বলবেন, স্যার । একটু ধরুন ।’

প্রায় সাথে সাথে ভদ্রলোকের গলা ভেসে এল । ‘কেমন আছ, রানা?’

‘ভাল আছি । আপনার জানিতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?’

‘নো, থ্যাঙ্কস । রানা, কোন অগ্রগতি হল?’

‘লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি এসেছিল এইমাত্র ।’

‘কি বলে সে?’

‘সোফিয়ার মৃত্যুকে ওরা আর দুর্ঘটনা ভাবতে রাজি নয় । ওরা ফুল-স্কেল ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দিয়েছে । রবার্ট হুইটনিকে খুঁজছে এখন ।’

অনেকক্ষণ কথা বললেন না ভদ্রলোক । লাইনের বিভিন্ন বিরক্তিকর আওয়াজ পীড়া দিচ্ছে কানকে । ‘সিদ্ধান্ত কেন পাল্টাল ওরা? করোনার আর পুলিশ চীফের সাথে যে কথা হয়েছে আমার, বলনি লোকটাকে?’

‘বলেছিলাম । মনে হয় করোনার আর ফ্রেনজির চীফও মত পাল্টে ফেলেছে । সেরকমই বলল ফ্রেনজি ।’ এই সাথে বাংলা থেকে সোফিয়ার ক্যামেরা চুরি যাওয়ার কথা শেরম্যানকে খুলে বলল রানা ।

ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন তিনি, ‘তাহলে? কি করতে চাও তুমি এখন?’

‘চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি । দেখি কি করা যায় । পুলিশ জানতে পেরেছে এখানে বেশকিছু পুরুষ বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছিল সোফিয়া । তাদেরকে খুঁজছে ওরা । যাকগে, আমিও বসে নেই । ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই আশা করি ।’

‘রানা, আমার হয়ে ফ্রেনজিকে একটা কথা বোলো । বলবে, সোফিয়াকে নিয়ে ও যদি কোনরকম স্ক্যাণ্ডাল ছড়ায়, ওর ভবিষ্যৎ ধুলো করে দেব আমি ।’

‘বলব । তবে আমার মনে হয় না এ নিয়ে এখনই দুশ্চিন্তার কিছু আছে ।’

‘তুমি বললে ভরসা পাই, সন।’

‘খুব একটা ভরসা দিতে পারছি না আপনাকে। তবে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি।’

‘ওতেই আমি খুশি। আর শোন, করোনারের সাথে আলাপ করে দেখ। লোকটা আমাকে কথা দিয়েছিল সোফিয়ার প্রেগনেসির ব্যাপারটা চেপে রাখবে। অথচ এখন...।’

‘না, সে ভয় নেই। ওটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না এখন পুলিশ। হুইটনি ধরা না পড়া পর্যন্ত ওসব নিয়ে কোন কথা ওঠার সুযোগ নেই। ওটা আসবে পরে।’

‘সম্ভব হলে আজই একবার কথা বল করোনারের সাথে। কাল দুপুরে আবার ফোন করব আমি। তোমার ফোন করার দরকার নেই। কাজ চালিয়ে যাও তুমি। ওকে?’

‘ওকে।’

কেটে গেল লাইন। নেপলস টেলিফোন করল রানা, করোনার সলোয়া ক্যানডালোর বাসায়। দু’বার রিঙ হতে তিনি নিজেই ধরলেন ফোন।

‘আমি নিউ ইয়র্ক ভিশনের রোম ব্যুরো চীফ বলছি,’ গম্ভীর গলায় বলল রানা। ‘মাসুদ রানা।’

‘ইয়েস, ইয়েস, সেনর। বলুন?’ হেঁ হেঁ করে হাসলেন করোনার। ‘কি করতে পারি আপনার জন্যে?’

‘আমার জন্যে কিছুই করার নেই আপনার। এইমাত্র কথা বলেছি আমি মিস্টার শেরম্যানের সাথে। তাঁর সঙ্গে আপনার কোন বিষয়ে মতৈক্য হয়েছিল। কিন্তু আপনি তা ভুলে গেছেন জানতে পেরে দুশ্চিন্তায় আছেন তিনি। সম্ভবত কাল-পরশু আবার এ দেশে

আসছেন তিনি ।’

আকাশ থেকে পড়লেন যেন করোনার । ‘না না, সে কি! কে বলেছে আপনাকে ভুলে গেছি আমি? কিছু ভুলিনি আমি, সেনর । সব পরিষ্কার মনে আছে । তাঁর মেয়ের প্রেগনেন্সির ব্যাপারটা তো? ওটা যেমন বলেছি, তেমনি চাপা থাকবে । আর খুনীর ব্যাপারে... ওসব নিয়ে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই সেনর শেরম্যানের, বুঝলেন?’

‘তাই যেন হয় । নইলে পরে বলবেন না যেন আপনাকে সতর্ক করিনি আমি,’ দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল মাসুদ রানা ।

শুরু হয়ে গেছে কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি । এইবার! তাড়াতাড়ি কাপড় পরতে শুরু করল মাসুদ রানা ।

পাঁচ

স্টেডিয়ামের উল্টোদিকের মার্গারিটা সুপার মার্কেটের সামনে গাড়ির গতি কমাতে রানা । পার্কিং লটে চার-পাঁচটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ছাড়া ছাড়া ভাবে । ওর মাঝে অন্ধকারমত এক জায়গায় লিঙ্কন কনভার্টিবলটা দাঁড় করাল ও । স্টার্ট বন্ধ করে আশপাশে তাকাল ।

প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে ঝাপসা লাগছে সব । বড় বড় ফোঁটাগুলো তিক্ত অবকাশ-২

রাস্তায় আছড়ে পড়েই বিস্ফোরিত হচ্ছে। গাড়ির ছাতে অবিরাম ড্রামের শব্দ। কি এক সম্মোহনী জাদু আছে যেন ওর মধ্যে। মন দিয়ে শুনলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম এসে যাবে।

পাশ থেকে রেইনকোটটা তুলে নিল মাসুদ রানা। আজই দুপুরে এটা কিনেছে ও। ধীরেসুস্থে গাড়ি থেকে বেরোল। চওড়া রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা বলতে গেলে। ঘুরে সুপার মার্কেটের দিকে তাকাল ও। গেটের কাছে দু'চারজন লোক দেখা যাচ্ছে। জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেইনকোটের দু'পকেটে হাত ভরে দীর্ঘ পায়ে রাস্তা পার হল রানা।

স্টেডিয়ামের দেয়াল ঘেঁষে পিছনের অভিজাত আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়ল। ভেইল পাওলো ভেরোনেস জায়গাটার নাম। রোমের ধনী চূড়ামণিদের অন্যতম স্বর্গ। দু'দিকে অনেক দূর পর পর একেকটা বাড়ি। বেশিরভাগই দোতলা। রাস্তায় জনমানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই। ডানদিকের দুটো বাড়ির পরই ভিলা প্যালেস্টো।

গেটের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। আট ফুট উঁচু পাথরের দেয়াল ঘিরে রেখেছে ভিলাটাকে। দূরে বাহারি ফুলের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আবছাভাবে অন্ধকার ভিলাটা দেখা যায়। সামনে প্রকাণ্ড লন। আস্তে করে ভেতরে ঢুকল রানা। বাঁ দিকে গার্ডরুম। কিন্তু খালি। গার্ড নেই। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ওটার পিছন দিকটাও ঘুরে এল রানা। কোথাও কারও চিহ্ন নেই।

সাবধানে এগোল রানা। লনের মাঝখান দিয়ে দীর্ঘ ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে পৌঁছে গেল ভিলার ত্রিশ গজের মধ্যে। একটা বড়

ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল । ব্যাঙ ডাকছে চারদিকে । ইতস্তত করছে রানা ।

আশপাশে কোথাও গার্ড থাকতে পারে ভেবে সতর্ক । এ বাড়ির সাথে ইটোলা গ্র্যান্ডির যদি কোন রকম সংস্রব থেকে থাকে, তাহলে গার্ড থাকবেই, কোন ভুল নেই তাতে । খুব সাবধানে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে পুরো ভিলাটা ঘুরে এল ও । যে সব জায়গায় গার্ড থাকতে পারে বলে সন্দেহ হয়েছে, তার সবখানেই খুঁজে দেখেছে । নেই গার্ড ।

এবার পুরোপুরি নিশ্চিত হল মাসুদ রানা । ঘুরে ভিলার অন্যদিকে চলে এল । সামনের বড় বারান্দা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে । তার ওপাশেই গ্যারেজ । চক্কর দেবার সময় এদিকের এক জানালায় আলো দেখতে পেয়েছিল ও । এখনও জ্বলছে আলোটা । জানালার পর্দা টানা নেই । ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে ও পরিষ্কার । এটা ছাড়া ভিলার আর কোথাও কোন আলো নেই । রুমটা বেশ বড় । আসবাবপত্র সব দামি, লেটেস্ট ডিজাইনের । একই সঙ্গে মেয়েটির ওপর চোখ পড়ল । জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, টেবিল বা কিছু একটার ওপর ঝুঁকে কি করছে যেন মেয়েটি । সুবিধের জন্যে আরেকটু এপাশে সরে দাঁড়াল রানা ।

টেবিল-ই । ওটার ওপর একটা কালো ইভনিং ব্যাগ, তার ভেতর কিছু একটা রাখছে মেয়েটি । ভাল করে তাকাতে হল না, প্রথম দেখাতেই বুঝে নিয়েছে রানা, এ সেই মেয়ে । এই মেয়েটিই ওকে অনুসরণ করছিল আজ । নিশ্চয়ই সারা গ্র্যান্ডি, ভাবল রানা । সরাসরি আলোর নিচে দাঁড়ানোয় মুখটা দেখা যাচ্ছে তার পরিষ্কার ।

চেহারাটা চেয়ে দেখার মত, মনে মনে স্বীকার না করে পারল না রানা। তেমনি দেহের গঠন, চোখ ফেরানো দায়। পাঁচ ফুট তিন কি চার ইঞ্চি হবে লম্বায়। বয়স বাইশ-তেইশ। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলগুলোর রঙ বাদামী। ঢোলা সাদা ইভনিং ড্রেস পরে আছে মেয়েটি। চমৎকার মানিয়েছে।

একটু পর ব্যাগের জিপার টেনে বন্ধ করল মেয়েটি। পাশেই চেয়ারের ওপর থেকে তুলে নিল একটা মিস্ক কোট। এক কাঁধে ইভনিং ব্যাগ, অন্য কাঁধে কোটটা ঝুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। কয়েক পা হেঁটে রুমের ও প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে নিভে গেল ঘরের আলো, নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল ভিলা প্যালেস্‌টা। প্রকাণ্ড জানালার কাঁচে দ্রুত উড়ে চলা মেঘের ছায়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এখন রানা।

বৃষ্টির তেজ এরমধ্যে আরও বেড়ে গেছে যেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত পর সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মেয়েটি। মিস্ক কোটটা এর মধ্যে গায়ে চড়িয়ে নিয়েছে। হাতে বড় একটা ছাতা দেখা যাচ্ছে। ওটা মাথায় দিয়ে এক দৌড়ে ওপাশের গ্যারেজে গিয়ে ঢুকল সে। আলো জ্বলে উঠল গ্যারেজের।

একটা বটল গ্রীন ক্যাডিলাকের ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। দরজার মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে ওটার নাক থেকে লেজ পর্যন্ত লম্বা, সাদা রঙের চওড়া স্ট্রাইপ রয়েছে। স্টার্ট নিল ক্যাডিলাক। দ্রুত বেরিয়ে এল গ্যারেজ থেকে। রানা যে ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দশ ফুট সামনে দিয়ে গেটের দিকে ছুটে গেল দ্রুতবেগে। গেটের সামনে পৌঁছে থামল ক্যাডিলাক। গেট খোলার আওয়াজ শুনল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর আবার

হুঙ্কার ছাড়ল ওটার শক্তিশালী এনজিন। উঁচু দেয়ালের ওপাশে রাস্তার গাছগুলো আলোকিত হয়ে উঠল হেডলাইটের আলোয়। বোঝা গেল স্টেডিয়ামের দিকেই যাচ্ছে মেয়েটি।

কিন্তু তখনই নড়ল না মাসুদ রানা। পুরো পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়। পলকহীন চোখে চেয়ে আছে ভিলার দিকে। তারপর এগোলো। আড়াল ছেড়ে ড্রাইভওয়েতে উঠে এল। প্রায় দৌড়ে এগিয়ে চলল ভিলার দিকে। সামনের দরজার হাতলটা ঘোরাল ও। ঘুরছে না। বন্ধ।

অবশ্য খোলা থাকবে এমনটি আশা করেনি ও। পকেট থেকে স্টীলের ছোট একটা এক মাথা বাঁকানো স্পাইক বের করল। বাঁকা প্রান্তটা চ্যান্টা, দু'ফাঁক করা। সেদিকটা তালার ভেতর ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল রানা। দু'তিনবার এদিক-ওদিক ঘোরাতেই আওয়াজ উঠল 'খুট' করে। নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। স্পাইকটা পকেটে পুরে একটা মিনি টর্চ লাইট বের করল। ওটার আধুলি সাইজের জোরাল আলোয় দেখে নিল রুমটা। এটা হলরুম।

হলরুমের শেষ মাথায় বাঁ প্রান্তে ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি, উঠে গেছে দোতলায়। আগে ওপরটা দেখে আসা যাক, ভাবল রানা। তাড়াতাড়ি উঠে এল ওপরে। লম্বা একটা ল্যাণ্ডিং উঠে শেষ হয়ে গেছে সিঁড়ি। সেখানে একটু দূরে দূরে চারটে দরজা দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি চারটে রুম। এগিয়ে এসে প্রথম দরজাটা খুলল রানা।

প্রথম দর্শনেই বুঝল ও, এটা নিশ্চয়ই সারার রুম। রুমটা মাঝারি আকারের। এক কোণে একটা ডিভান, ওপরে ডেলভেটের রক্ত-লাল বেড কভার। চার দেয়াল ধূসর রঙের সাটিন দিয়ে তিক্ত অবকাশ-২

মোড়া। ড্রেসিং টেবিলসহ ঘরের অন্য সব আসবাবপত্র রূপালী রঙের। স্টীলের তৈরি টকটকে লাল কার্পেট বিছানো পুরো ঘরে। ভেতরে এসে দাঁড়াল রানা।

ড্রেসিং টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল প্রথমেই। সামনে খোলা পড়ে আছে একটা জুয়েলারি বক্স। ভেতরে যা যা আছে সবই অত্যন্ত দামি। ডায়মণ্ড বসানো তিনজোড়া ইয়ার রিঙ, পাঁচটা আংটি, একজোড়া ডায়মণ্ড কলার ইত্যাদিসহ আরও হরেক রকমের অলঙ্কার। টর্চের আলোয় চোখ ধাঁধানো দ্যুতি ছড়াচ্ছে সবগুলো।

বোঝা গেল পানিতে ফেলার মত প্রচুর অর্থ আছে সারা গ্র্যান্ডির। অথবা, ভাবল রানা, হয়ত এরও সোফিয়া শেরম্যানের মত পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা অনেক। একটা একটা করে অন্য রুমগুলোও ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখল ও। শেষ রুমটায় পা রেখেই থমকে দাঁড়াল। এটা সম্ভবত অতিরিক্ত বেডরুম। মনে মনে যা খুঁজছিল, পেয়ে গেল ও এই রুমে।

ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল বাঁ হাতে পড়ে আছে ওর চুরি যাওয়া সুটকেসটা। খোলা। দামি দামি স্যুটগুলো সব দলা পাকিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে ভেতরে। এক কোণে চিক চিক করছে ওর প্রিয় রূপোর তৈরি সিগারেট কেসটা। গত জন্মদিনে সোহেল ওটা উপহার দিয়েছিল। অনেকক্ষণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল রানা।

তারপর আস্তে করে হাঁটু গেড়ে বসল সুটকেসটার সামনে। একটা একটা করে স্যুটগুলো বের করে রাখল মেঝের ওপর। চুরি যাওয়া সবকিছুই আছে এখানে—নেই শুধু সোফিয়ার ক্যামেরাটা। যেমন ছিল, আবার তেমনি অগোছাল করে রাখল ও জিনিসপত্র।

উঠে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় প্রচণ্ড আওয়াজের সাথে কেঁপে উঠল পুরো ভিলা। চমকে গেল রানা ভূমিকম্প মনে করে। অবশ্য পরক্ষণেই ভুলটা ভাঙল ওর। আসলে হলরুমের দরজাটা গায়ের জোরে ধাক্কা মেরে খুলল কেউ। দেয়ালে আছড়ে পড়েছে ওটা সশব্দে।

‘সারা!’ ভীষণরকম মোটা, কর্কশ গলায় হাঁক ছাড়ল একটা পুরুষ কণ্ঠ।

অবাক হল রানা গলাটা শুনে। কোন মানুষের গলা দিয়ে যে এরকম অমার্জিত, জান্তব স্বর বেরোতে পারে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। গলাটা রানার পরিচিত। সেদিন টেলিফোনে এই লোকটাই চোঁচাচ্ছিল ষাঁড়ের মত।

‘সা-রা!’ প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে আবার কেঁপে উঠল ভিলা। দরজা বন্ধ করল লোকটা। সনি!

পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। নিঃশব্দে প্রেতের মত এগিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে। টর্চটা পকেটে পুরেছে আগেই। নিচের হলরুমের আলো জ্বলে দিয়েছে সনি। তার আবছা আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও পুরো ল্যাণ্ডিং।

হঠাৎ করেই গান গাইতে শুরু করল সনি। সুরহীন, চড়া পর্দার গান। শুনে মনে হয় কোন দরজার জঙ ধরা কবজা, অনবরত ক্যাচ-কোঁচ শব্দ করছে। আওয়াজটা আণ্ডপিছু করছে, নিশ্চয়ই হাঁটাহাঁটি করছে লোকটা। ল্যাণ্ডিংয়ের মোটা একটা পিলারের এপাশে দাঁড়াল রানা। সাবধানে উঁকি দিয়ে তাকাল। এগিয়ে আসছে গলার স্বর।

হঠাৎ করেই দানবটার ওপর চোখ পড়ল। লাউঞ্জের দরজার

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই লোক!

গান গাইছে ঠিকই, কিন্তু কেন যেন লোকটাকে চিন্তিত মনে হল রানার। ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে বিশ্রীভাবে। কালো টার্টল নেক সোয়েটার পরে আছে। ট্রাউজারটাও কালো। পায়ে চকচকে পালিশ করা উঁচু হিলের মেক্সিকান বুট। ডান কানে ছোট্ট সোনার একটা রিঙ। ঠিক যেমনটি বর্ণনা দিয়েছিল কার্লো মনটি, এ চেহারা একবার দেখলে ভোলা সম্ভব নয়, সত্যিই তাই।

কি করবে ভাবছে রানা। এ মুহূর্তে যদি ওপরে উঠে আসে লোকটা ধরা পড়ে যাবে ও। রানাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল সনি আচমকা। পাগল নাকি? ভাবল ও, একা একা হাসছে কেন লোকটা?

‘সেনর রানা, কোথায় আছ তুমি, বেরিয়ে এস!’ গর্জন করে উঠল সনি। ‘আমি জানি ভেতরেই আছ তুমি। বেরিয়ে এসো। জরুরি আলাপ আছে তোমার সাথে।’

জমে গেল মাসুদ রানা। চেহারা হয়েছে দারুণ এক ঠক খাওয়া বেকুবের মত। এ ধরনের কিছু ঘটবে কল্পনা-ই করেনি ও। কি-ভাবে লোকটা টের পেল ও এখানে আছে?

‘আমার ধৈর্য খুব অল্প, সেনর,’ আবার বলে উঠল সে। হাসি গিয়ে ঠেকেছে দুই কানে। ‘বেরিয়ে এসো। নইলে সোফিয়া শেরম্যানের সাথে কে সরেনটো গিয়েছিল জানিয়ে দেব আমি পুলিশকে।’

মাথা কাৎ করে, কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ সনি। রানার তরফ থেকে উত্তর শোনার আশায় আছে হয়ত। কয়েক মুহূর্ত পর আবার গলা শোনা গেল তার। বলল, ‘আমি

জানি তুমি খুব চালাক মানুষ, সেনর । আগে জানতাম না বলে
দুয়েকবার ঠকাতে পেরেছ । কিন্তু আর পারবে না । মাথায় কোন
বদ চিন্তা থাকলে বের করে দাও । চলে এসো লাউঞ্জ । নইলে
পস্তাবে পরে ।’

লোকটার কথামত চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, ভাবল রানা ।
শোনা দরকার কি বলতে চায় সে । হয়ত তাতে অনেক প্রশ্নের
উত্তর পেয়ে যাবে ও । অনর্থক ঝুট ঝামেলার হাত থেকে বাঁচা
যাবে । সরে এসে খোলা জায়গায় দাঁড়াল ও, সিঁড়ির মাথায় ।
সরাসরি চেয়ে আছে সনির দিকে ।

পিলে চমকানো এক টুকরো হাসি ফুটল তার মুখে রানার
ওপর চোখ পড়তেই । ‘নেমে এসো,’ বলল সনি । ‘সুখ-দুঃখের
আলাপটা সেরে নেয়া যাক ।’ দু’কোমরে হাত রেখে ওর দিকে
চেয়ে আছে সনি অপলক চোখে । চেহারায় ভাবভঙ্গিতে গভীর
আত্মপ্রত্যয় ।

ছয়

ধীরপায়ে নেমে এল মাসুদ রানা । এখনও ওর দিকে চেয়ে আছে
লোকটা হাসি মুখে । দু’চোখ নড়ছে কেবল । ঘন ঘন নজর
বোলাচ্ছে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত । রানাও সতর্ক দৃষ্টিতে

মাপছে সনিকে । দু'পা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে সে, বাঁ পা ডান পা'র ইঞ্চি ছয়েক সামনে । বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রয়োজনের সময় বিদ্যুৎগতিতে অঙ্গ সঞ্চালন করার জন্যে প্রস্তুত দানবটা ।

নিচে নেমে দাঁড়াল রানা । সনি রয়েছে সাত-আট হাত দূরে । একেবারে কাছ থেকে লোকটাকে দেখল ও । কম করেও ছ'ফুট দু'ইঞ্চি হবে উচ্চতা । পাশে রানার দ্বিগুণ । শ্বাসের তালে তালে টাইট সোয়েটারের নিচে ওঠানামা করছে চওড়া পেশীবহুল বুকের ছাঁতি ।

'হ্যালো, রোমিও,' হাসিটা আরও চওড়া হল সনির । 'খুব বেশি অবাক হয়েছ বুঝি? অবাক হওয়ার তেমন কিছু নেই, বুঝলে । আসলে বিকেল থেকেই তোমাকে অনুসরণ করছিলাম আমি । মেয়েটাকে যে-ভাবে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তাতে ওকে আর তোমাকে ফলো করতে পাঠাতে সাহস হল না । তোমার সাহসের প্রশংসা করি । সেদিনও প্রায় একইভাবে বোকা বানিয়েছিলে আমাকে অটোস্ট্রাডায় ।'

গালের কাটা দাগটা আলতো করে চুলকাল সনি । বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনের লাউঞ্জ নির্দেশ করল কাঁধের ওপর দিয়ে । 'চল, ওখানে বসে আলাপটা সারা যাক ।' দরজা ছেড়ে পিছিয়ে গেল সে । পথ করে দিল রানাকে ।

বিনা বাক্যব্যয়ে লাউঞ্জে চলে এল মাসুদ রানা । গদিমোড়া পিঠ উঁচু একটা চেয়ারে বসল । সনি বসল ওর মুখোমুখি, আরেকটা চেয়ারের হাতলে ।

'তারপর?' পকেট থেকে এক প্যাকেট আমেরিকান সিগারেট

বের করল সনি। ‘তোমার সুটকেসটা খুঁজে পেয়েছ নিশ্চই? ‘ফশ’ করে ম্যাচের কাঠি ধরাল। জিভের ডগা দিয়ে সিগারেটের ফিল্টারটা ভিজিয়ে নিয়ে দাঁতে কামড়ে ধরাল। দৃশ্যটি ঢাকাই বাংলা ছবির ভিলেনের ওভার অ্যাকটিঙের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে।

‘পেয়েছি,’ স্বাভাবিকভাবে বলল রানা। ‘কিন্তু ক্যামেরাটা দেখলাম না কোথাও। কোথায় রেখেছ ওটা?’

আবার কপাল কুঁচকে গেল সনির। রানার প্রশ্ন করার ঢঙটা সম্ভবত পছন্দ হয়নি। ঠোট গোল করে ধোঁয়া ছাড়ল সে রানার মুখ সই করে। ‘প্রশ্ন করব আমি, রোমিও। তুমি শুধু উত্তর দিয়ে যাবে। প্রশ্ন পছন্দ করি না আমি। সে যাক, এখানকার খবর জানলে কি করে তুমি?’

‘ঘরের দেয়ালে এখানকার ফোন নাম্বারটা লিখে রেখেছিল একটি মেয়ে। বাকিটুকু কঠিন কিছু নয়।’

‘সোফিয়া?’ হাতল থেকে নেমে চেয়ারে বসল সনি।

‘বুলস আই!’

‘কি?’

‘বলছি লক্ষ্য তোমার অব্যর্থ।’

ঠোট বেঁকে গেল সনির। ‘এর মধ্যেও ঠাট্টা?’

‘পাগল! জানে ডর-ভয় নেই বুঝি আমার?’

থমথমে হয়ে উঠল সনির চেহারা। কঠোর চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রেগে উঠছে লোকটা। ভেতরে ভেতরে। অবশ্য কি ভেবে সাথে সাথেই সামলে নিল সে নিজেকে। ‘সক্কের পর পুলিশের লোকটা কেন গিয়েছিল তোমার তিঙ্ক অবকাশ-২

ওখানে?’

‘তাকেই জিজ্ঞেস কর না গিয়ে,’ বলেই উঠে দাঁড়াল রানা।
তাড়াতাড়ি বলল, ‘ভয় পেয়ো না। একটা সিগারেট ধরাব।’

কুঁতকুঁতে সন্দিক্চ চোখে রানার হাবভাব লক্ষ্য করছে লোকটা।
দেহের প্রতিটি পেশী টান টান হয়ে উঠেছে, একচুল এদিক-ওদিক
দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। সিগারেট ধরিয়ে আবার বসল
রানা।

‘আমার প্রশ্নের উত্তরটা এখনও দাওনি।’

‘ভুলে গেছি। কি যেন জিজ্ঞেস করছিলে?’

উবু হল সনি। শান্ত ভঙ্গিতে আধ খাওয়া সিগারেটটা ফেলে
দিল দামি কার্পেটে, বুট দিয়ে ডলে নিভিয়ে ফেলল। এবার মস্ত
দুই থাবা হাঁটুর ওপর রেখে মুঠো বানাল রানাকে দেখিয়ে
দেখিয়ে। গাঁটগুলো ঠেলে বেরিয়ে আছে বাইরে। ওই হাতের
একটা ঘুসি খেলে কেমন লাগবে অনুমান করার চেষ্টা করল রানা।

‘মন দিয়ে শোন,’ গম গম করে উঠল লোকটার কণ্ঠ। ‘আর
একবার যদি বেশি স্মার্টনেস দেখাবার চেষ্টা করেছ, তো হাড়ে
হাড়ে টের পাবে সনি বাসিলি কি চীজ। একবার মারধোর শুরু
করলে সহজে থামি না আমি, বোঝা গেছে? নাউ স্টার্ট,’ ডান
হাতের তর্জনী পিস্তলের মত তাক করল সে ওর দিকে। ‘কেন
গিয়েছিল লোকটা তোমার বাংলোয়? কি আলাপ করছিলে তোমরা
অতক্ষণ ধরে?’

‘এক কথা বারবার বলতে ভাল লাগে না,’ যেন বিরক্ত হয়েছে,
এমন মুখভঙ্গি করল রানা। শক্ত হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে, লাফ
দেবার জন্যে প্রস্তুত। ‘বললাম তো, তাকে গিয়েই...’

আওয়াজটার উৎসটা ঠিক ধরতে পারল না রানা। বাজ পড়ল না সনির চিৎকার ওটা, পরিষ্কার হল না। তবে দানবটা যে রকেটের গতিতে উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর ওপর, তা ঠিকই টের পেল। মোটামুটি তৈরিই ছিল রানা, ঝট করে উঠেও পড়েছিল চেয়ার ছেড়ে, কিন্তু দানবটার সামনে থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নেবার সময় পেল না।

বাঁ হাতে প্রচণ্ড এক ঘুসি চালাল সনি ওর পাকস্থলি লক্ষ্য করে। কিন্তু ব্যর্থ হল, সময়মত আঘাতটা ঠেকিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানা। ঠেকিয়ে দিয়েই নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে চাইল ও, পাল্টা আঘাত করতে হলে মাঝখানে প্রয়োজনীয় ব্যবধান দরকার। কিন্তু তার আগেই বাঁ চোয়ালটা গুঁড়িয়ে যাওয়ার দশা হল সনির ডান হাতের নক আউট পাঞ্চ খেয়ে। মাথার মধ্যে বিস্ফোরিত হল যেন মগজ-উজ্জ্বল সাদা আলো ঝলসে উঠল চোখের সামনে।

ওরই মধ্যে আন্দাজে পা চালাল রানা, ঝটাং করে শক্ত এক লাথি বসিয়ে দিল সনির হাঁটুর ওপর।

‘আউচ!’ গলা ফাটিয়ে চেনিয়ে উঠল লোকটা।

মাথা ঝাড়া দিয়ে চোখের ঝাপসা ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করল রানা, মুষ্টিযোদ্ধার মত মুঠো করা দু’হাত তুলে রেখেছে মুখের সামনে। খেপে গেছে সনি, দম ছাড়ছে ঝড়ের বেগে। সামলে নিয়ে উন্মত্ত গণ্ডারের মত ছুটে এল সে, তখনও পাঞ্চের ধাক্কা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি রানা। আবার ঘুসি ছুঁড়ল সনি। দু’হাতের ফাঁক গলে ওর খুতনিতে আঘাত করল ঘুসিটা। খুব একটা জোর ছিল না মারে, কিন্তু ওতেই আরেকবার নাড়া খেল রানার ঘিলু।

মরিয়া হয়ে ফাঁক খুঁজতে লাগল রানা। বুঝতে পেরেছে, বেশিক্ষণ একে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। যা করার দ্রুত করতে হবে। আবছাভাবে দেখতে পেল, ওকে টলোমলো পায়ে আঁপুপিছু করতে দেখে রাগে দাঁত বেরিয়ে গেছে সনির। বুঝে ফেলেছে তাকে বাধা দেবার শক্তি নেই এখন ওর। সতর্ক হওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করল না সে, এগিয়ে এল বিদ্যুৎগতিতে।

সময়মত সর্বশক্তিতে ঘুসি ছুঁড়ল রানার চোয়াল সহ করে। এবং বেকুব বনে গেল। ‘সাঁৎ’ করে মুখটা কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে নিল মাসুদ রানা, নাকের সামনে দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল ভয়ঙ্কর আঘাতটা। পরক্ষণেই নাক দিয়ে ‘ঘোঁৎ’ শব্দ বেরুল তার তলপেটে রানার হাঁটুর জোরাল এক গুঁতো খেয়ে। একই সঙ্গে আঙুলগুলো সোজা রেখে তার কানের নিচে কারাতের এক কোপ ঝেড়ে দিয়েছে রানা।

অবশ্য খুব একটা জোরাল হল না মারটা, গুঁতো খেয়ে দু’পা পিছিয়ে গেছে ততক্ষণে সনি। প্রচণ্ড রাগে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল লোকটার, গালের কাটা দাগটা জ্বল জ্বল করছে যেন। হঠাৎ ডাইভ দিল সনি দু’হাত সামনে বাড়িয়ে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে উড়ে পেরিয়ে এল মাঝখানের দূরত্বটুকু। বিপদ টের পেয়ে রানাও লাফ দিয়েছিল সামনে থেকে সরে যাওয়ার জন্যে, কিন্তু সফল হল না এবারও। ওর একটা পা জড়িয়ে ধরেছে সনি, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল দু’জন মেঝেতে। পড়েই অদ্ভুত এক ডিগবাজি দিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সনি, পরমুহূর্তেই পিঠ বাঁকা হয়ে গেল রানার শিরদাঁড়ার ওপর তার মেক্সিকান বুটের প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে।

দম আটকে এল রানার। নীল হয়ে গেছে মুখটা ব্যথায়।
সেকেও পুরো হওয়ার আগেই দ্বিতীয় লাথিটা পড়ল বুকের
পাঁজরে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল রানা, দম নিচ্ছে হাঁ করে। নড়ার
শক্তি নেই। চট করে এবার ওর বুকের ওপর চড়ে বসল দানবটা,
ডান হাতের পাঞ্জা পুরো খোলা রেখে প্রচণ্ড এক থাবড়া মারল
রানার নাকমুখ বরাবর।

দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল রানার নাক দিয়ে। ঠোঁটও কেটে
গেছে বেশ খানিকটা। থাবড়ার পর পরই আরেকটা ঘুসি চালাল
সে ওর ডান কানের সামান্য নিচে। চোখের সামনে সনি বাসিলির
বিকট মুখটা ভাঙা কাঁচের মত খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল যেন,
গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল মাসুদ রানাকে।

কারাতে কোপ খাওয়া জায়গাটা ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল
সনি, চওড়া বুকটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। বুঝতে অসুবিধে
হয় না রানার এই আঘাতটা যদি আরেকটু জোরে লাগত, তাহলে
ওই দশা হত ওর নিজেরই। ধীরে ধীরে রাগ পড়ে এল সনির।
পিছিয়ে গিয়ে আগের জায়গায় বসল। সিগারেট ধরিয়ে টানতে
লাগল।

পাঁচ মিনিট পর নড়ে উঠল মাসুদ রানা। অজান্তেই গলা দিয়ে
মৃদু গোঙানি বেরিয়ে এল। চোখ মেলল ও। কপাল গাল কুঁচকে
উঠল তীব্র যন্ত্রণায়। আন্তে আন্তে উঠে বসল রানা। টন টন করছে
চোয়াল, হাড় আন্ত আছে কি-না কে জানে। মাথা ঝাড়া দিল ও,
সাথে সাথে আরও কুঁচকে গেল গাল। ভীষণ যন্ত্রণা করছে মাথা।
দপ দপ লাফাচ্ছে কপালের শিরা।

‘দেখ দেখি,’ কথা বলে উঠল সনি বাসিলি। ‘কেমন শুধু শুধু

ঝামেলা বাধালে । সেই সন্ধে থেকে তোমার পিছু লেগে আছি দুটো কথা বলব বলে, আর তুমি কি না... ।’

মুখের মধ্যে জিভ ঘুরিয়ে দাঁতগুলো সব ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখল রানা । ঠিকই আছে, খোয়া যায়নি একটাও । ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে, কিন্তু জোর করে নিজেকে শান্ত রাখল রানা । ভুলে থাকতে চাইল ব্যাপারটা আপাতত । আগে জরুরি কাজটা শেষ হোক । এর সাথে কথা বলা দরকার, তাহলে হয়ত দুয়েকটা তথ্য পাওয়া যেতেও পারে । এমন কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে, যা থেকে সোফিয়ার হত্যাকারীর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে ।

‘ওঠো,’ বলল সনি । ‘চেয়ারে উঠে বসো ।’

উঠল মাসুদ রানা । লোকটার চোখে চোখ রেখে বসল গিয়ে চেয়ারটায় ।

‘আশা করি আর ঝামেলা করবে না । আমার প্রশ্নের উত্তর দাও । তাহলে তোমার সাথে একটা চুক্তিতে আসব আমি । পুলিশ যাতে সোফিয়ার হত্যাকারী হিসেবে তোমাকে পাকড়াও করতে না পারে সে ব্যবস্থা করব । তোমার পুরো দায়িত্ব আমি নেব । নইলে মনে কর, তুমি একটা গন কেস । খুনের দায়ে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতেই হবে তোমাকে ।’

যন্ত্রণা ভুলে গেল মাসুদ রানা । সনির কথাগুলো ভাবনায় ফেলে দিয়েছে ওকে । ব্যাটা কি করে এত নিশ্চিত হল যে এ ব্যাপারে রানাকেই ধরবে পুলিশ?

‘কি?’ ভুরু নাচাল সনি বাসিলি । ‘কথা বলছ না যে?’

‘প্রশ্ন কর ।’

‘গুডবয়। লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি কেন গিয়েছিল তোমার ওখানে? কি চায় সে?’

‘সোফিয়ার পুরুষ বন্ধুদের নাম।’

চিন্তিত ভঙ্গিতে নাকের ডগা চুলকাল লোকটা। ‘কেন?’

‘তার ধারণা ওদেরই কেউ হত্যা করেছে সোফিয়াকে।’ ভেবেছিল কথাটা শুনে অন্তত কিছুটা হলেও বিচলিত হয়ে পড়বে সনি। কিন্তু হল না। কোনই লক্ষণীয় প্রতিক্রিয়া হল না তার মধ্যে। বরং হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখটা। আগের মত কার্পেটে সিগারেটটা মাড়িয়ে দিয়ে দু’হাত মুঠো পাকাল।

‘রিয়েলি?’

উত্তর দিল না রানা। চোয়াল ডলছে আনমনে।

‘তার মানে ওদের ধারণা সত্যিই কেউ ক্লিফ থেকে ফেলে দিয়েছে সোফিয়াকে?’

‘হ্যাঁ এবং কাজটা যে তোমার, তা-ও বুঝে ফেলেছে সে।’

‘ওয়েল, ওয়েল।’ হাসিটা আরও বিস্তৃত হল সনির। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। ‘নাও।’

‘নো, থ্যাঙ্কস,’ মাথা নাড়ল রানা। পকেট থেকে নিজের ব্র্যাণ্ড বের করে ধরাল। এক বুক ধোঁয়া টেনে নিয়ে ছাড়তে লাগল আস্তে আস্তে।

বাড়ানো হাতটা ফিরিয়ে নিল সনি বাসিলি। হাসি মুছে গেছে। রানার প্রত্যাখ্যান ভাল লাগেনি হয়ত।

‘কি করে নিশ্চিত হল লোকটা যে আমিই হত্যা করেছি সোফিয়াকে?’ প্যাকেটটা পকেটে ঢোকাল সনি।

‘ক্যামেরা থেকে ফিল্ম ছিঁড়ে বের করে নিয়েছ তুমি। নতুন ভিক্ত অবকাশ-২

দশ কার্টন ফিল্মও সরিয়ে ফেলেছ। এটুকুই তার জন্যে যথেষ্ট।’

‘কাজটা যে কেউ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যে আমিই, তা কি করে বুঝল ফ্রেনজি?’

‘সূত্র ওই একটাই। এখানকার টেলিফোন নাম্বার।’

‘চটাশ’ করে নিজের দুই হাঁটুতে চাপড় মারল দানবটা।
‘অসম্ভব! এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। খুঁজলে সোফিয়ার অসংখ্য পুরুষ বন্ধু পাওয়া যাবে। যেমন তুমি। তুমি যে করনি কাজটা, প্রমাণ করতে পারবে?’

‘পারবো।’ মুখের ভেতরটা শুকিয়ে উঠল রানার। ‘কেন পারবো না?’

‘না, পারবে না। কারণ সে পথ নেই।’

‘কি বলতে চাও?’

‘বলতে চাই চাপা মারছ তুমি। তুমি ভালই জান, ওইদিন ঠিক ক’টা পর্যন্ত ক্লিফ হেডে ছিলে তুমি। তোমাকে দেখেই ওর ঘড়ির কাঁটা সোয়া আটটায় ফিল্ম করেছিলাম আমি।’

‘তার মানে তুমিই খুন করেছ সোফিয়াকে?’ পলকহীন চেঁয়ে আছে রানা।

‘অফকোর্স। বাট, আনঅফিশিয়ালি। রেকর্ডস বলবে কাজটা তুমি করেছ।’

‘আমি?’

‘হ্যাঁ। আমার হাতে দুয়েকটা নিশ্চিত প্রমাণ আছে। ওগুলো পুলিশের হাতে গেলেই তুমি শেষ।’

সোজা হয়ে বসল রানা। ‘যেমন? আর কি প্রমাণ...’

‘এক,’ ডান হাতের তর্জনী তুলল সনি। ‘ট্যুরিস্ট গাইড বুকটা।

বেলা ভিস্টার লাউঞ্জে ফেলে এসেছিলে ওটা তুমি। মনে আছে? ওটায় তোমার হাতের ছাপ আছে। দুই,' মধ্যমা তুলল সে, 'সেদিনকার পুনের টিকেটের কাউন্টার পার্টের ফটোকপিটা জোগাড় করেছি আমি। বুদ্ধি করে যদি রবার্ট হুইটনির নামে করতে টিকেট, তাহলে হয়ত বেঁচে যেতে। কিন্তু তা তুমি করনি। করেছ নিজের নামে।'

নিজের হিপ পকেটে টাকা দিল সনি। 'ফটোকপিটা এখন আমার মানিব্যাগে। এবং তিন,' এবার অনামিকা তুলল। 'ওপরে তোমার যে সুটকেসটা আছে, কাল অথবা পরশু ওটা সরেনটোয় খুঁজে পাবে পুলিশ। বেলা ভিস্টার আশপাশের কোন ঝোপঝাড়ে। ওর মধ্যে সোফিয়ার ক্যামেরা আর হারানো ফিল্মগুলোও পাবে তারা। সুটকেসেও কেবল তোমার হাতের ছাপই পাওয়া যাবে। তোমার বাংলো থেকে ওটা আমি বয়ে এনেছি ঠিকই, কিন্তু সে সময় আমার হাতে গ্লাভস ছিল। এর মানেটা নিশ্চয়ই বোঝো তুমি? কি বল, এরপর কি ফ্রেনজির মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে সোফিয়ার খুনীর পরিচয় সম্পর্কে?'

সাত

মাথা কাজ করছে না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। মনে পড়ে গেল, বেড়ালের সুপের বাটি উল্টে ফেলার আওয়াজ শুনে তিক্ত অবকাশ-২

ব্যাপার কি দেখার জন্যে বেলা ভিসটার কিচেনে গিয়েছিল ও।
বেরিয়ে আসার সময় গাইড বইটা ছুঁড়ে ফেলেছিল লাউঞ্জের একটা
টেবিলের ওপর। পরে ওটার কথা বেমানুম ভুলেই গিয়েছিল।

আর পুনের টিকেটটাও নিজের নামেই করেছিল রানা। তখন
কি আর ছাই ভেবেছিল যে...। কিন্তু এ ব্যাটার মতলবটা কি
আসলে? ওর বিরুদ্ধে এত প্রমাণ জোগাড় করে বসে আছে কিসের
আশায়? রানাকে ফাঁসাবে বলে? উঁহু, মিলছে না। তাহলে আরও
আগেই এসব তুলে দিতে পারত লোকটা ফ্রেনজির হাতে। তা সে
দেয়নি। কেন?

‘এগুলো ছাড়াও পুলিশের যদি আরও কোন প্রমাণ দরকার হয়,
তা-ও সরবরাহ করা হবে তাদের,’ আবার বলে উঠল সনি। রানার
অবস্থা টের পেয়ে মজা পাচ্ছে খুব। ‘তোমাকে একটা চিঠি
লিখেছিল সোফিয়া ক্লিফ হেড থেকে উড়াল দেবার একটু আগে।
ওটাও তুলে দেব আমি পুলিশের হাতে।’

বাজে কথা! কাঁপা কাঁপা হাতে আরেকটা সিগারেট ধরাল
মাসুদ রানা। মেয়েটি ভালই জানত, ওরই সেট করা শিডিউল
অনুযায়ী রানা আগেই পৌছে গেছে সরেনটো। কাজেই ওই সময়
চিঠি লেখার প্রশ্নই আসে না। ব্যাপারটা ভাঁওতা। অবশ্য সেট
আপটা যদি ওর অজান্তে পরে পাল্টে গিয়ে থাকে, সে আলাদা
কথা।

নিম্পলক চোখে সনি বাসিলির দিকে চেয়ে থাকল রানা। কি
চায় লোকটা? কেন লেগেছে ওর পিছনে?

‘কেন আমাকে চিঠি লিখেছে সোফিয়া?’ কোলাব্যাণ্ডের
আওয়াজ বেরোল ওর গলা দিয়ে।

‘আমি বলেছি বলে । তোমাদের সরেনটো যাওয়ার প্ল্যান-প্রোগ্রাম ইন ডিটেলস আছে ওতে । তোমরা যে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস রবার্ট হুইটনি নামে বেলা ভিসটা ভাড়া করেছ, তা-ও আছে ।’

এত কিছুর আসলে কোন প্রয়োজন ছিল না, ভাবছে রানা । প্লেনের টিকেটটাই এজন্যে যথেষ্ট । ‘বুঝলাম । কিন্তু আমার জন্যে এত কষ্ট করার কি প্রয়োজন পড়ল তোমার? কি চাও আমার কাছে?’

চেয়ার ছাড়ল সনি বাসিলি । এগিয়ে গেল লাউঞ্জ আর হলরুমের মাঝখানের দরজার দিকে । ছোট একটা টেবিল রয়েছে ওখানটায় । প্রকাণ্ড এক ফুলদানি ভর্তি এক ধরনের গোলাপি লাল রঙের ফুল, সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার ওপর । পাশেই সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো বড় একটা ছবি—একটি মেয়ের । কিন্তু এখান থেকে চেহারা দেখা যায় না মেয়েটির । টেবিলটার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা । তার কোণে নিতম্বের ভর চাপিয়ে বসল । ‘বেশ কিছুদিন ধরে একজন কাজের মানুষ খুঁজছিলাম আমি,’ বলল সে । ‘কিন্তু পাচ্ছিলাম না । এ কাজ আবার যাকে-তাকে দিয়ে হয় না । কি করা যায় ভাবছিলাম । এমন সময় হঠাৎ একদিন সোফিয়ার মুখে তোমার কথা শুনেই বুঝলাম, এতদিন মনে মনে আসলে তোমার মতই একজনকে খুঁজছিলাম আমি । সাংবাদিকদের সবাই সমীহ করে, একটু অন্য চোখে দেখে ।’

‘ভাষণ বন্ধ করে আসল কথায় এলে হয় না?’ বলল রানা ।

‘বলছি । কষ্ট করে ফ্রেঞ্চ ফ্রন্টিয়ারের নিসে একটা পার্সেল নিয়ে যেতে হবে তোমাকে । খুব সোজা কাজ । তোমার যে আইডেন্টিটি, তিঙ্ক অবকাশ-২

তাতে কেউ তোমাকে চেক করার কথা চিন্তাই করবে না।
পার্সেলটা সেখানে বিক্রি করে ক্যাশ নিয়ে ফিরে আসবে।’

‘এ তো খুব সোজা কাজ দেখছি। জিনিসটা কি?’

কপাল কুঁচকে গেল সনির। দু’হাত বুকে ভাঁজ করে দাঁড়াল
সে। রানা ঠাট্টা করছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওর
চেহারায তেমন কোন লক্ষণ না দেখে আশ্বস্ত হল। বলল, ‘সে
তোমার না জানলেও চলবে। তবে কাজটা খুবই সহজ, সত্যি
বলেছি। সোজা গাড়ি চালিয়ে নিস যেতে হবে তোমাকে। যে নাম
বলে দেব, সেই হোটেলে এক রাত থাকবে। যাওয়ার আগে
তোমার গাড়ির এক বিশেষ জায়গায় পার্সেলটা প্রেস করে রাখব।
ওখানে আমার পার্টি কালেক্ট করে নেবে তা, তোমার কিছু করতে
হবে না। টাকাটাও তোমার রুমে পৌঁছে দেবে সে। পরদিন ভোরে
হোটেল ছেড়ে রোম রওনা হবে তুমি।’

‘হঠাৎ আমাকে কেন দরকার হল?’ বলল রানা। ‘এতদিন যে
করত কাজটা, সে...’

‘এদেশে একাজ আগে করিনি আমি। রোমে এসেছি
অল্প কিছুদিন আগে। মাত্র কন্ট্যাক্ট পাকা করেছি।’

‘আসতে না আসতেই হয়ে গেল লাইন?’

‘হবে না? এ কি খুব কঠিন কাজ? কথায় বলে না, মানিকে
রতন চেনে...’

‘শুয়োরে চেনে কচু।’ সনির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে
উঠল মাসুদ রানা।

‘কি বললে?’

‘না, কিছু না। যদি কাজটা না করি, তাহলে? প্রমাণগুলো

তুলে দেবে পুলিশের হাতে, এই তো?’

মিলে যাচ্ছে সবকিছু। এ-ই সম্ভবত আলবার্তো ফেলিনির হত্যাকারী, ভাবল মাসুদ রানা, ইটোলা গ্র্যান্ডির গানম্যান। নিউ ইয়র্ক পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে এদেশে এসে, উঠেছে বসের মেয়ের আশ্রয়ে। খুব সম্ভব, আপন মনে মাথা দোলাল ও, খুবই সম্ভব।

ওর মাথা দোলানো দেখে বলল লোকটা, ‘কি ব্যাপার? একা একা কথা বলছ নাকি?’

‘জাস্ট থিঙ্কিং অ্যালাউড। ধর কাজটা করে দিলাম তোমার। তারপর?’

‘তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট উপচে পড়বে। দু’দিন পর হয়ত তুমি নিজেই আমার সাথে যোগাযোগ করবে এধরনের আরেকটা ট্রিপ পাওয়ার আশায়।’

‘ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে সাথে আমার বাড়িতেও যখন পুলিশ উপচে পড়বে, তখন কি হবে?’

‘হাঁদার মত কথা বল না। আমি রোম অ্যাকাউন্টের কথা বলছি না। বলছি সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের কথা। মাল নিয়ে নিস রওনা হওয়ামাত্র ওদেশে তোমার নামে অ্যাকাউন্ট ওপেন হবে।’

‘পয়সা দিয়েই যখন কাজটা করাবে, তখন আমাকে অনর্থক খুনী বানাবার এত চেষ্টা কেন? সরাসরি অফসর দিলেই তো পারতে।’

‘পারতাম! কিন্তু না চাইতেই সুযোগটা যখন এসে গেল, ছাড়ি কেন? তাছাড়া ওতে ঝুঁকি ছিল। তোমার রাজি না হওয়ার চান্স ছিল। এখন তা নেই। কাজটা না করে দিয়ে উপায় নেই তিষ্ঠ অবকাশ-২

তোমার।’

‘আই সী! কিন্তু সুযোগটা এল কি করে? আমাদের প্ল্যান সোফিয়া ইচ্ছে করেই জানিয়েছে তোমাকে?’

‘উঁহু! মুখ ফসকে বলে ফেলেছে,’ বলেই হেসে উঠল সনি বাসিলি। ‘হাঁদা মেয়ে, বুঝলে? বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারেই ছিল না। বলে কি না, তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে। প্রেমে পড়ে গেছে তোমার। সে কি কান্না সেদিন, যদি দেখতে! বলে, নেশা ছেড়ে দেবে। ভাল হয়ে যাবে। তোমাকে বিয়ে করে সুখী হবার চেষ্টা করবে,’ হো হো করে হেসে উঠল দানব।

প্রচণ্ড রাগে সারা শরীর জ্বলে উঠল রানার। ইচ্ছে করছে বুক ফেড়ে ওর নোংরা কলজেটা একটানে বের করে নিয়ে আসে খাঁচা থেকে। গলাটা যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল ও। ‘ভাল হয়ে যেতে চেয়েছিল বলেই খুন করতে হল ওকে?’

‘তা...একরকম তা-ই বলতে পার। সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে ভিলা ভাড়া করল সরেনটোয়, নিরিবিলিতে তোমার সাথে দুটো দিন কাটাবার জন্যে। প্রাক-বৈবাহিক মধুচন্দ্রিমা আর কি, বুঝলে না?’ নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগল সনি।

‘এ দেশে কার আওরে কাজ করছ তুমি? সারা গ্র্যান্ডি, না ইটোলা গ্র্যান্ডি?’

চট করে মুখ বুজে ফেলল লোকটা। পরক্ষণেই বিস্মিত হওয়ার ভান করল। চোখ কপালে তুলে বলল, ‘আরি বাপরে! সাংবাদিক সাহেব দেখছি অনেক খবরই জেনে গেছে!’ টিটকিরির সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল, ‘কেন, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিতে চাইছ?’

‘ক্রিফ হেডে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই সোফিয়া তোমাদের ছবি তুলে

ফেলেছিল, কি বল? ওই জন্যেই ফিল্মটুকু ছিঁড়ে বের করে ফেলার প্রয়োজন পড়েছিল?’ উত্তেজিত হয়ে উঠল মাসুদ রানা। দু’হাত কাঁপছে একটু একটু। শুকিয়ে উঠল গলা।

উত্তর দিল না সনি বাসিলি। চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে একভাবে। বাঁকা হাসি মুখ থেকে মুছে গেছে বেমালুম।

চট করে আরেকটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল রানার। ‘ওই পাহাড়ের দ্বিতীয় ভিলাটা কার, ইটোলা গ্র্যানডির?’

‘না হে! চেয়েছিলাম সুখ-দুঃখের আলাপ করব, এখন দেখছি তুমি কেবল দুঃখেরই গান গাইছ। সুখের ছিটেফোঁটাও নেই ওতে। সে যাকগে, তোমার ভালর জন্যে বলছি, এসব নিয়ে বেশি ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে যেয়ো না। জানে বাঁচবে না। এবার বল, নিসে যাচ্ছ?’

চেয়ার ছাড়ল রানা। মুখের ভাব দেখে মনে হয় বুঝি চিন্তায় পড়ে গেছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। পায়চারি শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে বার-দুয়েক ঘুরে এল টেবিলটার কাছ থেকে। দু’বারই ফ্রেমে বাঁধানো বড় ছবিটার ওপর নজর বুলিয়ে নিল ও। যা ভেবেছিল, তা-ই। সারা গ্র্যানডির ছবি ওটা।

বড় একটা লাউজিং চেয়ারে বসে আছে মেয়েটি। পরনে সুইম সুট। মাথার ওপর বড় একটা রংচঙে ছাতা। ছবিটার ব্যাপারে একটা কিছু মনে পড়বে পড়বে করেও পড়ছে না। আসলে ওটার দিকে মন নেই রানার। ও খুঁজছে যা হোক একটা কিছু অস্ত্র—বেরোবার আগে দু’চার ঘা দিয়ে যেতে হবে সনিকে।

ফুলদানিটার কথা খেয়াল হতেই থেমে দাঁড়াল রানা। হ্যাঁ, মনে মনে বলল, ওটা দিয়েই চমৎকার কাজ হবে। সনির চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, ‘আর তো কোন পথ দেখছি না।’

‘তার মানে কাজটা করছ?’ সোজা হয়ে দাঁড়াল সনি বাসিলি।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘করতেই হবে।’ এর ব্যাপারে আরও ভাল করে খোঁজখবর নিতে হবে, ঠিক করল ও।

‘দ্যাট’স দ্য বয়,’ দাঁত বেরিয়ে পড়ল লোকটার। ‘জানতাম, রাজি না হয়ে উপায় নেই তোমার। তাহলে শোন, আগামী শনিবার রাতে তোমার বাংলোয় আসব আমি। গ্যারেজ বা গাড়ি কোনটাই লক কোরো না। খোলা রেখ, পার্সেল প্ল্যান্ট করব আমি। পরদিন খুব ভোরে রওনা হবে তুমি, প্রথমে যাবে জেনেভা। রাতটা ওখানে কাটিয়ে পরদিন যাবে নিস। সময়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সন্কে সাতটায় ফ্রন্টিয়ার পেরোতে হবে তোমাকে। ফ্রন্টিয়ার গার্ডদের সাপারের সময় ওটা। ওই সময় তুমি হাজির হলে বরং বিরক্ত হবে ওরা, চেক না করেই ঠেলে পার করে দেবে সীমানা। নিসের সোলেলি ডি’ওর হোটেলে উঠবে। হোটেল গ্যারেজে রাখবে গাড়ি, তারপর ভুলে যাবে ওটার কথা। গট দ্যাট?’

‘পানির মত।’

‘তবে উল্টোপাল্টা কিছু করতে যেয়ো না। ডবলক্রস করতে যেয়ো না।’ চোখের দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল সনির। ‘তোমাকে আমি কোথায় বেঁধেছি মনে থাকে যেন।’

‘সে আমার মনে থাকবে। কিন্তু এর মধ্যে যদি ফ্রেনজি অন্য কোনভাবে টের পেয়ে যায় যে সোফিয়ার মৃত্যুর সময় আমি বেলা ভিসটায় ছিলাম?’

‘করুক আগে প্রমাণ,’ বলল সনি। ‘তেমন বুঝলে তোমার জন্যে একটা ফুলফ্রফ অ্যালিবাইর ব্যবস্থা করব আমি। অ্যালিবাই

তৈরি করার ওস্তাদ আমি। আমার কথামত যতদিন চলবে, ততদিন এ নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। আগে তোমার কাজ দেখি। বলা যায় না হয়ত ভবিষ্যতে তোমাকে আমাদের সুইস প্রতিনিধি করে দেয়া হতে পারে।’

‘আমার ভবিষ্যৎও ভেবে ফেলেছ এর মধ্যে?’

‘মন্দ কি? বাদ দাও। কাজ আছে আমার। বেরোতে হবে। তাহলে কথা রইল, যেভাবে বললাম, সেইভাবে কাজ করবে। ওকে?’

‘হ্যাঁ।’

রানাকে টেবিলের দিকে সরাসরি এগোতে দেখে চট করে সরে দাঁড়াল সনি, ওর আয়ত্তের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। দূর থেকে লক্ষ্য করছে ওকে।

ছবির ফ্রেমটা তুলে নিল রানা। সারা গ্র্যানডি-ই। তবু জিজ্ঞেস করল, ‘কে মেয়েটা? তোমার গার্ল ফ্রেন্ড নাকি? এ-ও ড্রাগস নেয় মনে হচ্ছে?’

‘রেখে দাও ওটা!’ তীক্ষ্ণ গলায় প্রায় চৈঁচিয়ে উঠল সনি। ‘রাখো!’

বোকা বোকা করে তুলল রানা চেহারাটা। ‘কি ব্যাপার! রাগ করার...’

দুর্বোধ্য কিছু একটা বলল দানবটা। চট করে এগিয়ে এসে ডানহাতে ধরে ফেলল ফ্রেমটা। ‘বলছি রেখে দাও!’ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু সুযোগ হল না।

বিদ্যুৎবেগে প্রকাণ্ড ফ্লাওয়ার ভাসটা তুলে নিয়েছে রানা ফ্রেমটা ছেড়ে দিয়েই, ঘুরে দড়াম করে মারল ওটা দিয়ে তার মাথার পাশে। ‘ঠকাশ’ করে প্রচণ্ড আওয়াজ উঠল। আপাদমস্তক কেঁপে তিক্ত অবকাশ-২

উঠল লোকটার 'থর থর' করে। ফ্রেমটা ধরে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল মূর্তির মত, দু'চোখ বিস্ফারিত। সামনে পেছনে দোল খেল দেহটা কয়েকবার। তারপর 'ধড়াশ' করে আছড়ে পড়ল ফ্লোরে মুখ খুবড়ে। চুরমার হয়ে গেল সারা গ্র্যানডির ফটো ফ্রেমের কাঁচ।

পড়েই দুর্বল হাতে রানার পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল সনি বাসিলি। ঝটকা মেরে পা'টা ছাড়িয়ে নিয়ে ধাঁই করে কড়া এক লাথি বসিয়ে দিল ও তার থুত্নির ওপর। 'খট্টাশ' করে বাড়ি খেল দু'পাটি দাঁত। চিত হয়ে পড়ে গেল সনি, উল্টে গেছে চোখের মণি। জ্ঞান হারিয়েছে দানব।

এগিয়ে এল এবার মাসুদ রানা। ভারি দেহটা পা দিয়ে ঠেলে কাৎ করল। ঝুঁকে বাঁ হাতের দুটো আঙুল তার হিপ পকেটে ভরে দিল ও। কিন্তু জমে গেল একটা নারীকণ্ঠের ধমক কানে যেতে।

‘হোল্ড ইট!’

ঝট করে ঘুরে তাকাল রানা। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সারা গ্র্যানডি। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে পেন্‌চিয়ে ধরে আছে ইভনিং ব্যাগটার চামড়ার ফিতে। ডান হাতে একটা পয়েন্ট থ্রি এইট অটোমেটিক। নলের ছোট্ট গোল ফুটোটা লোভীর মত চেয়ে আছে রানার মাথার দিকে। অনেকক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। সারার ঠাণ্ডা দৃষ্টি দেখে বুঝল রানা, বিন্দুমাত্র উৎসাহ পেলেই গুলি করে বসবে মেয়েটি। অস্ত্র ধরার ভঙ্গি দেখে মনে হল, এ কাজে বহুদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। নিজের অস্ত্র বের করার কোন সুযোগ দেবে না তাকে মেয়েটি। অতএব সে চিন্তা বাদ। বসেই থাকল রানা মূর্তির মত, দু'আঙুল সনির পকেটে রয়েছে এখনও।

‘সরে যাও ওর কাছ থেকে, সেনর!’ তীক্ষ্ণ গলায় বলল আবার সারা গ্র্যানডি। মাথা ঝাঁকিয়ে কপালে লেপ্টে থাকা দু’তিন গোছা ভেজা চুল সরিয়ে দিল। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা মোহনীয়, যে-কোন পুরুষকে প্রলুব্ধ করবে।

উঠে দাঁড়াল রানা ধীরে ধীরে। সরে দাঁড়াল দু’পা। এই সময় নড়ে উঠল সনি বাসিলি। গড়ান দিয়ে উপুড় হল, তারপর হাঁটু আর দু’হাতে ভর দিয়ে বসল। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। তারপর উঠে দাঁড়াল। মুখ-চোখ বিকৃত করে মাথার আঘাত পাওয়া জায়গাটা টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখল। আরেকবার মাথা ঝাঁকিয়ে রানার দিকে তাকাল লোকটা। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, জানে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে সনি।

কিন্তু তা সে করল না। উল্টে দাঁত বের করে হাসির ভঙ্গি করল। মাথা ডলতে ডলতে বলল, ‘এই ছিল তোমার মনে চিন্তাই করিনি। ওহ, গড! মাথাটা ভর্তাই করে দিয়েছিলে আরেকটু হলে। কিন্তু কেন? ...ও, বুঝলাম। তুমি ভেবেছ ফটোকপিটা সত্যি সত্যিই পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি?’

কথা বলল না রানা।

‘কি হচ্ছে আমার এখানে?’ অধৈর্য কণ্ঠে বলল সারা। দৃষ্টি বা অস্ত্র, কোনটাই রানার ওপর থেকে সরায়নি সে।

‘নিসের নতুন চালান বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বহু কষ্টে রাজি করলাম ওকে। আলাপ করতে করতে হঠাৎ...’

‘মুখ ছেড়ে হাতের আলাপ শুরু করে দিয়েছ দু’জনে, এই তো?’ ঝাঁঝিয়ে উঠল সারা। ‘চেয়ে দেখ, কি বিচ্ছিরি অবস্থা করেছে ঘরের। যাও! এক্ষুণি পরিষ্কার কর সব!’

‘করছি। রাগ কোরো না। আগে একে বিদেয় করে নিই।’
রানার দিকে ফিরল সনি। ‘যাও, সেনর। আর কোন অ্যাকশন
দেখাতে যেয়ো না। আর প্ল্যানের কথা ভুলে যেয়ো না যেন। দিন-
তারিখ মনে রেখ,’ দরজার দিকে ইশারা করল সে। ‘যাও।’

পা বাড়াল রানা কোন কথা না বলে। সারার পাশ কাটিয়ে
বেরিয়ে যাবে। ওকে জায়গা দেবার জন্যে এক পা সরে দাঁড়াল
মেয়েটি। পরক্ষণেই রানার প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে উড়ে গিয়ে
সনির ওপর আছড়ে পড়ল, সারার অটোমেটিকটা ততক্ষণে চলে
গেছে রানার হাতে। ওদিকে সারার ধাক্কা খেয়ে ভারসাম্য
পুরোপুরি হারিয়ে ফেলল সনি বাসিলি, পড়ে যাচ্ছে সে চিত হয়ে,
এক হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে মেয়েটিকে।

যে চেয়ারটায় বসে ছিল সনি, সেটার ওপর-ই পড়ল দু’জনে
মিলে। ‘মড়াৎ’ করে ভেঙে গেল চেয়ারটা—ছড়মুড় করে পড়ল
ওরা সবসুদ্ধ।

অটোমেটিক ধরা হাতটা সামান্য উঁচু করল মাসুদ রানা। সারা
সরে গেছে সনির বুকের ওপর থেকে। অস্ত্রটা হাতছাড়া হতেই সব
সাহস উবে গেছে মেয়েটির—ভীত চোখে চেয়ে আছে রানার
দিকে।

সনির অবস্থাও অনেকটা একই রকম। চোখের পলকে এভাবে
পাল্টে যাবে পরিস্থিতি, ভাবেনি সে। দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে
সামান্য উঁচু হয়ে আছে লোকটা। চেয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে।
ওদের সামলে নেয়ার জন্যে কয়েক মুহূর্ত সময় দিল রানা। তারপর
বলল, ‘আমার পিছনে লেগে ভাল করোনি তুমি। একদিন এজন্যে
আফসোস করতে হবে। আর এরপর যখন আমার মুখোমুখি হবে,

ভদ্র আচরণ করার চেষ্টা করবে। নইলে এরপর কান ছিঁড়ে নেব তোমার।’

অটোমেটিকটা টেবিলের ওপর রেখে দৃঢ় পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। দরজাটা টেনে বন্ধ করতে যাবে, এই সময় সনির গলা শুনতে পেল।

‘প্লেনের টিকেটটার কথা মনে রেখ, বন্ধু। নইলে তোমাকেও আফসোস করতে হবে,’ বলেই অটুহাসিতে ফেটে পড়ল সনি বাসিলি।

দড়াম করে দরজা লাগিয়ে বেরিয়ে গেল রানা।

আট

সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে নীল রেনল্টটা। ওটার পিছনে সারার ক্যাডিলাক। গাড়ি দুটোকে পাশ কাটিয়ে এগোলো রানা, হন হন করে হাঁটতে লাগল গেটের দিকে। এতটুকু কমেনি বৃষ্টির বেগ। সমান তালে ঝরছে। ব্যাঙের আনন্দ-কোরাসের ঠ্যালায় কান ঝালাপালা।

দ্রুত স্টেডিয়াম পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে উঠল রানা। ওপারে কেবল লিঙ্কনটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে, অন্য গাড়িগুলো চলে গেছে। সামনে দিয়ে একটা পুলিশ স্কোয়াড কার ছুটে গেল পানি ছিটিয়ে।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর রানাও ছুটল। স্কোয়াড কারের পিছন পিছন চলল বাংলোর দিকে।

ঠিক পৌনে একটায় বাংলায় পৌঁছুল ও। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই টেলিফোনের কাছে এসে বসল। ফোন করল গুইসেপ ম্যালেট্রির বাসায়। সাথে সাথেই সাড়া দিল লোকটা। যেন জানত ফোন করবে রানা, তাই বসে ছিল ফোনের পাশে।

‘হ্যালো?’

‘যে নীল রেনল্টটার নাম্বার আপনাকে দিয়েছিলাম, ভেইল পাওলো ভেরোনেসের ভিলা প্যালেস্ট্রায় আছে ওটা,’ বলল রানা। ‘এক্ষুণি লোক পাঠান ওখানে। গাড়িটা কখন কোথায় যায়, কমপ্লিট রিপোর্ট চাই আমি। আপনার লোককে বলে দেবেন ওটাকে হারানো চলবে না।’

ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রাইভেট গোয়েন্দা। ‘তাই নাকি, তাই নাকি? ঠিক আছে, সেনর। কোন চিন্তা নেই। এখনই ব্যবস্থা করছি আমি।’

‘আমার জন্যে আর কোন খবর আছে?’ জানতে চাইল রানা।

‘আশা করি কাল সকালে কিছু খবর জানাতে পারব, সেনর।’

‘ঠিক আছে। কিন্তু আমার এখানে আপনাকে আসতে হবে না।’

‘তাহলে? রিপোর্ট করব কোথায়?’

‘সকালে ফোনে জানাব আমি কোথায় দেখা করবেন, ওকে?’

‘অ্যাজ ইউ উইশ, সেনর।’

ফোন রেখে দিল মাসুদ রানা। বলা যায় না, সনি হয়ত এখন সার্বক্ষণিক নজর রাখবে ওর ওপর। ম্যালেট্রিকে এখানে আসতে দেখলেই সতর্ক হয়ে যাবে।

ভেজা কাপড়-চোপড় বাথরুমে রেখে একটা ঢোলা পাজামা-

গেঞ্জি সেট পরল রানা। চুল মুছে ব্রাশ করে বেরিয়ে এল।
ক্যাবিনেট থেকে আধ গ্লাস হুইস্কি ঢেলে অন্ধকার বারান্দায় এসে
বসল ও। ঘুসি খাওয়া চোয়াল আর লাথি খাওয়া শিরদাঁড়া ব্যথায়
টন টন করছে। জালে আটকে গেছে ও, এ বাঁধন থেকে মুক্ত
করতে হবে নিজেকে। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কেন যেন মনে হচ্ছে সময় বেশি পাওয়া যাবে না। পুরো
ব্যাপারটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হচ্ছে এখন ওকে। সনির
কথাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল ও। সোফিয়া
শেরম্যান তাহলে ভালবেসে ফেলেছিল রানাকে? ওর প্রেমে
পড়েছিল?

শুধু তা-ই নয়, সনি নিজেই বলেছে, ভাল হয়ে যেতে
চেয়েছিল সে শেষ সময়ে। ফিরে যেতে চেয়েছিল সুস্থ জীবনে।
কিন্তু সে সুযোগ পায়নি সোফিয়া। না, হল না। পায়নি নয়, বরং
দেয়া হয়নি। তার আগেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে
মেয়েটিকে। চিরতরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে পৃথিবী থেকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা অজান্তেই। বেচারি! সোফিয়া
পাপ ছাড়তে চাইলেও পাপ তাকে ছাড়েনি। কৃতকর্মের ফল কড়ায়
গণ্ডায় আদায় করে ছেড়েছে সে। সোফিয়ার শেষ ক'টা দিনের
আচার-আচরণ মনে করার চেষ্টা করল রানা। সত্যিই, হঠাৎ করেই
কেমন যেন পাল্টে গিয়েছিল মেয়েটি। সহজে ছাড়তে চাইত না
রানাকে। একভাবে তাকিয়ে থাকত ওর দিকে। ধরা পড়ে গেলে
মুখ নামিয়ে নিত লজ্জা পেয়ে। অথচ আশ্চর্য! তখন লক্ষ্যই করেনি
মাসুদ রানা। ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছে ততই খারাপ লাগছে।
আফসোস হচ্ছে তখন কেন খেয়াল করেনি ভেবে। কি করত ও
ভিক্ত অবকাশ-২

তাহলে? নিজেকে প্রশ্ন করল রানা, জানলে কি হত?

হত...কি আর হত! সোফিয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করত রানা, ওটাও আরেকটা নিষিদ্ধ, সর্বনাশা নেশা। এ পথ তার ত্যাগ করা উচিত। কারণ কারও বাঁধনে নিজেকে জড়ানোর যোগ্যতা মাসুদ রানার নেই।

কিন্তু খটকাটা দূর হচ্ছে না মন থেকে। নেশা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল, মাসুদ রানাকে বিয়ে করে সুখি হতে চেয়েছিল, কেবল এই অপরাধেই হত্যা করা হল সোফিয়াকে? কিন্তু তাহলে বার ফুট ফিল্ম উধাও হওয়ার কি কারণ? কি রহস্য আছে এর পিছনে? সোফিয়াকে হত্যা করলেই যদি ঝামেলা মিটে গিয়ে থাকে, তাহলে ফিল্ম গায়েব করে ফেলা কেন?

নাহ, মাথা দোলাল রানা। এ অসম্ভব। নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে এর ভেতরে। হতে পারে, হয়ত এমন কিছু আপত্তিকর দৃশ্যের ছবি তুলেছিল সোফিয়া, যা সনি বা ইটোলা গ্র্যান্ডির জন্যে মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারত। সম্ভবত ব্যাপারটা কোনভাবে টের পেয়ে যায় ওরা। এবং ফিল্মটুকু কেড়ে নেয়ার সময় সোফিয়া বাধা দিলে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় সনি ক্লিফ থেকে। চিরতরে বিদেয় করে দেয় আপদ। তার পরেরটুকু সহজ। এক্সপোজড বার ফুট ফিল্ম ছিঁড়ে বের করে নিয়ে ক্যামেরাটাও নিচে ফেলে দেয় সে।

তা-ই হবে, ভাবল মাসুদ রানা। ওপর থেকে দেখা যায় ওই পাহাড়ের দ্বিতীয় ভিলাটা। রানা যেখান থেকে ওটাকে দেখেছে, ওখানে দাঁড়িয়েই হয়ত ওই ভিলার অধিবাসীদের কোন নিষিদ্ধ চর্চার ছবি তুলেছিল সোফিয়া।

কিন্তু...আরও একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে। ফিল্মটা যদি সনি পেয়ে গিয়েই থাকে, তাহলে এখান থেকে কেন ক্যামেরাটা চুরি করতে গেল সে? শূন্য ক্যামেরা কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে লাগবে তার? ধরা যেতে পারে, বেআইনী পার্সেল বহন করার জন্যে রানাকে বাধ্য করতে এ কাজ করেছে সনি। রানা রাজি না হলে ওরই সুটকেসে ভরে রেখে আসবে ওটা বেলা ভিসটার আশপাশে, এবং পুলিশে ফোন করে জানিয়ে দেবে ওর মধ্যে সোফিয়ার ক্যামেরাটা আছে।

তাই কি? রানাকে বড়শিতে গাঁথার জন্যে তো এয়ারপোর্টে একটা টেলিফোন করাই যথেষ্ট। দিন-তারিখ-সময় উল্লেখ করলে টিকেটিং অফিসার-ই তো জানিয়ে দিতে পারত, হ্যাঁ, মাসুদ রানার নামে টিকেট ইস্যু করা হয়েছে ওইদিনকার রোম-নেপলসের অতটার ফ্লাইটে। তারপরও ক্যামেরাটা চুরি করার কি এমন দরকার পড়ল?

টেলিফোনের আওয়াজে চমক ভাঙল রানার। গ্লাসটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে এল। ওর সাড়া পেতেই চাপা উত্তেজিত গলা শোনা গেল ওইসেপ ম্যালেট্রির।

'রেনল্টটা পাওয়া গেছে, সেনর,' বলল সে। 'ওটার মালিকের নাম সনি বাসিলি। তাকে ফলো করে ভায়া ব্রেনটিনি এসেছি আমি এইমাত্র। এখানে থাকে লোকটা, একটা ওয়াইন শপের ওপরে তার অ্যাপার্টমেন্ট।'

'ওড! সনি কোথায়, ভেতরে?'

'না। কাপড় পাল্টে বেরিয়ে গেছে আবার মিনিট পাঁচেক আগে।'

‘আপনি থাকুন ওখানেই। আমি আসছি,’ বলেই দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল রানা।

ভায়া ব্রেনটিনি চেনা আছে রানার। ট্রাফিক স্বাভাবিক থাকলে এখান থেকে পনের মিনিট মত লাগে পৌঁছুতে। পথটুকু প্রায় উড়ে পেরিয়ে এল লিঙ্কন তিনভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে। জায়গাটা আধা বাণিজ্যিক আধা আবাসিক। তেমন চওড়া নয় রাস্তা।

হেডলাইট ডিপ করে ফুটপাথ ঘেঁষে এগোতে লাগল রানা ধীর-গতিতে। বাঁ দিকের দোকানগুলোর সাইনবোর্ড পড়ছে ও। একশো গজমত এগোতেই বোর্ডটা দেখতে পেল। একই সঙ্গে মোটা গোয়েন্দার ওপরও চোখ পড়ল। দোকানটার সামনের সরু শেডের নিচে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে হেলান দিয়ে।

আরও কয়েক গজ এগিয়ে গাড়ি রাখল রানা। বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ম্যালেট্রির সামনে। ‘সুনি ফিরেছে?’ বলল ও। রসুনের গন্ধের ভয়ে শ্বাস বন্ধ করে রেখেছে।

‘না, সেনর।’

‘বেশ। আপনি থাকুন এখানে। ওর অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করতে যাচ্ছি আমি।’

‘কাজটা বেআইনী, সেনর,’ বলল ম্যালেটি।

‘মনে করিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু বাধ্য হয়েই কাজটা করতে হচ্ছে আমাকে, সরি।’ দোকানটার একপাশ দিয়ে সরু একটা গলি চলে গেছে পিছনে। তার শেষ মাথায় সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। ওটাই সম্ভবত সনির অ্যাপার্টমেন্টের ওঠার পথ।

‘ওকে, দেন,’ অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ম্যালেটি। হাত ভরে দিয়েছে ট্রাউজারের পকেটে। একগোছা স্কেলিটন চাবি বের

করল, এগিয়ে দিল রানার দিকে। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, ‘ডোর লকটা আমি চেক করে দেখেছি, সেনর। খোলা তেমন কঠিন হবে না বোধহয়।’

মুচকে হাসল মাসুদ রানা। ‘ধন্যবাদ। এ কাজটাও কিন্তু বেআইনী, এই চাবির কারখানা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো।’

‘জানি। তবু রাখতে হয়।’

হাতটা সরিয়ে দিল রানা। ‘রেখে দিন। লাগবে না ওটা আমার।’

‘দরজা খুলবেন না?’ বিস্মিত হল ম্যালেডি।

‘অফকোর্স। তবে আমার নিজস্ব কায়দায়।’

লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে পা বাড়াল ও সিঁড়ির উদ্দেশে। লকটা দেখে বোঝা গেল, ঠিকই বলেছিল ম্যালেডি। উপযুক্ত জিনিস হাতে থাকলে হদ্দ আনাড়ীরও এক মিনিটের বেশি লাগবে না খুলতে।

রানার লাগল কয়েক সেকেণ্ড। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও, হাতে বেরিয়ে এসেছে ফ্ল্যাশ লাইটটা। এক রাতে পর পর দুটো অভিযান, ভাবল রানা, এখানেও ধরা পড়তে হবে না তো?

সামনেই ছোট্ট একটা প্যাসেজ। নাকটা কুঁচকে আছে রানার। ভেতরের বন্ধ বাতাসে ওয়াইন আর ঘামের বিশ্রী দুর্গন্ধ, তিষ্ঠানোই দায়। আরও একটা বিশেষ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে সেই সাথে— সিগারের।

প্যাসেজ পেরিয়ে বাঁ দিকে একটা বন্ধ দরজা দেখতে পেয়ে খুলল রানা। ছোট্ট একটা কিচেন, ভীষণ নোংরা। সিন্কে স্তুপ হয়ে পড়ে আছে কয়েকটা ছোট-বড় থালাবাটি এবং দুটো ফ্রাইং প্যান।

অসংখ্য মাছি ঘিরে রেখেছে ওগুলোকে। সিন্ধের পাশেই পড়ে আছে কয়েক টুকরো অভুক্ত রুটি আর সামান্য মাংস—ওগুলোরও একই দশা। ফ্ল্যাশ লাইটের আলো পড়তে অবস্থান ছেড়ে উড়াল দিল মাছিগুলো।

দরজা বন্ধ করে প্যাসেজ পেরিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের পিছনদিকে চলে এল রানা। পাশাপাশি দুটো দরজা, দুটোই বন্ধ। প্রথমটাকে ড্রইংরুম বলা যেতে পারে, টেকনিক্যালি। দামি এক সেট সোফা, পড়ে আছে অযত্ন অবহেলায়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছে রানা, একটা সিঙ্গেল সোফা বাদে অন্যগুলোয় পুরু হয়ে জমে আছে ধুলো—কতদিন ঝাড়মোছ করা হয়নি, কে জানে। এ ছাড়া আর কোন ফার্নিচার নেই এ ঘরে।

অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার সোফাটার সামনে ছোট্ট একটা টিপয়। কালো রঙের বড় একটা পাথরের অ্যাশট্রে রয়েছে তার ওপর। কি মনে হতে এগিয়ে গেল রানা ওটার দিকে, আলো ফেলল ফ্ল্যাশ লাইটের। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সাথে সাথে। দুটো সিগারের শেষাংশ পড়ে আছে। এই একই জিনিস খুঁজে পেয়েছিল রানা সরেনটোয়; ক্রিফ হেডে।

কয়েক সেকেণ্ড টুকরো দুটোর দিকে চেয়ে থাকল ও। তারপর বেরিয়ে এল। পাশেরটা বেডরুম। বেশ বড় রুমটা। মাঝখানে একটা ডবল বেড, এলোমেলো। বেডশীট এবং বালিশের কভার দুটোই তেল চিটচিটে। ওপাশে জানালা ঘেঁষে একটা ডবল সোফা এবং দুটো লাউঞ্জিং চেয়ার। চেয়ার দুটোর মধ্যখানে একটা ছোট্ট টেবিল। পাশাপাশি ছ'টা ওয়াইনের বোতল সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার ওপর। দুটো বোতল শূন্য।

গুইসেপ ম্যালেটি ।

‘কলোসিয়ামের মেইন এন্ট্রান্সে । ঠিক এগারটায় ।’

বাসায় ফিরেই রোম ইন্টারন্যাশনাল কল বুকিং-এ ফোন করল রানা । নিউ ইয়র্কের একটা নাম্বার দিয়ে শুধু বলল, ‘মোস্ট আরজেন্ট ।’

রিসিভার রেখে অস্থিরচিন্তে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল ও । ধরে এসেছে বৃষ্টি, ধীরে ধীরে কমে আসছে তেঁজ । একটা জানালা খুলে তার সামনে দাঁড়াল রানা । সিগারেট ধরাল । বিশ্বাদ হয়ে আছে মুখটা । মনের মধ্যে হাজারো চিন্তার ভিড় ।

সব ছাপিয়ে বার বার সোফিয়া শেরম্যানের কমনীয় মুখটা ভেসে উঠছে মনের আয়নায় । ওকে ভালবেসে ফেলেছিল মেয়েটি, ভাল হয়ে যেতে চেয়েছিল । কিন্তু তার আগেই পৃথিবী থেকে বিদেয় করে দেয়া হয়েছে ওকে, ভাবনাটা ত্যাগ করছে না রানাকে মুহূর্তের জন্যেও ।

ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল, টেলিফোন বাজছে । সিগারেট ফেলে ফোন ধরল ও ।

‘আপনার নিউ ইয়র্ক নাম্বার লাইনে আছে, সেনর । কথা বলুন,’ একঘেয়ে সুরে বলল অপারেটর ।

ও প্রান্ত থেকে ‘হ্যালো!’ কানে আসতেই বলল রানা, ‘শফিক? রানা ।’

‘জি জি, মাসুদ ভাই, বলুন,’ বলল রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখা প্রধান শফিকুর রহমান । ‘কোথেকে?’

‘রোম । কাগজ-কলম নিয়েছ?’

‘জি ।’

‘লেখ, নামঃ সনি বাসিলি...’

প্রমাণ করে যে এই লোকটিই হত্যা করেছে ফেলিনিকে। এখান থেকে গিয়ে তাকে হত্যা করেছে সে, এবং ফিরে এসেছে নির্বিঘ্নে।

তারিখটা জানতে হবে কবে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল। যদি এই ছয় দিনের মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে আর কিছু দরকার হবে না। খুব সহজেই প্রমাণ করা যাবে কে আলবার্তো ফেলিনির হত্যাকারী। টিকেটটা পকেটে পুরল রানা। হাসল মনে মনে। যে অস্ত্র দেখিয়ে ওকে হুমকি দিচ্ছে লোকটা, তাকেও সেই একই অস্ত্র দেখাবে ও প্রয়োজনে।

পকেটের চেইন বন্ধ করে ব্যাগটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিল রানা। ড্রয়ারটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। আরও মিনিট দশেক ঘুরঘুর করল ও, সন্দেহজনক সবজায়গাতেই চোখ বোলাল। কিন্তু আত্মহ জাগার মত তেমন আর কিছু পাওয়া গেল না।

বাইরে এসে দাঁড়াল রানা। বুক ভরে টেনে নিল মুক্ত ভেজা বাতাস। ফুসফুস থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিল শুয়োরের দুর্গন্ধ। মনটা বেশ উৎফুল্ল লাগছে, লড়াই করার মত যা হোক একটা কিছু পাওয়া গেছে অন্তত।

দ্রুত নেমে এল মাসুদ রানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছিল সম্ভবত ম্যালেটি। প্রথমে চমকে উঠল রানার দীর্ঘ ছায়া দেখে। তারপর অভিযোগের সুরে বলল, 'অনেক সময় নিয়েছেন, সেনর। চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন আমাকে।'

'এবার চিন্তামুক্ত হোন। বাড়ি ফিরে ঘুম দিন গিয়ে।'

দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল রানা। বাসায় ফিরে এখনই একটা টেলিফোন করতে হবে নিউ ইয়র্কে।

'সকালে কোথায় দেখা হবে, সেনর?' চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল

মেঝের প্রায় সর্বত্রই পড়ে আছে দলা দলা সিগারেটের ছাই। দুর্গন্ধে ভূঁতও পালাবে। বিছানায়, চেয়ারে, সোফায় ফেলে রাখা হয়েছে কয়েকটা নোংরা শার্ট-প্যান্ট। মনে হয়, মানুষ নয়, কোন শয়্যার বাস করে এ ঘরে। 'এত দুর্গন্ধ কোন মানুষের পক্ষে বেশিক্ষণ সহ্য করা সম্ভব নয়।

ঘরের সর্বশেষ ফার্নিচারটির ওপর নজর বোলাল এবার মাসুদ রানা। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে একটা ডেস্ক। তার ওপর পাহাড়ের মত জমে আছে এক গাদা খবরের কাগজ, সিনেমা ম্যাগাজিন এবং ন্যাংটো মেয়েদের ছবি।

ডানদিকে তিনটে ড্রয়ার। ওপরের দুটো ঠাসা রয়েছে সব পর্নো ম্যাগাজিনে। তৃতীয় ড্রয়ারটা খুলেই থমকে গেল রানা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সামনে। ভেতরে আলইটালিয়ার ছাপ মারা নতুন একটা ট্রাভেল ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগটা বের করল রানা। জিপ খুলে ভেতরে তাকাল।

কিছু নেই, একদম খালি। এবার পকেটগুলো হাতড়াতে শুরু করল। ধরেই নিয়েছে কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু সবশেষের পকেটটায় হাত দিতেই কিছু একটা বাধল রানার হাতে। টান মেরে জিনিসটা বের করে আনল ও। একটা প্লেনের টিকেট, আলইটালিয়ার। আনমনে ওটার দিকে চেয়ে থাকল রানা কয়েক মুহূর্ত।

তারপর কভার উল্টে নজর বোলাল ভেতরে। সনি বাসিলির নামে ইস্যু করা হয়েছে টিকেটটা। রুটঃ রোম-নিউ ইয়র্ক-রোম। ইস্যুর তারিখটা আজ থেকে ঠিক এক মাস আগের। ছয় দিন নিউ ইয়র্ক ছিল সনি, তারপর ফিরে এসেছে। যোগসূত্রটা সম্ভবত তিজ্রা অবকাশ-২

ছোট ছোট পায়ে মেইন এন্ট্রান্সের দিকে এগিয়ে আসছে গুইসেপ ম্যালেটি। আজ একটা কালো স্যুট পরেছে সে। নতুন না হলেও মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। শেভও করেছে আজ। মুখটা বেশ প্রাণবন্ত লাগছে। বাঁ বগলে একটা পোর্ট ফোলিও রয়েছে দেখা গেল। দাঁড়িয়ে পড়েছে ম্যালেটি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানার খোঁজে।

গাড়িতে বসে ছিল মাসুদ রানা। হাত তুলে লোকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হাসিমুখে পাশে এসে দাঁড়াল সে। ‘গুড মর্নিং, সেনর।’

‘মর্নিং। উঠে পড়ুন,’ গম্ভীর মুখে বলল রানা। হাত বাড়িয়ে ওপাশের দরজা খুলে দিল।

‘কোথায়?’ উঠে বসে কোটটা টেনেটুনে ঠিক করল ম্যালেটি। কোলের ওপর রাখল পোর্টফোলিওটা। এমনভাবে দু’হাতে ধরে আছে, দেখলে মনে হবে বুঝি বহুমূল্য হীরে-জহরৎ আছে ওতে। ছিনিয়ে নিতে পারে রানা।

রসুনের গন্ধে নাক কুঁচকে উঠতে যাচ্ছিল ওর, কোন রকমে সামলে নিল। বলল, ‘এখানে বসেই কথা বলা যাক। বলুন, কি কি

জানতে পেরেছেন।’

‘ওয়েল। আপনার নির্দেশমত দশজন গোয়েন্দা লাগিয়েছি আমি লা সেনরিনার ব্যাকথাউণ্ড জানার ব্যাপারে, সেনর,’ বলল ম্যালেডি। পোর্টফোলিওটা খুলে ভেতরে উঁকি দিল। ‘আই. আই. এ-র নামকরা অপারেটর তারা প্রত্যেকে। এখনও তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট আমি পাইনি, সেনর। তবে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু তথ্য আমি উদ্ধার করেছি অলরেডি।’

চিন্তিত ভঙ্গিতে বাঁ কানের লতি চুলকাল লোকটা। নড়েচড়ে বসল। ‘এ ধরনের কাজ করতে গেলে অনেক সময় অনেক গোপনীয়, অনেক...আই মীন আনপ্রেজেন্ট ফ্যাক্টস ফাঁস হয়ে পড়ে। আমাদেরও সেরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।’ ভেতর থেকে কয়েকটা টাইপ করা কাগজ বের করল সে। ‘একেবারে তৈরি করেই এনেছি রিপোর্টটা।’

এমনভাবে কথাগুলো বলল ম্যালেডি যেন নতুন একটা মহাদেশ আবিষ্কার করে এসেছে।

‘বলে যান,’ বলল রানা। ‘কি বলতে চাইছেন তা কম-বেশি আমিও জানি। তবে আপনাকে আরেকবার সতর্ক করে দেয়া দরকার যে কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি যা যা জানবেন, তার সবই গোপন রাখতে হবে। লা সেনরিনার বাবা খুবই প্রভাবশালী মানুষ। এসব যদি কোনভাবে জানাজানি হয় বিব্রতকর অবস্থায় পড়বেন তিনি। তার ফলটা আপনার বা আমার, কারও জন্যেই শুভ হবে না।’

‘সে কথা নতুন করে বলতে হবে না, সেনর। একবার বলেছেন, তাই যথেষ্ট। মনে আছে আমার। তবে আপনি নিশ্চয়ই তিষ্ঠ অবকাশ-২

জানেন, লেফটেন্যান্ট ভিটেলা ফ্রেনজিও ঘাঁটাঘাঁটি করছে এসব নিয়ে। আমি যা জেনেছি, সে-ও তা জানবে, কোন সন্দেহ নেই তাতে। হাতের কাগজগুলোয় দুটো টোকা মারল ম্যালেডি। 'আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বড়জোর আর তিনদিন। এর মধ্যেই সব জানা হয়ে যাবে তার।'

'কি করে বুঝলেন আপনি?'

রানার দিকে ঘুরে বসল লোকটি। কাগজগুলো রেখে হ্যাট নামিয়ে টাক চুলকাল। 'আপনি বোধহয় জানেন, সেনর, লা সেনরিনা ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিলেন? ইল সেনর ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান প্রচুর পয়সার মালিক, কিন্তু মেয়ের প্রয়োজনের দিকে ভদ্রলোকের একেবারেই খেয়াল ছিল না। হাত খরচের জন্যে খুব সামান্যই অর্থ দিতেন তিনি মেয়েকে। কিন্তু তাতে পোষাত না সেনরিনার। অন্য সব খরচ...সে যাক, আই রিথ্রেট টু টেল ইউ, এই আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে অনেককে ব্যাকমেইল করেছেন তিনি। নিজ দেশে তো বটেই, এদেশেও কয়েকজন তাঁর ব্যাকমেইলের শিকার হয়েছে বলে জানতে পেরেছি আমি।'

হঠাৎ করেই বুঝল মাসুদ রানা, লোকটা সম্ভবত ওর এবং সোফিয়ার সম্পর্কের কথা জেনে গেছে। এবং রানাকেও তার শিকার বলে ভাবছে, যে জন্যে কথা বলছে নাটকীয় ভঙ্গিতে।

'এ ব্যাপারেও অল্প-বিস্তর জানি আমি,' বলল ও। 'কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও দেননি আপনি। আমি জানতে চাইছি কি করে ফ্রেনজি...?'

'জাস্ট আ মিনিট, সেনর। এখনই বলব।' কাগজগুলো তুলল সে। 'এর মধ্যে কয়েকজনের নাম ঠিকানা আছে, এরা প্রায়

প্রত্যেকেই টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন লা সেনরিনাকে। পড়ে দেখুন তালিকাটা।' রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল লোকটা। ভাব দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে ওর মধ্যে ওর নিজের নামটাও রয়েছে।

সিগারেট বের করল রানা। নিজে একটা নিয়ে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল ম্যালেরিটর দিকে। কিন্তু সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল সে।

'আমি আমেরিকান সিগারেট পছন্দ করি না, সেনর। যদি অনুমতি করেন তো...' পকেট থেকে নিজের ব্র্যাও বের করল সে।

'শিওর।' সিগারেট ধরাল রানা। 'এই তালিকা জোগাড় করলেন কিভাবে?'

'ইল সেনর ব্রুনো মারকোনি, একজন নামকরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তাঁর সাহায্যে। এক সময় পুলিশে চাকরি করতেন সেনর মারকোনি। এ ধরনের স্পেশাল কাজে বিশেষজ্ঞ এবং ভে-রি এক্সপেনসিভ। অবশ্য তাঁর অর্গানাইজেশনটা ছোট, আমারটা বড়। ঠেকায় বে-ঠেকায় একে অপরকে সাহায্য করে থাকি আমরা সবসময়। এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চেয়েছিলাম আমি আপনার সমস্যার কথা ভেবে। এই রিপোর্টটা তাঁর-ই তৈরি। খুশি হয়েই কাজটা করে দিয়েছেন তিনি খেটেখুটে।'

'একই প্রশ্ন আবারও করতে হচ্ছে, সেই লোকই-বা কি করে জোগাড় করল এ তালিকা?' স্টিয়ারিঙের ওপর একহাতে দেহের ডর চাপিয়ে বসল মাসুদ রানা।

'তাঁর ওপর নির্দেশ ছিল লা সেনরিনার ওপর সারাক্ষণ নজর তিক্ত অবকাশ-২

রাখার। তিনি কি করেন, কোথায় যান ইত্যাদি লক্ষ রাখার।’

গলা শুকিয়ে গেল রানার। ‘কখন থেকে কার্যকর হয় এ নির্দেশ?’

‘তাঁর রোমে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই।’

‘কার নির্দেশে?’

‘দুঃখিত, সেনর। এটা আপনাকে জানাতে পারছি না। সেনর মারকোনিকে কথা দিয়েছি আমি এ ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করব বলে। কথা দিয়েছি বলেই তথ্যগুলো পেয়েছি তাঁর কাছে, নইলে আমার পক্ষে এসব জানা সম্ভব ছিল না।’

‘লোকটা কি সরেনটো গিয়েছিল সোফিয়াকে ফলো করে?’

‘না, যায়নি। তার ওপর রোমের বাইরে যাওয়ার কোন নির্দেশ ছিল না।’

‘আপনি বললেন তিনদিনের মধ্যে এসব তথ্য জেনে যাবে লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। কি করে আপনি জানলেন তা?’

‘সেনর মারকোনি নিজেই জানিয়ে দেবেন তাকে। আজই জানাতেন, কিন্তু আমার অনুরোধে প্রোথাম পিছিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন তিনি তিনদিনের জন্যে।’

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। ‘সে কেন লেফটেন্যান্টকে জানাতে যাবে এসব?’

‘কারণ তিনি ভাবছেন, হত্যা করা হয়েছে লা সেনরিনাকে,’ গলায় দুঃখ দুঃখ একটা ভাব ফোটাল ম্যালেট্রি। ‘পুলিসকে ইনফরমেশনগুলো জানানো কর্তব্য মনে করছেন’ তিনি। সময় বিশেষে একাজ আমরাও করে থাকি। এতে ওরাও ঠেকা-বেঠেকায় সাহায্য করে আমাদের।’

‘বুঝলাম, কিন্তু তাকে তিনদিন অপেক্ষা করার অনুরোধ কেন করেছেন?’

অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল গুইসেপ ম্যালেটি। টুপি নামিয়ে আবার টাক চুলকাল। কাগজগুলো হাতে নিয়ে আনমনে নাচাতে লাগল, যেন ওগুলোর ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। ‘আপনি যদি দয়া করে তালিকাটার ওপর এক পলক নজর বোলান, সেনর, তাহলেই বুঝবেন কারণটা কি। বলতে পারেন সময়টুকু আমি আপনার কথা ভেবেই আদায় করে নিয়েছি জোর করে।’

শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিল মাসুদ রানা। মানুষ, গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। কলোসিয়াম দর্শনার্থীদের কল-গুঞ্জন কোলাহলে পরিণত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও বাড়বে তা।

যেন এ-ও কেমন আছেন বা কোথায় যাচ্ছেন ইত্যাদি আর দশটা সাধারণ প্রশ্নের মতই, এমনভাবে জিজ্ঞেস করল রানা, ‘ওখানে আমার নামটাও আছে, তাই, এই তো?’

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল ম্যালেটি। ‘ইয়েস, সেনর। ইল সেনর মারকোনি জানতে পেরেছেন, সেনরিনা সোফিয়া যেদিন নিহত হয়েছেন, সেদিন নেপলস গিয়েছিলেন আপনি দুপুরের ফ্লাইটে। তাঁর ধারণা ওখান থেকে সরেনটো যান আপনি। আরও জানা গেছে, আপনাদের দু’জনের সম্পর্কটা খুবই ক্লোজ ছিল। সেনরিনাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে লাঞ্চ-ডিনার করা ছাড়াও সিনেমা-তেও গেছেন আপনি। আর...আপনার নেপলস যাওয়ার দিন দুপুরে আপনার অফিসে টেলিফোন করেছিলেন সেনরিনা একটা ফটোগ্রাফিক ইকুইপমেন্ট কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।’ কানের

লতি চুলকাল ম্যালােটি । ‘ফোনে নিজেকে মিসেস রবার্ট হুইটনি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি । আপনাদের দু’জনের সম্পর্ক আঁচ করতে পেরে সময়মত আপনার টেলিফোন ট্যাপ করার ব্যবস্থা করেছিলেন ইল সেনর মারকোনি ।’

থ হয়ে গেল মাসুদ রানা । বলে কি? ওর টেলিফোনে আড়ি পাতা পর্যন্ত গড়িয়েছে ব্যাপারটা? কিন্তু কে তাকে সোফিয়ার ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছিল । কে সে? কেন?

‘সব তথ্য ফ্রেনজিকে জানাতে যাচ্ছে আপনার বন্ধু?’

এমনভাবে রানার দিকে তাকাল মালেটি, যেন দুঃখে কলজে ফেটে মরার অবস্থা হয়েছে । ‘হ্যাঁ । একে তিনি পবিত্র কর্তব্য হিসেবে ভাবছেন, সেনর । এটা একটা ক্লীন মার্ডার কেস । পুলিশকে না জানালে পরে হয়ত উল্টে নিজেই ফেঁসে যাবেন তিনি তথ্য গোপন করার দায়ে ।’

‘তিনদিন দেরি করতে রাজি হওয়ার অর্থ আমি যেন একটা সুযোগ পাই?’

সরাসরি উত্তরটা এড়িয়ে গেল মালেটি । ‘আমি তাঁকে দেরি করতে সম্মত করিয়েছি, সেনর ।’

অন্যমনস্কের মত তার চর্বি বোঝাই গোল মুখটার দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা । আর কোন পথ নেই । রানার কোন অ্যালিবাই-ই এখন আর ধোপে টিকবে না । ফ্রেনজি কেবল জানতে পারলেই হয় যে ও-ই সেই রবার্ট হুইটনি, এবং সোফিয়ার মৃত্যুর দিন ও নেপলস গিয়েছিল—ব্যস্! আর কোন তথ্য প্রমাণের দরকার হবে না । চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল রানা রীতিমত । ও জানে সোফিয়াকে হত্যা করেছে সনি বাসিলি, কিন্তু ওরা তা শুনবে

কেন? উপযুক্ত প্রমাণ কই রানার হাতে?

‘আপনি কি তালিকাটা একবার দেখবেন, সেনর?’ বলল ম্যালেরি। এখন আর সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে না সে। বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছে রানার অসুবিধের কথা ভেবে মনে সহানুভূতি জাগছে তার। ‘তারপর না হয় আলোচনা করা যাবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে?’

কথাগুলোর মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত আছে কিন্তু আনমনা ছিল বলে ঠিক ধরতে পারল না রানা।

‘দিন,’ হাত বাড়াল ও। কাগজগুলো নিয়ে বলল, ‘আপনার কোন তাড়া নেই তো?’

‘না না, কোন তাড়া নেই আমার।’

‘তাহলে গাড়িতেই বসুন,’ বলে দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। ‘আমি একটু ঘুরে আসছি। আধঘন্টার মধ্যেই আসব।’

‘অল রাইট, সেনর।’

হাঁটতে হাঁটতে কাছের এক ককটেল বারে এসে ঢুকল ও। নিরিবিলা একটা জায়গা দেখে বসল। অল্পবয়সী প্রায় নগ্নবক্ষা সুন্দরী এক ওয়েট্রেস এসে দাঁড়াল সামনে। মেয়েটির হাসি দেখে পিণ্ডি জ্বলে গেল মাসুদ রানার। হাসিতে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল সে, ককটেল বার হলেও এখানে আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়।

কর্কশ গলায় প্রায় ধমকে উঠল রানা। ‘ডবল হুইস্কি!’

ওর অপ্রত্যাশিত মধুর কণ্ঠে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল মেয়েটি। এক পা পিছিয়ে গেল চট করে। তাড়াতাড়ি বলল, ‘সি...সি, সেনর।’ কথা শেষ করেই দ্রুত পায়ে বারের দিকে হাঁটা ধরল নগ্নবক্ষা। প্রায় সাথে সাথেই ফিরে এল। হুইস্কি ভরা গ্লাসটা তিন্ড অবকাশ-২

সাবধানে রানার সামনে রেখে ফিরে গেল নিজের জায়গায় ।

বড় একটা চুমুক দিয়ে কাগজগুলো চোখের সামনে মেলে ধরল মাসুদ রানা । পড়তে লাগল । ও সহ মোট চারজনের নাম আছে তালিকায়—সবাই সাংবাদিক । প্রথম নামটি কার্লো মনটির । এরপর লস এঞ্জেলস টাইমস-এর রোম সংবাদদাতা টিম ম্যাথিউসের নাম । সম্ভবত এর কথাই বলেছিল মনটি । আরেকজন ইটালিয়ান ।

ওসব নিয়ে মাথা ঘামাল না মাসুদ রানা । নিজের ব্যাপারে কি কি আছে এতে, তার ওপর নজর বোলাতে লাগল দ্রুত । একটু পরই টের পেল ও, একবিন্দু বাড়িয়ে বলেনি গুইসেপ ম্যালেট্রি । সোফিয়ার রোমে পা রাখার মুহূর্ত থেকে প্রতিটি খুঁটিনাটি একজন প্রফেশন্যালের মতই লক্ষ্য করেছে ক্রনো মারকোনি । রানার সঙ্গে সোফিয়ার প্রতিটি সাক্ষাৎ নির্ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে রিপোর্টে । সেই সঙ্গে ওদের টেলিফোনে যতবার আলাপ হয়েছে, তার প্রতিবারের প্রতিটি কথোপকথনও রয়েছে, হুবহু ।

মাত্র তিন দিন!

কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল মাসুদ রানা । এর মধ্যে কি পারবে ও সনির মুখোশ উন্মোচন করতে । নাকি লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজিকে নিজের পরিচয় জানিয়ে সব খুলে বলবে? না, তাতে কোন লাভ হবে না । বরং খেলো হয়ে যাবে ও ফ্রেনজির কাছে । তারচেয়ে বরং থাক এখন ।

আচমকা প্রায় লাফিয়ে উঠল রানা । চমকে গেছে ভেতরে ভেতরে । লিষ্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উল্লেখ নেই । কেন নেই? ব্যস্ত হাতে পাতাগুলো ওলটাতে লাগল ও । একই কথা জপ করছে

মনে মনে, কেন নেই? নেই কেন? ওর ধারণাই সত্যি হল শেষ পর্যন্ত—তালিকার কোথাও সনি বাসিলি বা সারা গ্র্যান্ডির নাম নেই।

অথচ থাকা অবশ্যই উচিত ছিল। রানা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যেমন ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে সোফিয়াকে, তেমনি সনির সঙ্গেও দেখা গেছে নিশ্চয়ই? হয়ত সারার সঙ্গেও এক-আধবার বেরিয়েছে মেয়েটি। তাহলে? ওদের দু'জনের উল্লেখ পর্যন্ত নেই, এ কেমন কথা?

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল মাসুদ রানা। তারপর সচকিত হয়ে হাত ইশারায় সেই ওয়েস্ট্রেসকে ডাকল। 'আমাকে রোমের টেলিফোন গাইডটা দাও প্লীজ, ডার্লিং!' বলল ও।

কিন্তু সহজে ভবি ভুলবার নয়। মুখে সামান্য হাসির রেখা ফুটলেও সতর্ক চোখে রানাকে দেখছে এখনও মেয়েটি। মাথা ঝাঁকিয়ে বার থেকে বইটা এনে দিল সে।

'থ্যাক্স।' আবার হাসল রানা। পরমুহূর্তে ডুবে গেল বইটার মধ্যে। প্রথমে 'এম,' আদ্যাক্ষরগুলো আঁতিপাতি করে খুঁজল ও মারকোনির নাম দেখতে পাওয়ার আশায়। নেই! হয়ত ক্রনোর ভেতর আছে, ভেবে এবার পুরো 'বি' ঘাঁটল। নেই এখানেও। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আপুনমনে খুতনি চুলকাতে লাগল রানা—কেসটা কি?

উঠে বারে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। স্থলদেহী বারম্যান গ্লাস মোছায় ব্যস্ত। তাকে টেলিফোন সেটটা এগিয়ে দেবার অনুরোধ করল ও। বিনা বাক্যব্যয়ে সেটটা এনে দিল সে। ধন্যবাদ জানিয়ে টনি আমান্দোর নাম্বার ঘোরাল রানা।

‘সি!’ গম্ভীর গলায় বলল ক্রাইম রিপোর্টার।

‘রানা বলছি।’

‘হাই, রানা! খবর কি তোমার? টেলিফোন করে পাওয়া যায় না!’

‘পাবে। আর দুটো দিন সবুর কর। এখন একটা জরুরি খবর চাই আমার।’

‘ডেফিনিটলি! বল কি জানতে চাও।’

‘ক্রনো মারকোনি নামে কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে চেন?’

‘ক্রনো মারকোনি?’

‘হ্যাঁ। স্পেশাল কেস হ্যাণ্ডেল করে লোকটা। চার্জ নেয় খুব বেশি।’

‘ক্রনো মারকোনি...নাহ! নামে ভুল হচ্ছে তোমার, রানা। রোমের প্রাইভেট ডিটেকটিভদের প্রত্যেককে চিনি আমি। এ নামে কেউ নেই।’

‘তুমি শিওর?’

‘হানড্রেড পারসেন্ট শিওর। কেন, ব্যাপার কি?’

‘পরে বলব। থ্যাঙ্কস, টনি। রাখছি।’

মেয়েটিকে আরও একটা ডবল-হুইক্লির অর্ডার দিয়ে টেবিলে ফিরে এল মাসুদ রানা। ঘড়ি দেখল। আধঘন্টা ফুরোতে আরও দশ মিনিট দেরি আছে। আরেকবার রিপোর্টটা পরীক্ষা করে দেখল রানা। প্রথম তিনজনের নামের পাশে ছোট্ট করে লেখা আছেঃ ব্যাকমেইল ভিকটিম অভ লা সেনরিনা সোফিয়া শেরম্যান। ওর নামের পাশে লেখাঃ হু নট ওনলি হ্যাড দ্য মোটিভ, বাট দ্য অপারচিউনিটি অভ কিলিং হার।

আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করল রানা। ধীরেসুস্থে শেষ করল পানীয়টুকু। ভেতরের অস্বস্তিকর ভাবটা কেটে গেছে। খুশিমনে ড্রিঙ্কসের দাম মেটাল ও, মেয়েটিকে আশাতীত রকম টিপস দিয়ে বেরিয়ে এল খাঁ-খাঁ রোদ মাথায় নিয়ে।

বসে বসে ঘামছে গুইসেপ ম্যালেটি। গাড়ির ভেতরটা রসুন, ঘাম আর ইটালিয়ান থার্ড ক্লাস সিগারেটের দুর্গন্ধে গুলজার। উঠে বসল রানা ড্রাইভিং সিটে। গোল করে পাকানো কাগজগুলো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'রিপোর্টটা পড়তে দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ আপনাকে।'

এমনভাবে সেদিকে তাকাল লোকটা, যেন কোন বিষাক্ত মামবা ছোবল মারতে যাচ্ছে তাকে। 'না না, দরকার নেই,' ব্যস্ত গলায় বলল ম্যালেটি। 'ওগুলো আপনার জন্যেই এনেছি, সেনর। রেখে দিন।'

'ধন্যবাদ। ক্রনো মারকোনির কাছে এর কপি আছে নিশ্চয়ই?'

'সি, সেনর। আনফরচুনেটলি।'

পা লম্বা করে দিয়ে বসল রানা। তখনকার সেই কথাটার মর্ম এখন বুঝতে পারছে ও—একেবারে জলবৎ তরলং। ওকে ব্যাকমেইলের জালে জড়াতে চাইছে গারলিক ম্যালেটি। দুর্গন্ধ তাড়াতে সিগারেট ধরাতে বাধ্য হল রানা। 'ক্রনো মারকোনি খুব বড়লোক হবেন নিশ্চয়ই, তাই না?'

কয়েক মুহূর্ত রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল লোকটা অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে। প্রশ্নটার বিশেষ কোন অর্থ আছে কি না, বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু ওর মুখের নিরাসক্ত ভাবভঙ্গি দেখে দৃষ্টি পাল্টাল।

‘কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কখনই ধনী হয় না, সেনর,’ বলল ম্যালেরি। ‘এক মাস কাজ করলে তিন মাস বসে থাকতে হয়। আমাকেই দেখুন, আমার পোশাক-আশাক দেখে কি মনে হয় আপনার?’

প্রশ্নটা শুনতে পায়নি, এমন ভাব করল ও। ‘কুনো মারকোনির সাথে কোন সমঝোতায় আসা যায় না?’

সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পাল্টে গেল গোয়েন্দার। হ্যাট নামিয়ে টাকে হাত বোলাল কয়েকবার। চোখ কুঁচকে আছে, কিন্তু চেহারা উজ্জ্বল।

‘কি ভাবে সমঝোতা করতে চাইছেন, সেনর?’

‘সাপোজ, তাকে এই রিপোর্টের সবগুলো কপি বিক্রি করে দেবার প্রস্তাব দিলাম আমি?’ বলল রানা। ‘এগুলো ফ্রেনজির হাতে পড়লেই চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে সে। আমাকেই দায়ী ভাববে সোফিয়ার মৃত্যুর জন্যে।’

‘সত্যিই তাই,’ বলল ম্যালেরি। ‘এটা পড়লে যে কেউ-ই তাই ভাববে। এই কারণেই সেনর মারকোনিকে তিনদিনের জন্যে খবরটা চেপে রাখার অনুরোধ করেছি আমি আসলে।’

‘কিন্তু আপনার কাছে যা শুনলাম, তাতে মনে হয় ভদ্রলোক খুব বেশি রকম কর্তব্য সচেতন। তিনি কি আদৌ রাজি হবেন আমার প্রস্তাবে?’ চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মাসুদ রানা।

‘আপনি বললে তাঁকে আমি অনুরোধ করব আপনার হয়ে। মনে হয় রাজি করাতে পারব। ইন ফ্যাক্ট, সেনর, রিপোর্টটা আমি আগেই পড়েছি। এবং তাঁকে আভাস দিয়েই এসেছি যে আপনি হয়ত এরকম একটা কিছু প্রপোজ করতে পারেন। তাঁর সেন্স অভ

ডিউটি ওভার-ডেভেলপড, সন্দেহ নেই, কিন্তু ভদ্রলোক আমার বিশিষ্ট বন্ধু। আশা করি রাজি করাতে পারব তাঁকে। আফটার অল, ইল সেনর মারকোনির উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটা জানা আছে আমার। ঠিক জায়গামত টাকা দিলে তিনি নিশ্চয়ই...

‘কি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা?’

‘তাসক্যানির একটা আসুর বাগানের মালিক হওয়া।’

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। ‘আপনি তাহলে মারকোনিকে রাজি করানোর দায়িত্ব নিচ্ছেন?’

খানিক ইতস্তত করে বলল ম্যালেট্রি, ‘আপনি আমার ক্লায়েন্ট, সেনর। কাউকে ক্লায়েন্ট হিসেবে গ্রহণ করলে তার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেই আমি, এটাই আমার ব্যবসার রীতি। এ ব্যাপারটা অবশ্য জটিল...আর বিপজ্জনকও। তবুও,’ কাধ ঝাঁকাল সে। ‘আপনার কথা ভেবে ঝুঁকিটা নিতে রাজি আছি।’

‘আপনি বেশ কড়া প্রিন্সিপল্-এর মানুষ দেখছি।’

‘ওটা আমার কাছে, সেনর। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি আপনার সেবক।’

সরাসরি ম্যালেট্রির মুখের দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। ‘ভদ্রলোকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে কত টাকা প্রয়োজন, জিজ্ঞেস করেছেন কখনও?’

সে-ও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বলল, ‘এ ব্যাপারে অবশ্য কয়েকদিন আগেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। বাগান কেনার অর্ধেক টাকা আছে সেনর মারকোনির।’

‘আর কত চাই?’

তিক্ত অবকাশ-২

‘টেন মিলিয়ন লিরা ।’

টেন কেন, হানড্রেড মিলিয়ন চাইলেও আপত্তি ছিল না রানার ।
‘ওটা পেলে এই রিপোর্টের সমস্ত কপি আমাকে দিয়ে দেবে সে,
এবং পুলিশকে জানাবে না কিছু, ঠিক আছে?’

‘এখনই সে কথা দিতে পারি না আমি, সেনর । আগে তাঁর
সঙ্গে কথা বলতে হবে । তবে আমার বিশ্বাস, সেনর মারকোনিকে
রাজি করাতে ব্যর্থ হব না আমি ।’

‘কিন্তু একটা কথা এখনই জানিয়ে রাখছি আপনাকে, সেনর
ম্যালেটি । এর বেশি এক পয়সাও দিতে পারব না আমি । মানে,
এই বাড়তি কাজের জন্যে আপনাকে কিছু দিতে পারছি না । এর
ফী-টা আপনি মারকোনির কাছ থেকেই নেবেন । আপনার কাজের
ইউজ্যুয়াল ফী নিয়ে অবশ্য চিন্তা নেই ।’

‘তা নিয়ে কোন সমস্যা হবে না । আমি তা নিয়ে মাথা
ঘামাচ্ছিও না আসলে । কাজটা এখন ভালয় ভালয় চুকে গেলে
হয় ।’

‘ওড । তাহলে দেখুন গিয়ে আলাপ করে,’ বলল রানা ।
‘কতক্ষণ সময় লাগবে মনে করেন?’

ঘড়ি দেখল ম্যালেটি । ‘বারটা বাজে । আশা করি এক দেড়
ঘন্টার মধ্যে ফলাফল জানতে পারব । কোথায় থাকবেন আপনি,
বাসায়?’

‘না, অফিসে ।’

‘ঠিক আছে । আমি ফোন করব ।’ পোর্টফোলিওটা বগলদাবা
করে গাড়ি থেকে নেমে গেল গুইসেপ ম্যালেটি । ‘চলি, সেনর
মাসুদ রানা ।’

‘আসুন ।’

রানাকে বো করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। ছোট ছোট পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল দর্শনার্থীদের ভিড়ে। পাঁচ মিনিট পর গাড়ি ছাড়ল রানা। সোজা চলে এল নিউ ইয়র্ক ভিশনে। লিজা ভ্যালেন্টিনের দিকে তাকালই না ও, গম্ভীর মুখে ভেতরে এসে বসল।

দেয়া হলে দশ মিলিয়ন লিরা কার পকেটে যাবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ওর। কিন্তু কে লোকটাকে সোফিয়ার ওপর নজর রাখার জন্যে ভাড়া করেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারছে না রানা। আধঘন্টা পর পর দু'বার এসে ওকে কফি দিয়ে গেছে লিজা নিঃশব্দে। রানাকে চিন্তিত দেখে ঘাঁটাতে সাহস পায়নি।

ঠিক দুটোয় ফোন করল ম্যালেডি। 'অ্যারেঞ্জমেন্ট পাকা করে ফেলেছি, সেনর,' খুশি খুশি গলায় বলল সে। 'আর কোন চিন্তা নেই।'

'ভেরি গুড।'

'আগামীকাল সকালেই শর্ত পূরণ করতে হবে আপনাকে।'

'কাল নয়, পরশু। মানে, আমাকে কিছু কিছু...'

ওকে থামিয়ে দিল গোয়েন্দা। 'নট ওভার দ্য টেলিফোন, সেনর,' ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। 'টেলিফোনে এ ধরনের আলোচনা মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে, এটা ওপেন লাইন। ঠিক আছে, পরশুই সই। পরশু ঠিক এই সময় আপনাকে ফোন করব আবার।'

'বেশ।' ফোন রেখে দিল রানা।

পরের একটা ঘন্টা একের পর এক সিগারেট টেনে কাটাল মাসুদ রানা। বিভিন্ন কোণ থেকে পর্যালোচনা করে দেখল পুরো সেট-আপটা। এমন নোংরা, প্যাচাল ঝামেলায় জীবনে আর কখনও পড়েনি ও, এমন নাকানি-চোবানিও খেতে হয়নি।

এরমধ্যে আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছে গুইসেপ ম্যালেট্টি। এর একটা বিহিত করা দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সন্দেহ নেই। আরও বড়রকম কেলেক্সারিতে জড়িয়ে ফেলতে পারে সে রানাকে ইচ্ছে করলেই। অতএব কোন চান্স দেয়া যাবে না লোকটাকে। এদিকে হাতে সময়ও নেই। আগামী দুয়েকদিনের মধ্যেই সম্ভবত সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে ফাইন্যাল রিপোর্ট সাবমিট করবে পুলিশ নেপলস করোনারের কাছে।

তার মানে আরেকবার দৌড়াতে হবে ওকে সরেনটো, ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের প্রতিনিধি হিসেবে। তার আগেই যদি রানা সনিকে হত্যাকারী প্রমাণ করতে না পারে তাহলে ড্রাগের চালান নিয়ে নিস যেতেই হবে। অথচ, প্রথমেই যদি সামান্য মাথা খাটিয়ে সত্যের মুখোমুখি হত ও, তাহলে এর কিছুই হত না।

সোফিয়ার মৃতদেহ চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পুলিশকে

জানাত ও ফোন করে, তাহলে সনিও ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে ওর জন্যে ফাঁদ পাততে পারত না। আফসোস! তখন কি আর ভেবেছিল এত সহজেই রগচটা শেরম্যানকে ম্যানেজ করা সম্ভব হবে?

সনি বাসিলির কথা ভাবল মাসুদ রানা। ইটোলা গ্র্যান্ডির সাথে নির্বাসনে এসেছে লোকটা এদেশে, সন্দেহ নেই। এবং নিউ ইয়র্ক থেকে গ্রীন সিগন্যাল পাওয়ার পর ছ'দিনের জন্যে আবার ফিরে গেছে সেখানে। হত্যা করেছে আলবার্তো ফেলিনিকে, তারপর আবার দৌড়। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে রানা, কাজটা সাফল্যজনকভাবে শেষ করে সনি ফিরে আসার মাত্র এক সপ্তাহ পর রোমে আসে সোফিয়া শেরম্যান।

কে প্রথম ড্রাগের নেশা ধরিয়েছিল মেয়েটিকে? নিশ্চয়ই আলবার্তো ফেলিনি। সোফিয়ার সঙ্গে রাত কাটায় ফেলিনি, ব্যাপারটা যে ভাবেই হোক, জানতে পারে ইটোলা গ্র্যান্ডি। এবং কৌশলে ওকে দখল করে নেয়। সে জানে, নেশাখোরদের নীতি বলে কিছু নেই, থাকে না, লোভ দেখালেই ইচ্ছেমত নাচানো যায় তাদের। হয়েছেও তাই।

হয়ত বড় অঙ্কের টাকা পাওয়া যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল সোফিয়াকে, অথবা আজীবন বিনে পয়সায় ড্রাগ সাপ্লাইয়ের নিশ্চয়তা। ফলে আগুপিছু চিন্তা না করেই ফেলিনিকে হত্যা করার কাজে গ্র্যান্ডিকে সহায়তা করতে রাজি হয়ে যায় সে।

সারা গ্র্যান্ডির ওখানে দেখা বড় ছবিটার কথা চট করে মনে পড়ে গেল। দ্বিতীয়বার যখন বেলা ভিসটায় যায় রানা, সেবার তিন্ত অবকাশ-২

ঠিক একই রকম একটা দৃশ্য চোখে পড়েছিল ওপর থেকে। বড় একটা ছাতার নিচে বসে আছে একটা মেয়ে, মুখটা দেখা যাচ্ছে না তার। নিশ্চয়ই সারা গ্র্যান্ডি হবে মেয়েটি। এর মানে, ভাবল ও, ধারণায় কোন ভুল নেই। ইটোলা গ্র্যান্ডি-ই ওই ভিলাটার মালিক। আরেকবার ওটার ওপর নজর বোলাতে হবে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল মাসুদ রানা। পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে আগে।

কিন্তু সবার আগে এই ম্যালেরিার ব্যবস্থা করতে হবে। কি ভাবে কি করা যায়, ভাবতে লাগল ও। হঠাৎ করেই সমস্যাটার সমাধান পেয়ে গেল, একেবারে সহজ-সরল পথ। ঠিক করল রানা, কাঁটা দিয়ে তুলতে হবে কাঁটা।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রিসিভার তুলল ও। সারা গ্র্যান্ডির নাম্বার টিপতে শুরু করল। প্রথম রিঙটা পুরো না হতেই সনি বাসিলির বাজখাই গলা শোনা গেল।

‘মাসুদ রানা বলছি,’ বলল ও। ‘তোমার সঙ্গে খুব জরুরি বিষয়ে কথা বলা দরকার। কোথায় বসা যায়?’

‘কি এমন জরুরি আলোচনা?’ সন্দিগ্ধ গলায় বলল সনি।

‘আমাদের শনিবারের অ্যারেঞ্জমেন্টটা সম্ভবত বাতিল করতে হবে,’ বলল রানা। ‘কিন্তু টেলিফোনে সব কথা বলা সম্ভব নয়। সামনাসামনি হওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।’

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সনি। শ্বাস নিচ্ছে বুনো মোষের মত। তারপর মুখ খুলল সে। ‘ঠিক আছে। পাসকোয়েল ক্লাবে চলে এসো। ঠিক আধঘন্টার মধ্যে ওখানে যাচ্ছি আমি।’

‘ও-কে।’

রিসিভার রাখতেই বেজে উঠল ফোন। ‘সেনর মাসুদ রানা?’
‘দ্যাট’স রাইট।’

‘জাস্ট হোল্ড অন, প্লীজ। নিউ ইয়র্কের কল।’

‘অপেক্ষা করছি আমি।’ ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান-ই হবে, ভাবল
ও। অথবা শফিকও হতে পারে। হয়ত সনি সম্পর্কে...।

‘রানা?’

‘ইয়েস, মিস্টার শেরম্যান।’

‘কেমন আছ তুমি?’

‘চলছে।’

‘কথা বলেছিলে কাল করোনাবিরাসের সাথে?’

‘হ্যাঁ। আপনার মতামত জানিয়ে দিয়েছি ওঁকে।’

‘কি বলে?’

‘বলে আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার সঙ্গে
তার যে সেটল্‌মেন্ট হয়েছে তা এখন পর্যন্ত ঠিকই আছে। নতুন
কোন ঝামেলা দেখা দিলে সময়মত আপনাকে জানানো হবে।’

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন শেরম্যান। ‘থ্যাঙ্ক গড। তুমি কি কিছু
করতে পেরেছ, কোন ডেভেলপমেন্ট?’

‘হ্যাঁ। সোফিয়ার খুনীকে খুঁজে পেয়েছি।’

‘কে, রানা?’ আচমকা লাফিয়ে উঠেছেন মনে হল ভদ্রলোক,
তার চেয়ারের আর্তনাদ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে রানা। ‘কি নাম
তার?’

‘সনি বাসিলি।’

‘সনি বাসিলি? উম্ম্...নামটা চেনা চেনা লাগছে যেন?’

‘লোকটা ইটোলা গ্র্যান্ডির গানম্যান। সম্ভবত এর হাতেই
তিন্ত অবকাশ-২

গতমাসে খুন হয়েছে আলবার্তো ফেলিনি ।’

‘ও মাই গড!’ বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন শেরম্যান । তারপর আবার বিড়বিড় করে উঠলেন, ‘ও মাই গড! এদের সাথে নিজেকে জড়িয়েছিল সোফিয়া!’ খুবই দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ‘কিন্তু কেন ওকে হত্যা করল লোকটা?’

বিপদে পড়ে গেল রানা । এ সব কথা টেলিফোনে কি করে বলা সম্ভব? আমতা আমতা করে বলল, ‘ওসব এখন থাক, মিস্টার শেরম্যান । এ নিয়ে পরে...’

‘ডোন্ট বি হেজিটেন্ট, সন । যা-ই ঘটে থাকুক, বলে যাও তুমি । আমি কিছু মাইও করব না ।’

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল ও । মনে মনে কথা গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল । নিচু, ধীরকণ্ঠে যথাসম্ভব রেখে-ঢেকে জানাল তাঁকে পুরো ব্যাপারটা । এসব হজম করতে প্রচুর সময় লাগল বৃদ্ধের । দীর্ঘ বিরতির পর আবার যখন মুখ খুললেন, রানার মনে হল কাঁদছেন তিনি ।

ফ্যাসফেসে গলায় বললেন । ‘এ জন্যে আমিই দায়ী, রানা । সমস্ত অপরাধ আমার, চোখ থাকতেও অন্ধ ছিলাম আমি, দেখেও দেখিনি । কিন্তু...’ থেমে গেলেন শেরম্যান ।

‘এখন আর এ নিয়ে ভাববার সময় নেই,’ নরম গলায় বলল মাসুদ রানা । ‘সবকিছু মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে আপনাকে ।’

‘আমি প্রস্তুত, সন । পাপ যখন করেছি, তার খেসারতও অবশ্যই দেব । বল, কি করতে হবে । ওখানকার পরিস্থিতি কি

রকম? স্ক্যাগুল ঠেকাবার কোন পথ-ই নেই?’

‘এটা এখন মার্ডার কেস, মিস্টার শেরম্যান। তবু আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব স্ক্যাগুল ঠেকাবার। দেখি, কি করা যায়।’

‘আর, রানা, লোকটার ওপর নজর রাখার...’

‘ও নিয়ে ভাবতে হবে না। দায়িত্ব যখন নিয়েছি, ওসব আমি বুঝব।’

‘থ্যাঙ্ক ইউ। আর কিছু? এখান থেকে কোন সাহায্য করতে পারি আমি তোমাকে?’

‘না, তেমন কিছু নেই। ইটোলা আর সনির ব্যাকথাউও সম্পর্কে জানার প্রয়োজন ছিল অবশ্য...’

‘কি কি জানতে চাও, বল না। আমি জানাব তোমাকে।’

‘দরকার নেই। আমার এজেন্সি এ ব্যাপারে কাজ করছে ওখানে।’

‘আমার ক্রাইম ডেস্কের ছেলেরাও জানে কিছু নিশ্চই।’

‘তা তো জানবেই। তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমার ওরা অনেক বেশি জানে। রাখি, জরুরি একটা কাজে বেরোতে হচ্ছে এখনই। সো লগ।’

ফ্রেডলে টোকা দিয়ে ফ্রেনজির নাম্বারে ফোন করল রানা এবার। দেখা দরকার কতদূর এগিয়েছে ওরা।

‘ইয়েস, সেনর রানা?’ নিরাসক্ত গলায় বলল লেফটেন্যান্ট।
‘বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্যে?’

‘শুক্রবার কখন ফাইন্যাল রিপোর্ট দিচ্ছেন আপনারা?’

‘সরি, বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। সাড়ে এগারটায়। আপনি আমার সাথে যাবেন? কাল রাতের শেষ ফ্লাইটে যাচ্ছি আমি।’

‘নো, থ্যাঙ্কস । আমি শুক্রবারের ফাস্ট ফ্লাইটে যাব ভাবছি ।’

‘অল রাইট ।’

‘কেমন চলছে তদন্ত?’

‘সন্তোষজনক ।’

‘ভাল কথা, সোফিয়ার অ্যাপার্টমেন্টের কি অবস্থা?’

‘আমাদের কাজ শেষ, সেনর । চাবিটা বিল্ডিংয়ের পোর্টারের কাছে রেখে এসেছি । চাইলেই দিয়ে দেবে ।’

‘ওকে । বাই দ্য ওয়ে, লেফটেন্যান্ট, অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে একটা টেলিফোন নাম্বার লেখা ছিল, দেখেছেন নাকি?’

‘হ্যাঁ, দেখেছি তো! কিন্তু... কেন, এ প্রশ্ন কেন?’

‘নাম্বারটা কার, জানেন?’

‘সেনরিনা সোফিয়ার এক বান্ধবীর, সারা গ্র্যান্ডির ।’ গলার স্বরে খুব একটা আগ্রহী মনে হল না তাকে । ‘চেক করে দেখেছি আমি ।’

‘সারা যে ইটোলা গ্র্যান্ডির মেয়ে, জানেন নিশ্চই?’ হাসছে রানা নিঃশব্দে । ‘আলবার্তো ফেলিনিকে হত্যার সাথে যাকে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে?’

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ফ্রেনজি । তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘জানি বৈকি । কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন, সেনর?’

‘এমনিই । জাস্ট আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম । ভাবলাম খুব ব্যস্ত আছেন, ভুলে-টুলে যেতে পারেন । তাই আর কি ।’ লোকটাকে মুখ খোলার সময় না দিয়ে রিসিভার রেখে দিল রানা ।

ঠিক সময়মতই পৌঁছুল রানা পাসকোয়েল ক্লাবে । বসে বসে

ওয়াইন গিলছে সনি বাসিলি। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আনে
একটা চুরুট, নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে গল গল করে। প্রকা
লাউজ্জটা প্রায় জনমানবহীন। রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দে
হাত নাড়ল।

‘হ্যাভ আ ড্রিন্ক?’ বলল সে।

‘না, ধন্যবাদ।’ সনির মুখোমুখি বসল মাসুদ রানা।

‘ব্যাপার কি?’ ভুরু নাচাল লোকটা, ‘কিসে কামড়াচ্ছে
তোমাকে?’

‘টিকটিকি।’

‘মানে?’ চুরুটটা মুখ থেকে নামাল সনি। অন্য হাতে গ্লাসটা
তুলেছিল, থেমে গেল হাতটা মাঝপথে।

‘একে না ঠেকানো গেলে নিস যাওয়া হচ্ছে না আমার।’

‘খুলে বল।’

‘সোফিয়ার বাবা একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগ করতে
বলে গিয়েছিলেন আমাকে মেয়ের ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে খোঁজ-খবর
নেয়ার জন্যে। তাই করি আমি। আই. আই. এ. নামে এক
প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং ফার্মকে অ্যাপয়েন্ট করি। ওদের এক
অপারেটর, ওইসেপ ম্যালেট্রিকে এ কাজের দায়িত্ব দেয় ওরা।’

‘তারপর?’ হেলান দিয়ে সিলিঙের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল
সনি বাসিলি। চোখ আধবোজা—মন দিয়ে শুনছে।

‘কিন্তু ব্যাটা উল্টে আমাকেই গঁথে ফেলেছে।’

‘কি ভাবে?’

একটু আগে ম্যালেট্রির সঙ্গে কি আলোচনা হয়েছে, খুলে বলল
মাসুদ রানা। ওর বিরুদ্ধে লোকটার তথ্য-প্রমাণ জোগাড়ের
তিক্ত অবকাশ—২

ব্যাপারটাও বাদ দিল না।

রানা থামতে পুরোপুরি চোখ মেলে তাকাল সনি। 'সো হোয়াট?'

'ব্ল্যাকমেইল। দশ মিলিয়ন লিরা দাবি করেছে আমার কাছে। না দিলে রিপোর্টগুলো পুলিশের হাতে তুলে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে।'

'রিপোর্টগুলো কতটা ক্ষতিকর?' হেলান দিতে দিতে চেয়ারের ওপর প্রায় শুয়ে পড়েছে সনি বাসিলি। আনমনে গাল চুলকাচ্ছে।

'খুব ক্ষতিকর। ওগুলো পুলিশের হাতে পড়লে বারটা বাজবে আমার। অত টাকাও আমার নেই যে দিয়ে ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করব। আমার সার্ভিস চাইলে একে ঠেকাতে হবে তোমার।'

'কি করতে বল?'

'সে তুমি বোঝ কি ভাবে কি করবে।'

'বুঝে গেছি,' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। এক চুমুকে পুরোটা ওয়াইন গলায় ঢেলে ঠক করে আছড়ে রাখল গ্লাসটা। 'চলো, ওঠো।' হাঁটুর পিছন দিয়ে গুঁতো মেরে চেয়ারটা সরিয়ে দিতে চাইল সে, দড়াম করে উল্টে পড়ল ওটা। কেঁপে উঠল পুরো ঘর।

'কোথায়?'

'ম্যালেরিয়ার সঙ্গে দেখা করে আসি, চলো। ওকে আমি সামলাব, কোন চিন্তা নেই। কামন, কামন!'

'এখন পাছ কোথায় তাকে? তারচে' বরং কাল সকালে ওকে টেলিফোন কর। অ্যাপয়েনমেন্ট করে...'

'কোন দরকার নেই,' হাত উল্টে ঘড়ি দেখল সনি। 'তিনটে বাজেনি এখনও। পাওয়া যাবে শাম্বাকে।'

বাহু ধরে রানাকে টেনে তুলল সে। কাউন্টারে এসে বিল মেটাল। বাইরে এসে বলল, ‘তোমার গাড়ি থাকুক এখানেই। আমারটায় এসো।’

নীল রেনল্টটা দাঁড়িয়ে রয়েছে পার্কিংলটের একেবারে শেষ প্রান্তে। লক্ষ্য করল রানা, ওটার আগের নাম্বার প্লেটটা নেই—অন্য প্লেট ঝুলছে। সম্ভবত এটাই আসল নাম্বার। সনির পাশে উঠল মাসুদ রানা। হুস্কার ছেড়ে ছুটল রেনল্ট তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে। রাস্তায় উঠেই কড়া ব্রেক কষল সনি।

রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল দুই বৃদ্ধ, ব্রেক কষতে আরেকটু দেরি হলেই গাড়ির নিচে পড়ত। অথচ দোষটা তাদের নয়, লাল সিগন্যাল দেখেই পা বাড়িয়েছিল তারা। জানালা দিয়ে মুখ বের করে প্রচণ্ড ধমক লাগাল সনি লোক দুটোকে, তারপর সন্তুষ্টমনে গিয়ার বদল করল, ক্ল্যাচ ছেড়ে ঠেসে ধরল গ্যাস পেডাল।

‘ফ্যাটসো কোথায় থাকে, জানি আমি,’ পিলে চমকানো টুকরো হাসি ফুটল সনির ঠোঁটের এক কোণে। অন্য কোণটা জুড়ে বসে আছে চুরুট। ‘একসময় দু’জনে খুব ভাল বন্ধু ছিলাম আমরা। একসঙ্গে ব্যবসাও করেছি। খুব ভালবাসে ও আমাকে। আমার জন্যে সব করতে পারে ম্যালেরি।’

কথা বলল না রানা। লোকটাকে কি ভাবে সামাল দেবে সনি বুঝে উঠতে পারছে না। দশ মিনিট একনাগাড়ে চলার পর গাড়ির গতি কমাল সনি বাসিলি। বাঁয়ে টার্ন নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা সরু রাস্তায়। ভায়া ফ্ল্যামিনিয়া নুয়োভা জায়গাটার নাম—গলিতে ঢোকার মুখে তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো একটা সাইনবোর্ডে লেখা নামটা পড়ে নিয়েছে রানা চট করে।

কিছুদূর এগিয়ে আবার বাঁয়ে ঘুরল রেনল্ট। প্রায় সাথে সাথে থেমে দাঁড়াল একটা জীর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে। ‘এখানে থাকে ও,’ বলল সনি। ‘চলো।’

গেটহীন গেট পেরিয়ে ওটার বাউণ্ডারির ভেতরে পা রাখল ওরা। বিল্ডিংটা চারতলা, টুইন অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। দু’তিনটে ফ্ল্যাটের সামনের বারান্দায় ছটোপুটি করে খেলছে শিশুরা। নোংরা সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে ওপরে ছুটল সনি, একেকবারে তিনটে করে ধাপ টপকে। বাধ্য হয়ে ছুটল রানাও।

তিনতলায় পৌঁছে থামল বৃষক্ক। ডানদিকের দরজায় গুইসেপ ম্যালেটির একটা ভিজিটিং কার্ড সাঁটা দেখতে পেল রানা। ফ্রেমের পাশে কলিং বেলের সুইচ। বুড়ো আঙুল দিয়ে সুইচটা চেপে ধরল সনি—ধরেই থাকল।

ছয়-সাত সেকেণ্ড পর সামান্য একটু ফাঁক হল দরজাটা, এবং সাথে সাথেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল আবার। এ জন্যে তৈরিই ছিল সনি, ভেতরের ছিটকিনি তোলার সময় দিল না ম্যালেটিকে। ডান হাঁটু দিয়ে ধাঁই করে মারল সে দরজার ওপর প্রচণ্ড শক্তিতে। ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল ওটা ম্যালেটির ভুঁড়ির ওপর।

তীব্র আতঙ্ক আর যন্ত্রণায় অস্ফুটে কাতরে উঠল লোকটা, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল চিত হয়ে। এদিকে রানার চোখ কপালে উঠেছে ওদের বন্ধুত্বের নমুনা দেখে।

লম্বা পায়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সনি বাসিলি। ম্যালেটি ততক্ষণে উঠে বসেছে, ব্যস্ত চোখে পালাবার রাস্তা খুঁজছে। ডান হাত বাড়িয়ে তার নেকটাই মুঠো করে ধরল সনি, যেন মুরগির বাচ্চা তুলছে, এমন অনায়াস ভঙ্গিতে টেনে দাঁড় করাল তাকে।

ম্যালেটির মোটা গদানে ঐটে বসেছে নেকটাই, দম বন্ধ হয়ে এসেছে তার। মরিয়া হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে খামচি দেয়ার চেষ্টা করল সে সনির নাকে মুখে, কিন্তু অতদূর পৌঁছল না হাত। আরও কয়েক মুহূর্ত ধরে থাকল তাকে সনি, তারপর ছেড়ে দিল নেকটাই। পরমুহূর্তে ভয়ঙ্কর এক থাবড়া লাগাল তার বুকে।

চোখের পলকে তিন-চার পা পিছিয়ে গেল ম্যালেটি, মাঝখানের খোলা দরজা দিয়ে ওপাশের ডাইনিং রুমে গিয়ে থেমে গেল তার ছুটন্ত দেহ ডাইনিং টেবিলে ধাক্কা খেয়ে। সবে দুপুরের খাবার সাজিয়েছিল ম্যালেটি, সবসুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ল সে।

ট্রাউজারের পকেটে দু'হাত ভরে অলস ভঙ্গিতে সেদিকে এগোলো এবার সনি। ঠোট গোল করে শিষ দিচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে বসল গোয়েন্দা, দু'ভুরু পৌঁছে গেছে টাকের প্রান্তে। পর পর তিন-চারটে টোক গিলল সে। কয়েক পা এগিয়ে ম্যালেটির সামনে এসে দাঁড়াল সনি—হাসছে দাঁত বের করে।

‘শোন, ফ্যাটসো,’ কর্কশ গলায় বলল সে। ‘এ আমার বন্ধু,’ বুড়ো আঙুল দিয়ে রানাকে দেখাল। ‘কেউ যদি ওকে কামড়ায়, কামড়টা আমার গায়েও পড়বে। বুঝতে পারলে কিছু?’

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ম্যালেটি। কিছু বলতে চাইল, কিন্তু স্বর ফুটল না, আটকে গেছে স্নেহায়।

‘শুনেছি এর বিরুদ্ধে কিছু তথ্য প্রমাণ জোগাড় করেছ তুমি। লিখিত রেকর্ডস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। সত্যি?’

মাথা দোলাল গোয়েন্দা ইতিবাচক ভঙ্গিতে।

‘চিবিয়ে খেয়ে ফেল ওগুলো, আজই। কাল সকালে পেট পরিষ্কার করে দেখা করবে আমার সঙ্গে। ঠিক আছে?’

সারামুখ ঘামে জবজবে হয়ে গেছে ম্যালেরিয়ার। আবার মাথা ঝাঁকাল সে। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'সি...সি!'

রানার দিকে ফিরল সনি। 'ঠিক আছে। আর ঘাঁটাবে না ও তোমাকে। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা।

'চিন্তা কোরো না,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল সনির। 'ওর কাছে যেমন তোমার জন্যে ক্ষতিকর রিপোর্ট আছে, আমার কাছেও তেমনি ওর জন্যে ক্ষতিকর কিছু আছে। যা পুলিশের হাতে গেলে ওকে নিদেন পক্ষে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে,' ঘুরেই ম্যালেরিয়ার ভুঁড়ির ওপর হালকা একটা লাথি বসিয়ে দিল সে। 'না কি বল, ফ্যাটসো?'

কুঁকড়ে গেল ম্যালেরি। কোনরকমে বলল, 'সি...সি, সেনর।'

'কাল তাহলে আসছ আমার ওখানে?'

'অবশ্যই! অবশ্যই!'

এগার

মেইন রোডে এসে ট্যাক্সি নিল মাসুদ রানা। ফিরে চলল পাসকোয়েল ক্লাবের দিকে। অন্তত একটা ঝামেলা চাপা দেয়া গেছে আপাতত, মনে মনে বলল ও, এবার অন্য দুটোর দিকে

নজর দিতে হবে। অবশ্য কার নির্দেশে ম্যালেটি প্রথম থেকে নজর রাখছিল সোফিয়ার ওপর, জানা গেল না। কি ভেবে মৃদু হাসল রানা। ঠিক আছে, ভাবল, আজই জেনে নিতে হবে।

চাইলে অবশ্য এখনই ম্যালেটির ওখানে ফিরে গিয়ে তথ্যটা আদায় করা যায় সনির সাহায্যে, কিন্তু মন সায় দিল না তাতে। এ ব্যাপারে সনি কিছু জানুক, চায় না রানা। তাছাড়া বলা যায় না, পঁাদানির মাত্রা বেশি হয়ে গেলে ম্যালেটি হয়ত ফট করে রানার গতরাতের অভিযানের কথা ফাঁস করে দিতে পারে।

কে জানে, এরই মধ্যে হয়ত সেকাজটি সেরেও ফেলেছে গোয়েন্দা। সনি জেনে গেছে, বাঘের ঘরে ঘোগ ঢুকেছিল কাল রাতে। জানুকগে! কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ ~~রানা~~ কেয়ার করে না ও।

পাসকোয়েল ক্লাবের সামনে ট্যাক্সি বন্দিয় করল রানা। রেখে যাওয়া সোফিয়ার লিঙ্কন কনভার্টিবলটা নিয়ে ফিরে চলল ঝাংলোয়। সাড়ে তিনটে বাজে। প্রচণ্ড গরমে জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা। খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকছে, অথচ গায়ের ঘাম শুকোতে চাইছে না।

পশ্চিম আকাশে মেঘ জমেছে। আবার যে-কোন সময়ে শুরু হয়ে যাবে বৃষ্টি। ঝাংলোয় ফিরেই বাথরুমে ঢুকল মাসুদ রানা। বিশ মিনিট ধরে গোসল করল ঠাণ্ডা পানিতে। শরীর আর মাথার চাঁদি ঠাণ্ডা হল তাতে ঠিকই, কিন্তু মন শান্ত হল না। বার বার নিজেকে প্রশ্ন করছে ও, কে সোফিয়ার পিছনে লাগিয়েছিল ম্যালেটিকে? কে? কেন?

চারটে বাজার দু'মিনিট আগে টেলিফোনের সামনে এসে বসল মাসুদ রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল—চিন্তিত।

ততক্ষণে পুরো আকাশ ছেয়ে গেছে সুরমা রঙের মেঘে, সাঁঝের
অন্ধকার নেমেছে শহরে। খানিক মরা পাতা আর ধুলো ওড়াল
এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস, তারপর আচমকা শুরু হল বৃষ্টি।

আগে থেকে যেন প্ল্যান করাই ছিল, একই সঙ্গে টেলিফোনটাও
বাজল। ঘড়ি দেখল রানা চট করে। মনে মনে প্রশংসা করল
ছেলেটার সময়জ্ঞানের।

‘বলো!’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও। ‘কতদূর কি করতে পেরেছ?’

নানারকম ঘ্যাঁশ ঘোঁশ, শৌ-ও শৌ-ও আওয়াজ ছাপিয়ে
শফিকুর রহমানের গলা শোনা গেল। ‘নামটা নিয়ে কনফিউশনে
পড়েছি, মাসুদ ভাই,’ বলল সে। ‘আপনি শিওর সনি বাসিলি ওর
নাম? ভুল নেই?’

‘তাই তো জানি,’ দ্বিধাবিহীন গলায় বলল রানা।

‘আরেকটু জোরে বলুন! শোনা যাচ্ছে না পরিষ্কার। শব্দ
কিসের, বাথরুমের দরজা খোলা নাকি?’

হেসে ফেলল রানা। গলা চড়িয়ে বলল, ‘ন্যাচারাল শাওয়ার!’

‘জি? ও, বৃষ্টি?’

‘হ্যাঁ।’

‘আচ্ছা। ওনুন, লোকটার নাম সম্ভবত কারলোটি। জেরি
কারলোটি।’

‘তাই নাকি?’ সিঁধে হয়ে বসল রানা। ছাই ঝাড়ল
অ্যাশট্রেতে।

‘যে বর্ণনা দিলেন, তাতে সেরকমই মনে হচ্ছে। লম্বা, ব্রড
শোভারড, ডান গালে কাটা দাগ, কানে রিঙ, সব মিলে যাচ্ছে।
ওর গলার স্বর কেমন, খুব মোটা না?’

‘হ্যা, সাঙঘাতিক মোটা।’

‘ও তাহলে কারলোটি!’ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল শফিক। ‘কোন ভুল নেই তাতে।’

‘অল রাইট। কি কি জান ওর ব্যাপারে, বল।’

‘ভীষণ দাঙ্গাবাজ টাইপের। হাত চলে কথার আগে। কারলোটি যেখানে, সমস্যাও সেখানে। র্যাটলস্নেকের মত বিপজ্জনক। নিউ ইয়র্কেই থাকত, হঠাৎ গায়েব হয়ে গেছে কিছুদিন আগে। সম্ভবত ইটালিতেই আছে সে।’

‘নিউ ইয়র্ক ছেড়েছে কবে?’

‘মাসখানেক আগে। কুখ্যাত ড্রাগ ব্যবসায়ী ইটোলা গ্র্যান্ডির গানম্যান এই বাইসনটা, লেফটেন্যান্ট। আলবার্তো ফেলিনি নামের আরেক গ্যাঙস্টারের সাথে ড্রাগ নিয়ে একটা ঝামেলা বেধেছিল গ্র্যান্ডির। এরপর মার্কিন সরকার গ্র্যান্ডির নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয়। ওর পর থেকেই লাপাত্তা গ্র্যান্ডি। পুলিশের ধারণা কারলোটি তার সঙ্গেই আছে, যেখানেই হোক।’

রানা নিশ্চিত, ওর ধারণার সঙ্গে বাকিটুকুও মিলে যাবে। ‘কারলোটির আর কোন অ্যাক্টিভিটির খবর জান?’

‘অল্প অল্প। কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কে দেখা গেছে কারলোটিকে। খুব অল্প সময়ের জন্যে অবশ্য। পুলিশ কিছু টের পাওয়ার আগেই কোথাও মুখ লুকিয়েছিল। এই ঘটনার দু’দিন পর নিহত হয় আলবার্তো ফেলিনি। হত্যাকাণ্ডটির জন্যে কারলোটি-ই দায়ী বলে সবার বিশ্বাস। কিন্তু কোন প্রমাণ নেই।’

‘আছে,’ বলল রানা। ‘প্রমাণ আছে আমার কাছে। গতমাসের উনত্রিশ তারিখ নিউ ইয়র্ক গিয়েছিল কারলোটি ছয়দিনের জন্যে।

রোম ফিরেছে আবার এ মাসের ছয় তারিখে। ভ্রমণ করেছে সনি বাসিলি নামে।’

‘তাই নাকি?’ লাফিয়ে উঠল শফিক। ‘বলেন কি? তাহলে তো ঠিকই আছে। পাঁচ তারিখ রাতে খুন হয়েছে ফেলিনি...কিন্তু, কি প্রমাণ আছে আপনার হাতে, মাসুদ ভাই?’

‘ওর প্লেনের টিকেটটা এখন আমার পকেটে।’

‘সে কি! ওর সঙ্গে বাধিয়েছেন নাকি খটমটি?’

‘আমি না। ও-ই বাধিয়েছে। ঠিক আছে, শফিক। অনেক ধন্যবাদ ইনফরমেশনের জন্যে। রাখি এবার।’

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে মারল মাসুদ রানা। তারপর পায়চারি করে বেড়াতে লাগল ঘরময়। নিশ্চিত হওয়া গেছে সনি বাসিলি ওরফে জেরি কারলোটির ব্যাপারে, যদিও এ নিয়ে খুব বেশি উৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই এ-মুহূর্তে। শুধু প্লেনের টিকেট দেখিয়ে জুরীদের প্রভাবিত করা সম্ভব হবে না।

এসব থিওরি। যতক্ষণ না থিওরিগুলোকে বাস্তবতার সঙ্গে খাপে খাপে মেলানো সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ মনকে কেবল সান্ত্বনা দেয়া যাবে, আর কোন লাভ হবে না। তবুও রানা সন্তুষ্ট, সঠিক পথেই এগোচ্ছে ও। এবার আরেকটু সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে। সত্যের কাছাকাছি হওয়া গেছে, এখন হিসেব করে পা ফেলতে হবে।

ওইসেপ ম্যালেটির রিপোর্ট নিয়ে পড়ল রানা আবার। জবর এক ধাঁধা। সবার সব ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট লেখা হয়েছে, অথচ জেরি বা সারার উল্লেখমাত্র নেই এতে। রানা কবে সোফিয়াকে নিয়ে হোটেল-রেস্তোরাঁয় গেছে, কখন ছবি দেখতে

গেছে, তার সময় পর্যন্ত উল্লেখ করা আছে। অথচ জেরির সাথে যে লুইগি রেস্টোরাঁয় গিয়েছিল মেয়েটি, তা গোয়েন্দাপ্রবরের চোখে পড়েনি।

এসব দেখে-শুনে মনে হয় ম্যালেরিটিকে যে-ই এ কাজে নিয়োগ করে থাকুক, সারা-জেরির মিত্র সে। নিশ্চয়ই ওদের বিষয়টা চেপে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সে লোকটিকে। অথবা, হয়ত এই রিপোর্ট দুই এক দিনের মধ্যেই তৈরি করেছে সে, চেপে গেছে আগেরটা ইচ্ছেকৃতভাবেই।

যখন টের পেয়েছে লোকটা যে এ গেরো থেকে রানার মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, তখনই মাথা খাটিয়ে এটা তৈরি করেছে, ভয় দেখিয়ে ওর কাছ থেকে টু-পাইস কামিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে।

বৃষ্টি অনেক আগেই থেমে গেছে। ঝকঝকে নীল আকাশে লক্ষ কোটি তারার মেলা বসেছে। রাত হয়েছে অনেক। ধীরে ধীরে কমে আসছে শহরের কোলাহল।

ঘিঞ্জি এক বাণিজ্যিক এলাকা, অনেকটা ঢাকার নবাবপুর রোডের মত। তবে রাস্তাটা আরও সরু। দু'পাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য অফিস বিল্ডিং, একে অন্যের গায়ে হেলান দিয়ে। এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে আছে যেন পাড়াটা।

যে বিল্ডিংয়ে আই. আই. এ.-র অফিস, ওটা ছাড়িয়ে আরও গজ বিশেক গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল মাসুদ রানা। একজন মানুষ মোটামুটি চলতে পারে এ ধরনের একটা তস্য গলি আছে এখানে। রাস্তায় আলো আছে, তবে টিমটিমে। চারদিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে

নেমে পড়ল রানা গাড়ি থেকে । খানাখন্দে বৃষ্টির পানি জমে আছে ।
সেদিকে চোখ রেখে ঢুকে পড়ল ও গলিটার মধ্যে ।

ঠিকই আছে, গলির শেষ মাথায় এসে নিশ্চিত হল রানা ।
আরেকটা সরু রাস্তা আছে বিন্দিংগুলোর পিছনদিকে । এই
তস্যগলি মাঝখানের যোগসূত্র । খুঁজে খুঁজে নির্দিষ্ট বিন্দিংটার
পিছনে এসে দাঁড়াল রানা, এটার নিচতলাতেই ইন্টারন্যাশনাল
ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির অফিস ।

জেনিটর'স এন্ট্রান্সটা বন্ধ । নব ঘোরাল রানা । তালা মারা ।
পাঁচ সেকেণ্ড ব্যয় হল রানার দরজাটা খুলতে । চারদিকে
আরেকবার ভাল করে নজর বোলাল ও । আবছা আলো-আঁধারিতে
পরিষ্কার দেখা যায় না কিছুই । অর্থাৎ, ওকেও কেউ দেখতে পাচ্ছে
না ।

চট করে ঢুকে পড়ল রানা ভেতরে । ছিটকিনি লাগিয়ে খুদে
টর্চলাইটটা জ্বালল । নোংরা একটা করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও ।
পাঁচ-ছয় গজ সামনে একটা বাঁক দেখতে পেয়ে পা বাড়াল ।
বাঁকের মুখে একদিকে ছোট একটা কিচেন, অন্যদিকে বাথরুম ।
ওগুলো ছাড়িয়ে আরও তিন পা এগোতে আরেকটা দরজা পড়ল ।

ঠেলা দিতে খুলে গেল দরজাটা । সামনেই এক সারিতে চারটে
ছোট ছোট রুম । প্রতিটি দরজার সাথে ঝুলছে একটা করে প্লাস্টিক
বোর্ড, সবগুলোই আই. আই. এ.-র । দরজাগুলোর নিচের অংশ
কাঠের, ওপরেরটুকু ঘষা কাঁচের । নাকে কেমন একটা বোঁটকা
গন্ধ যেতে এদিক ওদিক আলো ফেলতে লাগল রানা ।

প্রতিটি দরজার সামনে একটা করে ছোট ডাস্টবিন । উপচে
পড়ছে আবর্জনা । শূন্য দুধের বোতল, টিনজাত মাছের ফেলে

দেয়া কনটেইনার এবং সিগারেটের প্যাকেটসহ আরও অনেক কিছুই রয়েছে ওতে। সম্ভবত রোজকারটা রোজ পরিষ্কার করা হয় না এগুলো, সারাদিন ধরে জমে ওঠা আবর্জনা পরদিন সকালে সাফ করা হয়।

প্রথম রুমটায় ঢুকল মাসুদ রানা। ভেতরের সাজ-সজ্জা দেখে মনে হয় কোন এক্সিকিউটিভের রুম হবে এটা। মাঝখানের পারটেক্স পার্টিশনের সঙ্গে পাশের রুমে যাওয়ার জন্যে রয়েছে কানেকটিং ডোর। ঘুরতে ঘুরতে শেষের রুমটায় এসে থামল রানা। ইন-ট্রে দেখে বোঝা গেল এটাই খুঁজছিল ও, গুইসেপ ম্যালেট্রি বসে এটায়। একটা হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গোটা চারেক চেয়ার আর একটা ফাইলিং কেবিনেট ছাড়া আর কোন ফার্নিচার নেই এ-রুমে। সবগুলোই পুরানো এবং নড়বড়ে।

অনেকক্ষণ খোঁচাখুঁচি করে ফাইলিং কেবিনেটটা খুলল রানা। ভেতরে অসংখ্য ফাইলপত্র স্তুপ করে ফেলে রাখা হয়েছে। ধুলো, ঝুল জমে যাচ্ছেতাই অবস্থা। কতদিন ঝাড়মোছ করা হয়নি কে জানে। পুরো পনের মিনিট ব্যয় করল রানা ওটার পিছনে। কিন্তু যা খুঁজছিল, পাওয়া গেল না।

এবার ম্যালেট্রির টেবিলটার ওপর নজর দিল রানা। ডানদিকে মোট তিনটে ড্রয়ার—তিনটেই তালা মারা। নিচেরটা থেকে শুরু করল রানা। খোলার আগে পুরো পাঁচ মিনিট ভোগাল তালাটা। ড্রয়ারটা খুলে ভেতরে চোখ বোলাল ও, সাথে সাথেই বুক চিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। পাওয়া গেছে!

একটামাত্র ফাইল ছাড়া আর কিছু নেই ভেতরে। ফাইল কাভারে লাল বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখাঃ সোফিয়া তিঙ্ক অবকাশ-২

শেরম্যান ।

কপালের ঘাম মুছে ফাইলটা বের করল রানা । বসল ম্যালেট্রির চেয়ারে । ধীরে ধীরে ফাইল কাভার ওল্টাল । বেশ অনেকগুলো পাতা রয়েছে ফাইলে ।

ফাইল শুরু হয়েছে এভাবেঃ অ্যাকটিং অন দ্য ইনস্ট্রাকশন অভ লা সেনরিনা প্যামেলা শেরম্যান, টু-ডে আই হ্যাভ অ্যারেঞ্জড উইথ মাই অ্যাসোসিয়েটস টু কীপ এ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ওয়াচ অন লা সেনরিনা সোফিয়া শেরম্যান...

ঠোট ছুঁচোলো করে শিস দিয়ে উঠল রানা নিচু স্বরে । প্যামেলা শেরম্যান! তাহলে এই কেচ্ছা! তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে চলল ও, ভেতরে সাপ-ব্যাঙ কি কি আছে জানা দরকার । কয়েক পাতা উল্টে যেতে নিজের নামটা চোখে পড়ল, সাথে সাথে ব্রেক কষল রানা । ওর আর সোফিয়ার ব্যাপারে পুরো দশ পাতার রিপোর্ট রয়েছে এখানে । রিপোর্টটার শুরুতে লেখাঃ কপি অভ দিস রিপোর্ট সেন্ট টু লা সেনরিনা প্যামেলা, রিজ হোটেল, প্যারিস, টু-ডে দ্য...অগাস্ট...

বুকটা কৈঁপে উঠল রানার ধড়াশ করে । দ্রুত পড়ে ফেলল ও রিপোর্টটা । পড়া শেষ হতে হাঁ করে বেকুবের মত চেয়ে থাকল দেয়ালের দিকে । সকালে ওর হাতে যে রিপোর্টটা দিয়েছিল ম্যালেট্রি, তাতে অনেক কিছুই উল্লেখ ছিল না; যেগুলো এখানে আছে ।

তার মধ্যে সরেনটোয় সোফিয়ার ভিলা ভাড়া করার প্ল্যান থেকে শুরু করে এ নিয়ে ওদের যাবতীয় আলাপ-আলোচনা, সেই সঙ্গে এমনকি মিস্টার অ্যাও মিসেস রবার্ট হুইটনি নাম গ্রহণের

ব্যাপারে ওদের প্রতিটি কথোপকথন ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ও পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘেমে উঠল রানা। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, নিশ্চয়ই সোফিয়ার অ্যাপার্টমেন্টেও মাইক্রোফোনের সাহায্যে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করেছিল ম্যালেরি। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এই রিপোর্টের একটা কপি অনেক আগেই পৌঁছে গেছে প্যামেলার হাতে। সম্ভবত সোফিয়ার মৃত্যুর আগেই।

অর্থাৎ সরেনটোয় যখন মেয়েটির সাথে পরিচয় হয় ওর, তার আগে থেকেই সে জানত যে রানা-ই সেই রবার্ট হুইটনি। অথচ চেপে গেছে পুরো ব্যাপারটা। জানায়নি কাউকে। এমনকি রানাকে পর্যন্ত কিছুই টের পেতে দেয়নি। কেন? কি অর্থ হতে পারে এর? অন্তত প্যামেলার তো সন্দেহের কোন অবকাশ-ই থাকতে পারে না যে রানা-ই হত্যা করেছে সোফিয়াকে? তারপরও কেন...।

হঠাৎ জমে গেল রানা। পিছনের গলিতে থপাস থপাস পায়ের আওয়াজ! টর্চ নিভিয়ে চুপ করে বসে থাকল ও। যে-ই হোক, এদিকেই আসছে লোকটা। একটু পর আচমকা হুড়মুড় করে ভারি কিছু একটা আছড়ে পড়ল পথের ওপর। সাথে সাথে মোটা জড়ানো গলার অশ্লীল খিস্তি শুনে হেসে উঠল রানা। কোন মাতাল হবে নিশ্চয়ই।

উঠে দাঁড়াল রানা। শার্টের ওপরের দুটো বোতাম খুলে ফাইলটা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। এবার ফেরা দরকার।

বার

এয়ারপোর্টের উদ্দেশে বেরোবার আগে লিজা ভ্যালিটিকে ফোন করল মাসুদ রানা। সোফিয়ার জিনিসপত্র প্যাকিং করার বাকি কাজটুকু সেরে ফেলার কথা বলে যেতে হবে তাকে।

‘হ্যালো, রানা,’ ওর সাড়া পেতেই গলা চড়াল মেয়েটি।
‘তোমার দু’দিন ক’দিনে হয়? আর কত ঘোরাবে?’

‘আর মাত্র একদিন। তারপরই জানবে সব। যে জন্যে ফোন করলাম সেটা শোন আগে। আমি নেপলস যাচ্ছি, আজই সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে ফাইন্যাল রিপোর্ট দেবে পুলিশ। ওখানে থাকতে হবে।’

‘বুঝলাম। কিন্তু আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন তুমি?’

‘বাধ্য হয়ে। তবে এবার কথা দিচ্ছি, আর ঘোরাব না। নেপলস থেকে ফিরেই সব জানাব। এবার শোন। আজই সোফিয়ার জিনিসপত্র প্যাকিংয়ের কাজে হাত লাগাও তুমি। যতদূর পার এগিয়ে রাখ। অ্যাপার্টমেন্টের চাবি বিন্দিং পোর্টারের কাছে আছে। চাইলেই দিয়ে দেবে।’

‘তারপর?’

‘কাল যে-কোন সময় ফিরব আমি। ফিরেই তোমাকে ফোন

করব।’

‘প্রমিজ?’

‘প্রমিজ।’

‘কিন্তু তুমিও নেই আমিও নেই, অফিস চলবে কিভাবে?’

‘একদিন রোম অফিস না চললে তোমার নিউ ইয়র্ক ভিশন বন্ধ হয়ে যাবে না।’

‘ঠিক আছে, যাচ্ছি।’

‘গুড গার্ল।’

ঠিক সাড়ে দশটায় নেপলস-এ অবতরণ করল বোয়িং। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল ও। হোটেল ভিসুভিয়াসে নিজের জন্যে সুইট বুক করল মাসুদ রানা। তারপর ছুটল করোনারের কোর্টের উদ্দেশে। এগারটা বিশ বাজে তখন।

উৎসাহী দর্শকদের মধ্যে দু’তিনজন স্থানীয় সাংবাদিকও রয়েছে কোর্টে। প্রথম সারির এক কোণে লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি আর গুইডোকে বসা দেখল রানা। চোখাচোখি হতে গুইডোর মুখে হালকা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। পলকহীন চোখে রানার দিকে চেয়ে থাকল সে দীর্ঘক্ষণ, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। ফ্রেনজি সামান্য মাথা দোলাল, উঠে এসে কথা বলার কোন আগ্রহ দেখাল না।

বসে পড়ল মাসুদ রানা। ওর মুখোমুখি বসে আছেন করোনার, সলোয়া ক্যানডালো। মানুষটি ছোটখাট, টাকমাথা। খাড়া, লম্বা নাক। চাউনি দেখলে মনে হয় সারারাত প্রচুর কান্নাকাটি করেছেন। রানার দিকে সরাসরি তাকাচ্ছেন না ভদ্রলোক, ব্যাপারটা লক্ষ করে অস্বস্তিতে পড়ল ও। তাকাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তিস্ত অবকাশ-২

যাতে চোখাচোখি না হয়ে যায়, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক। ঠিক সময়ে তাঁর দৃষ্টি ঠেকছে গিয়ে ওর মাথার ছ' ইঞ্চি ওপরে।

কোর্টের কাজ শুরু হল। প্রথমেই সাক্ষী হিসেবে ডাকা হল মাসুদ রানাকে। শুরু হল বিরক্তিকর একঘেঁয়ে জিজ্ঞাসাবাদপর্ব।

‘আপনি-ই আইডেন্টিফাই করেছিলেন লা সেনরিনা সোফিয়ার ডেডবডি?’ প্রশ্ন করা হল রানাকে।

‘হ্যাঁ।’

‘তিনি সরেনটো কেন গিয়েছিলেন জানেন আপনি?’

মাথা দোলাল রানা। ‘জানি না। তবে শুনেছি।’

‘কার কাছ থেকে শুনেছেন?’

‘লেফটেন্যান্ট ভিটোলা ফ্রেনজির কাছ থেকে,’ খুতনি তুলে অফিসারকে নির্দেশ করল ও।

‘কিন্তু ওটা তো অনুমান। প্রাপ্ত তথ্য এবং যুক্তির ওপর দাঁড় করানো পুলিশী ওপিনিয়ন। আমরা ফ্যাক্টস জানতে চাইছি।’

‘দুর্গথিত। ফ্যাক্টস আমিও খুঁজছি। জানতে পারিনি এখনও।’

‘আই সী,’ গাল চুলকালেন প্রশ্নকর্তা। ‘বেশ। তাহলে যা শুনেছেন, সেটাই না হয় আরেকবার শোনান আমাদের।’

বলতে লাগল রানা। সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখা গেল উপস্থিত সাংবাদিকদের—নোটপ্যাডে হাত চলছে তাদের তুফান বেগে।

ও ধামতে আবার জানতে চাওয়া হল, ‘লা সেনরিনা যে মিসেস রবার্ট হুইটনি নাম ধারণ করেছিলেন, সে ব্যাপারে জানেন কিছু?’

আবার ফ্রেনজিকে দেখাল রানা। ‘ওর মুখে শুনেছি। সত্যি-মিথ্যে কিছুই জানি না।’

‘আচ্ছা, আপনি কি জানেন, লা সেনরিনার নামে একটা জঘন্য দুর্নাম আছে? তিনি একজন ব্র্যাকমেইলার ছিলেন?’

লেফটেন্যান্ট গুইডোর সঙ্গে চোখাচোখি হল রানার। আবার ঠোট বেকে গেছে লোকটার। মাথা দোলাল ও। ‘না। জানি না।’

আরও কিছু গৎ বাঁধা প্রশ্ন করা হল ওকে। প্রতিবারই ‘জানি না’ বলে জানাল রানা। অবশেষে করোনারের হাত ইশারায় কাঠগড়া থেকে নামল ও। ডাকা হল ভিটেলা ফ্রেনজিকে। লোকটির বক্তব্য শুনতে শুনতে সোজা হয়ে গেল সাংবাদিকরা।

বক্তব্য শেষ হতে রিপোর্ট সাবমিট করার জন্যে আরও সাতদিন সময় প্রার্থনা করল ফ্রেনজি। বলল, ‘এই সংক্ষিপ্ত তদন্তে সন্তুষ্ট হতে পারিনি আমি। আমার বিশ্বাস, লা সেনরিনা খুন হয়েছেন, তাঁর মৃত্যু কিছুতেই দুর্ঘটনাজনিত হতে পারে না। এই সাতদিন সময় মঞ্জুর করা হলে আমি তা প্রমাণ করে দেব।’

‘আপনি শিওর?’ জিজ্ঞেস করলেন করোনার। কুঁচকে আছে চোখমুখ।

‘ওভার শিওর!’ দৃঢ় আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করল ফ্রেনজি।

মুখভঙ্গি পাল্টে গেল সলোয়া ক্যানডালোর। মনে হল আচমকা দাঁতে ব্যথা শুরু হয়েছে তাঁর। উভয় সন্ধটে পড়েছে লোকটা। রানা নিশ্চিত, সময় চাওয়া হবে, এবং তা অনুমোদিত হবে, এ নাটক আগেই ঠিক করা ছিল। কিন্তু শেষ সময়ে এসে দ্বিধায় পড়ে গেছে করোনার। নিশ্চয়ই ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের নির্দয় মুখটা চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে তাঁর।

এক সময় চমক ভাঙল করোনারের। ঘাঁস ঘাঁস করে কি যেন লিখলেন তিনি। অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, ‘অ্যাডজর্নমেন্ট ফর তিস্ত অবকাশ-২

সেভেন ডেজ গ্র্যান্টেড ।’

বলেই তড়াক করে আসন ছাড়লেন ভদ্রলোক, প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন কোর্টরুম ছেড়ে। যেন ভয় পেয়ে গেছেন এ ধরনের স্থগিতাদেশ দেবার আইনগত কোন অধিকার তাঁর আছে কি না সে ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করে বসতে পারে।

এক মিনিটের মধ্যে ফ্রেনজিকে চারদিক থেকে ছেকে ধরল সাংবাদিকরা। একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল তারা। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্ন এড়িয়ে গেল ফ্রেনজি। ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। এবার রানার দিকে ছুটে এল লোকগুলো।

মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে বলল রানা, ‘আজই এসব ছাপতে যাবেন না। দু’দিন অপেক্ষা করুন। গুজব পছন্দ করেন না ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান।’

‘কেন?’ মুখিয়ে উঠল এক সাংবাদিক। ‘সংবাদ ছাপতে নিষেধ করার কে আপনি?’

‘সংবাদ ছাপতে নিষেধ করিনি, গুজব ছাপতে নিষেধ করেছি।’ তাতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন লা সেনরিনার বাবা।’

‘ইহু!’ গজ গজ করতে লাগল লোকটা। ‘তাতে বয়েই গেছে আমাদের।’

‘দ্যাট’স আপ টু.ইউ,’ কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘আমার সতর্ক করে দেয়া কর্তব্য, করলাম। সময় থাকতে আপনাদের সাবধান করিনি বলে পরে হয়ত আমাকেই দোষারোপ করবেন।’

‘সেনর রানা...’

ডিড় ঠেলে এগোতে যাচ্ছিল রানা, থেমে পড়ল। ঘুরে পিছনে তাকাল। লেফটেন্যান্ট ওইডোকে দেখা গেল। হাসছে মিটিমিটি।

‘হ্যালো! কিছু বলবেন?’

‘হ্যাঁ, সেনর। একটা ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা দরকার।’
‘শিওর। বলুন।’

‘আপনার মত লম্বা চওড়া একজনকে খুঁজছি আমরা। আই মীন, ঠিক আপনার মত ফিগার তার। লোকটাকে লা সেনরিনার মৃত্যুর দিন দেখা গেছে সরেনটোয়।’

‘সো?’ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রানা।

‘একটা আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের ব্যবস্থা করেছি আমি। ওখানে একবার যেতে হবে আপনাকে দয়া করে।’

‘আমাকে!’ বিস্মিত হওয়ার ভান করল ও। ‘কেন?’

‘ওই যে বললাম, আপনার মতই ফিগার লোকটার। দুর্ভাগ্য-জনক ব্যাপার, বুঝলেন? কষ্ট করে একটু না গেলেই নয়।’

‘কিন্তু...আমি তো...।’ আমতা আমতা করতে লাগল রানা।
‘হাতে খুব জরুরি একটা কাজ আছে।’

‘সামান্য কয়েক মিনিটের ব্যাপার, সেনর,’ বলল গুইডো।
‘আমার সাথে আসুন, প্লীজ।’ শেষটুকু বলল প্রায় আদেশের ভঙ্গিতে। ঘুরে দাড়াল লোকটা। সম্ভবত তার নীরব ইশারাতেই পোশাকধারী দু’জন পুলিশ কনস্টেবল এগিয়ে এল রানার দিকে। দাঁত বের করে হাসছে।

‘কোথায় যেতে হবে?’

‘পুলিস হেডকোয়ার্টারস্-এ, সেনর,’ বলল এক সেপাই।

‘চলুন।’

বাইরে অপেক্ষমান পুলিশের জীপে এসে উঠল ওরা। রানাকে পিছনের একটা সিটে বসানো হল। সেপাই দুজন বসল মুখোমুখি।

লেফটেন্যান্ট গুইডো উঠল ড্রাইভারের পাশে। ব্যস্ত রাজপথ ধরে ছুটল জীপ পুলিশ হেডকোয়ার্টারের দিকে।

সামনেই ফ্রেনজিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে দ্রুত একটা কক্ষে ঢুকে পড়ল লোকটা। অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল রানার, অমন চোর চোর ভাব কেন ব্যাটার? ভেতরে বড় একটা রুমে ঢোকানো হল ওকে।

মাঝখানে কাঁচের পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগ করা হয়েছে রুমটা। আগে থেকেই আরও দশজন লোক দাঁড়িয়েছিল রুমে এক সারিতে। রানাকে তাদের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল দুই সেপাই। শূন্য দৃষ্টিতে কাঁচের ওপাশটা দেখছে মাসুদ রানা। দু'তিনটে খটখটে কাঠের চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই ওদিকে।

খানিক পরে সঙ্গীদের দিকে নজর দিল ও। দু'জন আমেরিকান এবং দু'জন জার্মান রয়েছে তাদের মধ্যে—বাকি ছ'জন ইটালিয়ান। একমাত্র আমেরিকান দু'জন আর ও নিজে ছ'ফুটের কাছাকাছি। অন্যরা কেউ-ই পাঁচ ফুট আটের বেশি হবে না।

একটু পর পাশ থেকে লেফটেন্যান্ট গুইডোর গলা শুনল মাসুদ রানা। 'মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, সেনর,' বলল সে। 'এখনই শেষ হয়ে যাবে ঝামেলা।' কথা শেষ হতেই বেরিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট।

এর পরপরই কাঁচের ওপাশে উদয় হল সে, ফ্রেনজি এবং একজন ইটালিয়ান। চেয়ারে বসল তারা। গুইডো হাত ইশারায় সামনে দণ্ডায়মান লোকগুলোর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দ্রুত ঠোট নড়ছে তার, কিন্তু কি বলছে শোনা যাচ্ছে না।

তাকে ছেড়ে লোকটার দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। অতি

সাধারণ চেহারা, চোখে পড়ার মত বিশেষ কিছু নেই সেখানে। সারা গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি—চোখ দুটো লাল। চাউনিতে কেমন একটা অপ্রস্তুত ভাব। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বুঝল রানা, এ সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার, সে রাতে মরণপণ করে নেপলস পৌছে দিয়েছিল তাকে।

এখনও লোকটার কানের কাছে বক বক করে চলেছে ওইডো। বারবার হাত তুলে এদিকটা দেখাচ্ছে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার টের পেল ও, লোকটার হাতটা ঘুরেফিরে ওকেই নির্দেশ করছে। তবে ব্যাপারটা ইচ্ছেকৃত কি অনিচ্ছাকৃত বুঝতে পারল না। ফ্রেনজি চুপচাপ। কোন কথা বলছে না।

সারির ও মাথা থেকে প্রতিটি মুখের ওপর কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে থমকে রানার ওপর এসে সেঁটে গেল লোকটার দু'চোখ। প্রমাদ গুণল ও। ঘামতে শুরু করল। বুকের মধ্যে ধড়াশ ধড়াশ করছে প্রাণপাখি। চার-পাঁচ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল লোকটা, অথচ রানার মনে হল যেন যুগ যুগ ধরে দেখছে সে ওকে নিম্প্রাণ দুই পাথরের চোখ মেলে।

অবশেষে নড়ে উঠল লোকটা একসময়। কিছু বলল ওইডোকে। মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে বলল সে। কপালের ঘাম মোছার ইচ্ছে হল রানার খুব, কিন্তু বহুকষ্টে নিজেকে সামলে রাখল। ওইডো চেয়ে আছে ওরই দিকে। ঠোঁটে ঝুলছে তিক্ত হাসি।

কেন হাসছে হারামজাদা? নিজেকেই প্রশ্ন করল রানা, ড্রাইভার ব্যাটা কি চিনে ফেলেছে ওকে? জানিয়ে দিয়ে গেছে যে এই সেই লোক, যাকে খুঁজছেন আপনারা? এরপর আরেকজন ইটালিয়ানকে তিক্ত অবকাশ-২

ভেতরে নিয়ে আসা হল। লেফট লাগেজ অফিসের কেরানি। অন্য মুখগুলোর ওপর দিয়ে দ্রুত ঘুরে এল তার দৃষ্টি। সবার শেষে থামল এসে রানার ওপর।

নিজেকে সাহস দিল মাসুদ রানা। ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে নিজেকে চেয়ে থাকতে বাধ্য করল লোকটার দিকে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল ওরা একে অন্যের দিকে। এরপর অন্য দুই আমেরিকানের ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কেরানি, পা বাড়াল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। এরপর আরও দুই পুরুষ এবং এক মহিলাকে আনা হল। তাদের একজনকে চিনতে পারল রানা।

সরেনটো স্টেশনে যে রেস্টোরাঁয় এসপ্রেসো পান করেছিল ও, তার ওয়েটার লোকটা। একই ঘটনা ঘটল এবারও। সবার ওপর দিয়ে পিছলে এসে মাসুদ রানার ওপর থমকাল তার দৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে নজর নামাল সে। ওইডোর উদ্দেশে কিছু একটা বলল, তারপর বেরিয়ে গেল কক্ষ ছেড়ে।

বাকি দু'জন তাকালই না ওর দিকে। বরং ওপাশের আমেরিকানদের একজনের দিকেই বেশি ঝোঁক দেখা গেল এক মহিলার। তার সঙ্গিনী দৃষ্টির প্রতিউত্তরে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে উঠল আমেরিকান, যেন মজা পাচ্ছে খুব। পুরো তিন মিনিটও লাগল না। হাত ইশারায় প্যারেডের সমাপ্তি ঘোষণা করল ওইডো রানাসহ অন্যদের উদ্দেশে।

রানার সাথে সাথে সে-ও বেরিয়ে এল ওপাশ থেকে। হাসিটা আরও প্রশস্ত হয়েছে তার। 'ধন্যবাদ, সেনর,' বলল সে। 'এবং দেরি করিয়ে দেবার জন্যে দুঃখিত।'

‘না না, তাতে কি? যাকে খুঁজছিলেন, পেলেন তাকে?’

‘দুঃখিত, সেনর। এখনই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।’

‘আই সী! লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি কোথায়?’

‘তার সঙ্গে দেখা হবে না এখন। খুব ব্যস্ত আছে ও।’

পাল্টা হাসি দিল রানা। ‘ভুল করছেন। তার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন দেখি না আমি। শুধু একটা মেসেজ দিতে চাইছিলাম।’

‘তাই? ঠিক আছে, আমাকে বলুন। আমি জানিয়ে দেব।’

‘তাকে বলবেন, ইটোলা গ্র্যানডিকে অ্যারেস্ট করার ক্রেডিট যদি নিতে চায় সে, তাহলে যেন সরেনটো পুলিশ হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষা করে। অন্তত আজকের রাতটা,’ বলেই ঘুরে দাঁড়াল ও। গট গট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল স্টেশন থেকে।

ওদিকে খবর শুনে চোখ কপালে উঠে গেছে গুইডোর মহাবিশ্বয়ে। মাছের খাবি খাওয়ার মত বার দুয়েক টোক গিলল অজান্তেই। সংবিত ফিরতে দ্রুত পা বাড়াল সে রানাকে ধরার জন্যে, মেসেজটা সম্ভবত আরেকবার শুনতে চায়, বা কোন প্রশ্ন করতে চায়।

কিন্তু সে সুযোগ হল না। একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে ততক্ষণে মাসুদ রানা, তার নাকের সামনে দিয়ে ভাঁ করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। মিশে গেল অন্তহীন গাড়ির স্রোতে। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে থেকে চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল গুইডো। তারপর তীরবেগে ছুটল ভেতর দিকে। খবরটা দিতে হয় জায়গামত।

ফেরার পথে একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর চোখে পড়তে ট্যাক্সি থামাল মাসুদ রানা। ওখান থেকে একজোড়া বেদিং ট্রাঙ্ক কিনল
তিক্ত অবকাশ-২

কেবল, তারপর ছুটল হোটেলের দিকে। টেলিফোনে লম্বা লম্বের অর্ডার দিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে পদ্মাসনে বসে পড়ল তার নিচে। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড।

ট্যাক্সি ড্রাইভার, লেফট লাগেজ অফিসের কেরানি এবং রেস্টোরাঁর ওয়েটার, তিনজনেই যে চিনে ফেলেছে ওকে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই মনে। এখন শুধু সময়ের ব্যাপার, যে-কোন মুহূর্তে এসে হাজির হবে ফ্রেনজি আর গুইডো। অতএব যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, সময় নষ্ট করা চলবে না এক মুহূর্তও।

সোফিয়াকে হত্যা করা হয়েছে, পুলিশ নিশ্চিত সে ব্যাপারে। কাজেই এখন আর ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের কোন প্রভাবই কাজে আসবে না। এখন আরেকটু তৎপর হতে হবে রানাকে, তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতে হবে। মাসুদ রানা কোথাকার লাট দেখতে যাবে না পুলিশ। ও-ই সেই রহস্যময় রবার্ট হুইটনি, কেবল এটুকু জানলেই ওদের চলবে। মনে হয়, মনে হয় কেন, নিশ্চয়ই তা জেনেও গেছে ওরা। অতএব, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে... আপনমনে হেসে উঠল রানা।

ভাগ্যটা একটু প্রসন্ন হলেই হয় এখন।

তের

রাত ন'টা বেজে কয়েক মিনিট। সরেনটো স্টীমার স্টেশন। প্রচণ্ড ভিড়। ট্যাক্সি থেকে নামল মাসুদ রানা। হাতে ছোট একটা বাদামী কাগজের প্যাকেট। মাপা, দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল স্টেশনের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে। মানুষের ধাক্কায় পথ চলাই দায়। ঠেলে গুঁতিয়ে এগোতে লাগল ও। দুশো গজমত এগিয়ে থামল। আলোর ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় এখানটায়। লাইটপোস্ট থাকলেও বেশিরভাগই আলোহীন।

হারবারের বাঁধানো তীরে তিন-চারটে নৌকা বাঁধা দেখে খুশি হয়ে উঠল রানা। বৈঠাচালিত, পুরানো ধাঁচের নৌকা সবগুলো। ট্যুরিস্ট খদ্দেরের আশায় আছে। রানাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল মাঝিরা, ওকে দখল করার প্রতিযোগিতা পড়ে গেল।

সবচেয়ে বয়স্ক আর নিরীহ চেহারার মাঝিটিকে পছন্দ হল রানার। হাত ইশারায় লোকটাকে ডাকল ও। ভাঙা ভাঙা ইটালিয়ানে তাকে বোঝাল যে তিন-চার ঘন্টার জন্যে তার নৌকাটা ভাড়া নিতে চায় সে। তাকে সঙ্গে যেতে হবে না, রানা নিজেই বাইতে পারে।

প্রথমে খুশি হয়ে উঠলেও রানার বক্তব্য বুঝতে পেরে সন্দেহান

হয়ে পড়ল মাঝি। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে। রানার দু-দুটো পাঁচ হাজার লিরার নোট দেখে ঘন ঘন ঢোক নিঃশ্বাস নেন লাগল সে।

‘কোন চিন্তা নেই,’ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। নোট দুটো হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, ‘বোটের ক্ষতি হলে নতুন বোট পাবে। চুপ করে বসে থাক এখানে, যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।’

‘এরপরও কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলল মাঝি। তারপর মাথা দোলাল। রানাকে পথ দেখিয়ে নৌকায় নিয়ে এল। ‘কতদূরে যাবেন, সেনর?’

‘এই তো, হারবার মাউথ পর্যন্ত,’ বলল রানা।

‘সেনর বাইতে পারেন তো?’

হাসল ও। ‘নিশ্চই।’

গলুইয়ে বসে পড়ল রানা। বাঁধন খুলে নৌকাটা ঠেলে দিল মাঝি। গলা চড়িয়ে বলল, ‘সাবধানে চালাবেন, সেনর।’

‘সি, সি।’

অজস্র রোয়িং বোট, গনডোলা আর স্পীডবোটের ভিড় ঠেলে সাবধানে এগোলো ও। আধঘন্টার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পর উপসাগরে এসে পড়ল নৌকা। স্পীডবোট ভাড়া করলে এত ঝঙ্কি পোহাতে হত না, অনেক তাড়াতাড়িই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতে পারত রানা। কিন্তু ইচ্ছে করেই তা করেনি ও। নির্জন রাতে অনেক দূর থেকে শোনা যায় মোটরের আওয়াজ।

নৌকার নাকটা সিধে করে একটা সিগারেট ধরাল রানা। চমৎকার নির্মেষ আকাশ। লক্ষ-কোটি তারার মেলা বসেছে। যেন

সারা আকাশ জুড়ে এলোমেলো, অগোছালোভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ মুক্তোর দানার মত দ্যুতিময় নক্ষত্রগুলো। উপসাগরের ঢেউহীন মসৃণ পানি চিক চিক করছে সে আলোয়। কিন্তু প্রকৃতির শোভা দেখার সময় নেই এখন রানার, ও এখন জান বাঁচানোর সংগ্রামে ব্যস্ত।

ওর ব্যায়ামপুষ্ট, শক্তিশালী দুই বাহুর টানে দ্রুত এগিয়ে চলেছে নৌকা—নিঃশব্দে। দক্ষিণ থেকে ভেসে আসা মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস জুড়িয়ে দিচ্ছে দেহ-মন। মাইলখানেক এগিয়ে থামল মাসুদ রানা। পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। বেলা ভিসটার আবছা কাঠামোটাও চোখে পড়ল ওর। অন্ধকারে ডুবে আছে। বৈঠা তুলে রেখে বাদামী প্যাকেটটা খুলল রানা। একজোড়া বেদিং ট্রাঙ্ক বেরোল ভেতর থেকে। বসে বসেই শার্ট-প্যান্ট, জুতো-মোজা খুলল ও, তারপর পরে ফেলল বেদিং সুট।

আরও এক মাইল এগোতে আকাশের পটভূমিতে টকটকে লাল একটা আলো দেখা গেল। সেই সঙ্গে অপর ভিলাটিও—ইটোলা গ্র্যান্ডির আখড়া! উপসাগর থেকে কেটে নেয়া ব্যক্তিগত হারবার নির্দেশ করছে ওই লাল আলো।

পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে ডানে-বাঁয়ে তাকাল রানা। বাঁ পাশে বড় বড় বোম্বারগুলো দেখা যাচ্ছে। এখানেই আছড়ে পড়েছিল সোফিয়া। ঘুরে ওপাশে গেলেই প্রাইভেট হারবারটা পাওয়া যাবে। আগের থেকে আরও সতর্ক হল মাসুদ রানা। সাবধানে তীরে নিয়ে এল নৌকা। হাঁটু পানিতে নেমে দাঁড়িয়ে ঠেলে বালুকাবেলায় তুলে দিল। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ওটাকে একটা বোম্বারের সাথে বেঁধে ফেলল রানা, এবার আর ভেসে যাওয়ার ভয় নেই।

তিক্ত অবকাশ-২

ফিরে এল রানা সাগরে । গলা সমান পানিতে এসে সাঁতরাতে শুরু করল । উষ্ণ পানি, স্রোতও অনুকূলে । অন্ধকারে বড়সড় এক জলজ প্রাণীর মত নিঃশব্দে এগিয়ে চলল রানা ওদিকের ব্যক্তিগত হারবারটার দিকে ।

লাল আলোটা বৃত্তাকারে হারবার মাউথের প্রায় পুরোটাই আলোকিত করে রেখেছে । অনেকটা ঘুরে বৃত্তটাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ও হারবারে । কিনারা ঘেঁষে এগোতে লাগল পন্টুনটার দিকে । সেই দুই পাওয়ার-বোট এখনও বাঁধা রয়েছে ঘাটে, সঙ্গে একটা নৌকাও দেখা যাচ্ছে ।

একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে ও পাহাড় কেটে তৈরি ধাপগুলোর দিকে । কান খাড়া । দৃষ্টি পুরোমাত্রায় সতর্ক । পন্টুনের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে রানা, এমন সময় জিনিসটা চোখে পড়ল । টকটকে লাল একটা আগুন বড় একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে পানিতে এসে পড়ল । ‘ছ্যাৎ’ করে নিভে গেল ।

সিগারেট! ধীরে ধীরে মাথা তুলল মাসুদ রানা । কোথায় আছে লোকটা? নিকষ কালো অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না ভিলার আউটলাইন ছাড়া । পন্টুনের কিনারায় পৌঁছে থামল রানা । সামনেই একটা মূরিং রিং দেখতে পেয়ে উঁচু হয়ে ধরল ওটা । যেদিক থেকে ফেলা হয়েছে সিগারেটটা, সেদিকে তাকাল আবার ।

প্রায় এক মিনিট পর আবছা একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখে । পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াল একটা মনুষ্য মূর্তি, আড়মোড়া ভাঙল । পিছনে আকাশ থাকায় এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাকে । সিঁড়ির পাশেই এতক্ষণ বসে ছিল সে । ঘুরে তাকাল লোকটা সাগরের দিকে । পাঁচ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল একই জায়গায় ।

তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল হারবার মাউথের দিকে।
আচার-আচরণে বেশ অস্থির মনে হল রানার লোকটিকে। কারও
অপেক্ষায় আছে সম্ভবত। একটু পর লাল আলোটার নিচে পৌঁছে
থামল সে। এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা তাকে।

বেশ লম্বা লোকটা, স্বাস্থ্যবান। কালো ট্রাউজার এবং সাদা
সিংলেট পরনে। মাথায় ইয়টিং ক্যাপ। বুঝতে অসুবিধে হয় না,
পানিতেই বসবাস এ লোকের। রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে
আবার সিগারেট ধরাল সে।

চিতার মত দ্রুত, নিঃশব্দে উঠে পড়ল রানা পন্থুনে। খুব দ্রুত
ধাপগুলো পেরিয়ে উঠে এল ওপরে। সামনে, দশ গজ দূরেই
ভিলার ফ্রন্ট সাইড। জোরাল আলোয় ভাসছে। বাঁ দিকে বড়সড়
কয়েকটা ঝোপ দেখে ছুটল রানা সেদিকে। প্রথম ঝোপটার কাছে
পৌঁছেই বসে পড়ল ঝপ করে। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে
তাকাল, তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। সাগর দেখছে
আনমনে।

ভিলার দিকে নজর দিল এবার মাসুদ রানা। ওপাশের একটা
খোলা জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে। কিন্তু ভেতরটা
দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। উঠল রানা, কোমরের ওপরের অংশ
সামনে ঝুকিয়ে ঝোপগুলো পেরিয়ে এগোল। ঘুরে এসে
জানালাটার সোজাসুজি একটা কমলা গাছের আড়ালে বসল।
এখান থেকে মাত্র সাত-আট ফুট দূরে রয়েছে জানালাটা।

কোন পর্দা নেই জানালায়, তবে কাঁচের পাল্লা ভেতর থেকে
বন্ধ। ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সুন্দর করে সাজানো
পোছানো প্রকাণ্ড লাউজ ওটা, অত্যন্ত দামি আসবাবের ঠাসা। ক্রমের
১০-তিস্ত অবকাশ-২

ঠিক মাঝখানে বড় এক টেবিল ঘিরে বসে আছে চারজন লোক। পোকার খেলছে। তাদের পিছনে একটা সোফায় প্রায় শোয়ার ভঙ্গিতে বসে আছে সারা গ্র্যান্ডি। হাতে একটা ম্যাগাজিন, ঠোটে সিগারেট। পাশে নিচু একটা টেবিলের ওপর বাজছে ডেক সেট—মিউজিকের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে মেয়েটি।

অন্যদের দিকে তাকাল এবার রানা। একজন সরাসরি এদিকে ফিরে বসেছে। দু'জনের মুখের একপাশ দেখতে পাচ্ছে ও, অন্যজন বসেছে পিছন ফিরে। ভীষণ মোটা এ লোক, সারা দেহে থলথল করছে চর্বি। ঘাড় গর্দান বলে কিছু নেই, প্রকাণ্ড ফুটবলের মত মাথাটা যেন চেপে বসিয়ে দেয়া হয়েছে কাঁধের ওপর। চুলগুলো ঘন, কঁকড়া। কাঁচায়-পাকায় মেশানো।

মুখটা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। এ-ই সেই কুখ্যাত ড্রাগ ট্রাফিকার, আলবার্তো ফেলিনির হত্যার পরিকল্পনাকারী ইটোলা গ্র্যান্ডি। পত্র-পত্রিকায় এর বহু ছবি দেখেছে ও। ওর ধারণা মিথ্যে হয়নি দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। ফিরে গিয়ে যখন এর আখড়ার অবস্থান জানাবে ও ফ্রেনজি আর গুইডোকে, লোক দুটোর মুখের অবস্থা কেমন হবে ভেবে হাসি পেল।

অন্য তিনজনের ওপর চোখ বোলাল এবার রানা। হলিউডের মারদাঙ্গা মার্কী ছবির ভিলেন যেন একেকটা। মুখের চামড়া পুড়ে তামাটে রঙ ধারণ করেছে। সব ক'টার ঠোঁটের কোণে ঝুলছে সিগারেট। চেহারাই বলে—প্রত্যেকেই নির্দয় খুনী। ডজন ডজন মানুষের রক্ত লেগে আছে এদের হাতে।

কে জিতছে খেলায়, এখন থেকেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

কয়েনের ছয়টা উঁচু পাহাড় জমে আছে গ্র্যানডির সামনে। অন্যদের ভাগ্যে তেমন কিছু জোটেনি। খেলা দেখতে লাগল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর ওর দিকে মুখ করে বসা লোকটি হাতের কার্ডগুলো টেবিলের ওপর রাখল চিৎ করে, হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছু একটা বলে উঠল।

গ্র্যানডির বিশাল পিঠটা কেঁপে কেঁপে উঠল। হাসছে। হাসি থামতে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে। পাশে যেমন, লম্বায় তেমনটি নয় লোকটা। বেশ খাটো। কার্ডগুলো ফেলে দিল টেবিলে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু বলল। চোখ তুলে বাপের দিকে তাকাল মেয়েটি, মাথা ঝাঁকাল। তারপর আবার ডুবে গেল ম্যাগাজিনের পাতায়।

অন্য তিনজনের একজন এগিয়ে এল জানালাটার দিকে। এ লোক বেশ লম্বা। ছিপছিপে। ছিটকিনি খুলে ঠেলে দিল সে পাল্লা দুটো বাইরের দিকে। সেই সঙ্গে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল মিউজিকের আওয়াজটাও। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরে তাকাল লোকটা, চেয়ে থাকল লাল আলোটার দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর গ্র্যানডির উদ্দেশ্যে কিছু বলল সে মুখ ফিরিয়ে।

কিন্তু জোরাল বাজনার কারণে কথাগুলো শোনা গেল না। হাত বাড়িয়ে ডেক সেট অফ করে দিল গ্র্যানডি। ‘কি বললে?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘টিম দেরি করে ফেলেছে,’ আবার বলল লোকটা। প্রতিটি কথা পরিষ্কার শুনতে পেল এবার মাসুদ রানা। ‘এত দেরি করার কি কারণ?’

তার পাশে এসে দাঁড়াল ইটোলা গ্র্যানডি। উঁকি দিয়ে বাইরে তিষ্ঠ অবকাশ-২

তাকিয়ে বলল, 'হয়ত এমনিই। এসে যাবে, চিন্তা নেই। কতদূর থেকে আসছে দেখতে হবে না?'

ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল তারা কিছুক্ষণ। অন্য দু'জন কি নিয়ে হাসাহাসি করছে টেবিলে বসে। সারা ম্যাগাজিন নিয়ে ব্যস্ত। মিনিট দুয়েক পর মৃদু একটা গুঞ্জন কানে এল মাসুদ রানার। অনেক দূর থেকে আসছে আওয়াজটা। মনে হচ্ছে কোন স্পীডবোটের আওয়াজ। একই সঙ্গে গ্র্যান্ডি আর তার সঙ্গীও শুনতে পেল তা।

'ওই এল বোধহয়,' বলে উঠল লোকটা। 'ভিটো আছে তো জেটির ওখানে?'

'থাকবে না মানে?' খেঁকিয়ে উঠল ইটোলা গ্র্যান্ডি। 'সব কিছু নিয়ে ইয়ার্কি?'

জানালায় সামনে থেকে সরে গেল সে, দেখতে পাচ্ছে না তাকে এখন রানা। কয়েক মুহূর্ত পর সামনের দরজা দিয়ে টেরেসে এসে দাঁড়াল। ড্রামের মত মোটা কোমরে দুই কলাগাছের কাণ্ডের মত হাত রেখে হাঁক ছাড়ল ইটোলা, 'ভিটো!'

সাথে সাথেই পাল্টা হাঁক ভেসে এল ঘাটের দিক থেকে। 'সি, সেনর!'

ওর নাম তাহলে ভিটো, ভাবল মাসুদ রানা। এখান থেকে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না এখন।

'টিম আসছে! খেয়াল রেখ,' আবার চেষ্টা করে বলল ড্রাম।

'সি!'

আরও কয়েক পা এগিয়ে এল গ্র্যান্ডি। সেই বিশাল ছাতাটার নিচের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। লম্বুও বেরিয়ে এল এবার। খুব

বেশি হলে দশ গজ দূরে আছে ওরা রানার । বসে ছিল ও, আশু
আশু শুয়ে পড়ল । জায়গাটা খুব একটা সুবিধেজনক নয় । কারও
চোখ পড়েও যেতে পারে ওর ওপর, বলা যায় না । মোটরের
আওয়াজটা আরও অনেক কাছে এসে পড়েছে ।

ম্যাগাজিন ছুঁড়ে ফেলে দিল সারা গ্র্যান্ডি । উঠে দাঁড়িয়ে
আড়মোড়া ভাঙল । লাল ভেলভেটের স্কাট এবং বুকের ওপর কুঁচি
দেয়া ব্রেসিয়ারের-ই বৃহৎ সংস্করণ কিছু একটা পরেছে সে । সুন্দর
ফিগারের জন্যে দারুণ মানিয়েছে মেয়েটিকে । সিগারেটটা
অ্যাসটেতে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে, যোগ দিল
বাপের সঙ্গে ।

লাল আলোটা এই সময় দপ করে নিভেই জ্বলে উঠল আবার ।

‘ওই যে টিম,’ হাত তুলে হারবার মাউথ দেখাল সারা । বেশ
খুশি খুশি মনে হচ্ছে মেয়েটিকে এখন ।

বাতাসে তার গায়ের মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ ভেসে এল রানার
নাকে । ওদিকে মোটরের আওয়াজ কমে এসেছে । শব্দ শুনে মনে
হচ্ছে পন্থুনে ভেড়ার আয়োজন করছে । কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল
না । সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টেনে চলেছে ইটোলা গ্র্যান্ডি । সারা
আর লম্বা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি । রানাও শুয়ে আছে
মূর্তির মত । ওকে এমন অস্বাভাবিক স্থির দেখে ভুল করল একটা
গিরগিটি, কমলা গাছটার গুঁড়ি বা শেকড় কিছু একটা ভেবে
নিশ্চিন্তে চড়ে বসল ঘাড়ের ওপর ।

অজান্তেই আপাদমস্তক শিউরে উঠল রানার । কাজ হল এতে ।
তড়াক করে এক লাফে নেমে পড়ল সরীসৃপটা, ছুটে গিয়ে উঠে
পড়ল কমলা গাছে । একজোড়া পায়ের আওয়াজ কানে যেতে

সেদিকে মনোযোগ দিল মাসুদ রানা। ধাপগুলো দৌড়ে উপকে আসছে কেউ ব্যস্ত পায়ে।

একটু পরেই দেখা গেল তাকে। বাইশ-তেইশ বছরের এক যুবক। হাতে অয়েলস্কিন পেপার মোড়া একটা প্যাকেট। যুবকের চেহারাটা গোল আলু মার্কা নায়কদের মত। পাঁচ ফুট নয় হবে লম্বায়, পেটা শরীর। মাথাভর্তি লালচে কৌকড়া চুল। পরনে লাল সিংলেট এবং কালো ট্রাউজার। সারার ওপর চোখ পড়তে দুই কানে গিয়ে ঠেকল তার হাসি। ‘হাই!’ বলল সে।

দু’চোখ ঝিলিক মেরে উঠল সারা গ্র্যানডির। ‘হাই, টিম!’

এগিয়ে এল টিম। গ্র্যানডির সামনের টেবিলের ওপর ‘ধপাস’ করে রেখে দিল হাতের প্যাকেটটা। ‘হ্যালো, বস্,’ মাথা ঝাঁকাল টিম সসম্বন্ধে। ‘এই যে আপনার জিনিস।’

‘গুড বয়। বোসো বোসো,’ প্যাকেটটা খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গ্র্যানডি।

‘আপনার মেয়েকে একটা চুমু খেতে পারি, বস্?’ গ্র্যানডির দিকে ফিরে দাঁত বের করে হাসছে টিম।

‘গো অ্যাহেড,’ কাঁধ ঝাঁকাল গ্র্যানডি। ‘সারা রাজি থাকলে একটা কেন, দশটা চুমো খাও না। পথে আসতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?’

টিম ততক্ষণে দু’হাতে জড়িয়ে ধরেছে সারার কোমর। মেয়েটিরও এ ব্যাপারে আগ্রহের কমতি নেই, সাপের মত পঁচিয়ে ধরেছে সে টিমের গলা। তাড়াতাড়ি বলল যুবক, ‘মোটাই না, মোটেই না।’ পরমুহূর্তে ওদের দু’জোড়া ঠোঁট সঁটে গেল পরস্পরের সাথে।

‘ফড়াৎ’ করে অয়েলস্কিন প্যাকেটটা ছিঁড়ে ফেলল ইটোলা গ্র্যানডি। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল। পরমুহূর্তে সন্তুষ্টির হাসি ফুটল মুখে। ‘গুড! ভেরি গুড!’

সারাকে ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল টিম। সরে এসে বসল গ্র্যানডির মুখোমুখি। ‘কিন্তু বস্, এগুলো কাকে দিয়ে নিস পাঠাচ্ছেন আপনি? সবদিক দেখে শুনে নিয়েছেন তো?’

প্রশ্নের হাসি ফুটল বসের মুখে। হাত ইশারায় নিজের মাথা দেখাল সে টিমকে। ‘এই করেই চুল পাকিয়েছি হে!’

‘কোথায় পেলেন লোকটাকে?’ গলার স্বরে মনে হল সংশয় কাটছে না তার।

‘রোমে। জেরি পিক করেছে তাকে। স্মার্ট বয়।’

হঠাৎ করেই গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল টিমের। চাউনিটাও কেমন ধারালো হয়ে গেছে। ‘বেশি স্মার্টরাই বিপদ বাধায়, বস্,’ বলে সারার দিকে তাকাল সে। ‘এরমধ্যে দেখা করেছ নাকি ওর সঙ্গে, ডার্লিং?’

চোখ বড় বড় করে তাকাল সারা গ্র্যানডি। ভাব দেখে মনে হয় ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। ‘জেরি? পাগল হয়েছে? তুমি থাকতে ওর মত বন-মানুষের সাথে দেখা করতে যাব আমি?’

খুব একটা প্রভাবিত হল না টিম প্রশংসায়। চোখ কুঁচকে কি যেন ভাবল একটু, তারপর মাথা দোলাল। ‘ঠিকই বলেছ,’ গম্ভীর স্বরে বলল সে। ‘মনে থাকে যেন, ওর থেকে দূরে থাকতে হবে তোমাকে।’

মুখ তুলে হাসল ইটোলা গ্র্যানডি। যেন দারুণ এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা চলছে। সে তার শ্রোতা।

‘তুমি জেলাস হয়ে উঠছ,’ বলল সারা। টিমের গালে হাত বোলাল আলতো করে। ‘আমাকে নিয়ে অনর্থক দুশ্চিন্তা কোরো না।’

তার নগ্ন বাহুতে পাল্টা হাত বোলাল যুবক। গ্র্যানডির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কাকে পিক করেছে জেরি, বস্? কি নাম তার?’

‘ছেলেটা সাংবাদিক। নিউ ইয়র্ক ভিশনের রোম ক্রেসপন্ডেন্ট। পত্রিকাটা কার জান তো?’ অর্থপূর্ণ হাসি হাসল গ্র্যানডি।

‘শিওর।’

‘ওর সাংবাদিক। নাম মাসুদ রানা।’

‘মাসুদ রানা!’ শিরদাঁড়া খাঁড়া হয়ে গেল টিমের। ‘ওকে চিনি আমি, বস্। ওর সঙ্গে ক’দিন খুব ঘুরঘুর করেছে সোফিয়া।’

খ্যাক খ্যাক করে বিস্মীভাবে হেসে উঠল ইটোলা গ্র্যানডি। ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি। ঐ ব্যাটাকেই ফাঁদে আটকেছে জেরি।’

‘ও রাজি হয়েছে কাজটা করে দিতে?’

‘আলবৎ! না করে উপায় আছে ব্যাটার?’

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে মাথা দোলাল টিম আপন মনে। ‘তাহলে তো ভালই! সঙ্গে সাংবাদিক থাকলে নিশ্চিন্তে কাজ করা যায়।’

পাশে দাঁড়ানো লম্বুর দিকে তাকাল গ্র্যানডি। ‘আরে, কি ব্যাপার! এতক্ষণ হয়ে গেল, কেউ এক গ্রাস ড্রিঙ্ক এনে দিতে পারলে না ছেলেটাকে?’

‘সরি, বস্!’ দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, লম্বা লম্বা পা ফেলে

টুকল গিয়ে ভিলায়। মিনিট পুরো না হতেই একটা ট্রে-তে এক বোতল হুইস্কি, সোডা এবং একটা গ্লাস এনে রাখল টেবিলে।

‘শুরু করে দাও,’ ইশারায় বোতলটা দেখাল গ্র্যানডি যুবককে। তারপর উঠে দাঁড়াল আসন ছেড়ে। প্যাকেটটা দু’হাতে বুকের কাছে ধরা। লম্বা লোকটার উদ্দেশে বলল, ‘চল, সারটি। ভেতরে যাই। কাজ আছে।’

কয়েক পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আবার কি মনে হতে। টিমকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি থাকছ তো আজ এখানে?’

তার চেয়ারের হাতলের ওপর বসে পড়েছে সারা গ্র্যানডি, এক হাতে জড়িয়ে ধরেছে গলা। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল টিম। ‘শিওর, বস্! হাতে এ মুহূর্তে কোন কাজ নেই আমার।’

‘টাকাটা তাহলে কাল নিলেই চলবে, না কি বল?’

কি বলবে ভাবছে টিম। এই সময় সারা-ই তার হয়ে উত্তরটা দিয়ে দিল।

‘ঠিক আছে, ড্যাড। কাল দিলেই হবে,’ বলেই গলা নামাল মেয়েটি, টিমের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, ‘রাতটা তুমি আমি এক সাথে কাটাব, কেমন?’

এতই আশ্বে বলল সে কথাটা যে বিশ হাত দূর থেকে রানাও স্পষ্ট শুনতে পেল। গ্র্যানডির দিকে তাকাল যুবক। ‘আপনার কোন আপত্তি নেই তো, বস্?’

‘কিসের?’

‘সারার সঙ্গে যদি...’

‘ও, শিওর শিওর! মেয়ে আমার যথেষ্ট বড় হয়েছে, যার সঙ্গে হচ্ছে রাত কাটাতে পারে।’

‘থ্যাঙ্কিউ, বস্ ।’ শুধু হুইস্কির বোতলটা তুলে নিয়ে উঠল টিম ।
এক হাতে সারার কোমর জড়িয়ে ধরে পা বাড়াল । গ্র্যানডি আর
সারটির পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ভিলায় ।

ভুরু কুঁচকে ওদের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকল সারটি ।
যুগল মূর্তিটা চোখের আড়ালে চলে যেতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে
অন্যমনস্কের মত বলল, ‘ছোঁড়া কবে যে জেরির হাতে মরবে, তাই
ভাবি ।’

হেসে উঠল ইটোলা গ্র্যানডি । ‘বাদ দাও! ওদের বান্ধবী
সমস্যা নিয়ে ওরা ভাববে, তোমার কি? নাও,’ প্যাকেটটা সারটির
দিকে এগিয়ে দিল সে । ‘নতুন করে প্যাকেট করে ফেলো গে । কাল
ভোরে রওনা হয়ে যাবে । জেরির হাতে এটা তুলে দিয়েই ফিরে
আসবে । আগারস্ট্যাণ্ড?’

মাথা ঝাঁকাল সারটি । প্যাকেটটা ধরল দু’হাতে, তারপর
বসের পিছন পিছন পা বাড়াল । ওরা অদৃশ্য হতেই ভূমিশয়া
ত্যাগ করল মাসুদ রানা । যা জানার ছিল, জানা হয়ে গেছে । এবার
কেটে পড়তে হবে । সারটির হাতের প্যাকেটটা যাতে রোম
পৌছাতে না পারে, সে ব্যবস্থা তো বটেই, একই সঙ্গে অন্যদের
শ্রীঘর বাসের আয়োজনটাও নিশ্চিত করতে হবে ।

হামা দিয়ে সিঁড়ির ধাপগুলো পর্যন্ত পৌঁছুলো মাসুদ রানা ।
মনের মধ্যে সামান্য ইতস্তত ভাব, ভিটো বলে যাকে ডাকছিল
গ্র্যানডি, তাকে দেখতে পেল না ও কোথাও । দূরের লাল
আলোটার দিকে তাকাল রানা । নাহ্, নেই সে ওখানেও । তাহলে
হয়ত ওর অজান্তেই কোন এক সময় ভিলায় গিয়ে ঢুকেছে ভিটো ।
অন্যদিকে নজর থাকায় খেয়াল করেনি ও ।

তারপরও মনের মধ্যে সামান্য খুঁতখুঁতে ভাবটা রয়েই গেল।
সাবধানে একটা একটা করে ধাপ টপকে পন্থুনে নেমে এল রানা।
পানিতে নামার আগে শেষবারের মত মুখ তুলে ওপর দিকে
তাকাল। নাহ্, কোথাও নেই ভিটো। পরক্ষণেই জমে গেল ও
বরফের মত, পিছন থেকে কারও অতি সাবধানী নিঃশ্বাস পতনের
আওয়াজ কানে এসেছে। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত কাঁপিয়ে দিয়ে
গেল ওকে।

অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝে ফেলল মাসুদ রানা, কিছু করার সময়
পেরিয়ে গেছে। তবুও, শেষ চেষ্টা হিসেবে ঘুরে দাঁড়াতে গেল ও।
কিন্তু পারল না। অর্ধেকটা ঘোরার আগেই পিছন থেকে ওর গলাটা
পেঁচিয়ে ধরল একটা পেশীবহুল, লোমশ হাত। পরমুহূর্তে হাঁটু
তুলে গায়ের জোরে গুঁতো মারল লোকটা রানার মেরুদণ্ডের ওপর।

অসহ্য যন্ত্রণায় গুঁড়িয়ে উঠল মাসুদ রানা।

Handwritten signature
১৫.০২.০২

চোদ্দ

নিশ্চয়ই নিঃশব্দে কাজ সারার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া আছে লোকটার,
ভাবল রানা। হয়ত এখনই ছোরা চালাবে ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর।
ওরই মাঝে টের পেল রানা, লোকটা লম্বায় প্রায় ওর সমান হলেও
চওড়ায় অনেক বেশি। এ-ই সম্ভবত সেই ভিটো। দম বন্ধ হয়ে
তিক্ত অবকাশ-২

গেছে মাসুদ রানার, একটু বাতাসের জন্যে ছটফট করছে কলজেটা। কয়েকবার ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল ও। ঠিকমত জোর খাটাতে পারছে না।

এখনও আগেরমতই ওর গলা পেঁচিয়ে ধরে আছে ভিটো। এরমধ্যে রানার নড়াচড়ার ফলে ওর মেরুদণ্ডের ওপর চেপে ধরে রাখা পা'টা বার দুয়েক নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে সে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে। এ-মুহূর্তে মাসুদ রানার নড়াচড়া কমে এসেছে দেখে আবার পা তুলতে গেল সে, কিন্তু তার আগেই হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রানার। দেহের ভার ছেড়ে দিয়েছে ও পুরোপুরি।

চট করে আবার দু'পায়ে দাঁড়াতে গেল ভিটো, কিন্তু তৈরি ছিল না বলে পারল না রানার দেহের ভার সামাল দিতে। সাথে সাথে সে-ও পড়ে গেল রানাকে বুকে নিয়ে। পড়েই অদ্ভুত কায়দায় নিজের দেহটাকে মুচড়ে ঘুরিয়ে নিল রানা, দু'পা ভিটোর দেহের দু'দিক দিয়ে চেপে বসতে গেল। কিন্তু তার আগেই প্রচণ্ড এক ঘুসি চালান লোকটা রানার খুতনি সই করে।

দু'পাটি দাঁতের সংঘর্ষে 'খটাশ!' করে আওয়াজ উঠল। বন্ধ করে চক্কর খেয়ে উঠল ওর মাথাটা, চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগল রানা। চাপা গলায় একটা জঘন্য খিস্তি করল ভিটো, এবার দু'হাত বাড়িয়ে টিপে ধরল ওর গলা।

ভতঙ্কণে সামলে নিয়েছে রানা অনেকটা। দুই বুড়ো আঙুল দিয়ে গলার ওপর চেপে বসা ভিটোর দুই কড়ে আঙুল পেঁচিয়ে ধরল ও, পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা এক টান দিল বাইরের দিকে। 'মট' করে ভেঙে গেল ভিটোর দুটো আঙুলই। তীব্র যন্ত্রণায় চৈঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল লোকটা, ঠিক সময়মত হাত চালান রানা। গায়ের

সব শক্তি এক করে ভীষণ এক খাবড়া বসাল ভিটোর নাকেমুখে ।
থেমে গেল চিৎকারটা মাঝপথে ।

আবার হাত চালাল মাসুদ রানা, ঘুসিটা লাগলে পন্থুনের পাটাতনের সাথে লেপটে যেত ভিটোর মুখ । ব্যাপারটা সে-ও টের পেয়ে গিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে ঝটকা মেরে মুখটা সরিয়ে নিল ভিটো কয়েক ইঞ্চি, তার বাঁ কান ডলে দিয়ে বেরিয়ে গেল আঘাতটা । সাথে সাথেই রানার ঘাড়ের পাশে রদা চালাল ভিটো ওই আহত হাত নিয়েই, একই সঙ্গে প্রচণ্ড এক ঝাঁকিতে নিজেকে মুক্ত করে নিল, ফেলে দিল রানাকে বুকের ওপর থেকে ।

আঁতকে উঠল রানা । পিঠে কিছুই বাধছে না ওর, পড়ে যাচ্ছে হারবারে । ষণ্ডার সাথে গুঁতোগুঁতি করতে গিয়ে কখন যে দু'জনেই চলে এসেছে পন্থুনের একেবারে কিনারায়, খেয়ালই করেনি । একেবারে শেষ মুহূর্তে হাত ছুঁড়ল ও, মুঠো করে ধরে বসল ভিটোর কলার । এক হাতে লোকটার কলার ধরে শূন্যে ভাসতে লাগল রানা, দোল খেতে লাগল, আর কিছু করার উপায় নেই ।

কিন্তু বেশিক্ষণ ওভাবে থাকতে হল না । ধরার মত কিছু নেই হাতের কাছে, অতএব রানার দেহের ভারে ভিটো-ও একটু একটু এগিয়ে এল কিনারার দিকে । এর মধ্যেও কয়েকবার চেষ্টা করল সে কলার থেকে রানার হাত ছাড়াবার, কিন্তু ভাঙা আঙুল দুটোর জন্যে সুবিধে করতে পারল না । একসঙ্গে 'ঝপাৎ' করে পানিতে পড়ল দুজনেই ।

পড়েই তলিয়ে গেল । সময় থাকতে বুক ভরে দম টেনে নিয়েছে রানা, দু'হাতে ভিটোর কোমর জড়িয়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে তিক্ত অবকাশ-২

আরও গভীরে নিয়ে গেল তাকে । কিন্তু সুবিধে করতে পারল না ।
প্রাণের দায়ে ভীষণভাবে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল ভিটো । বুট
জুতো পরা পায়ের শক্ত একটা লাথি উরুর ওপর পড়তেই যন্ত্রণায়
ককিয়ে উঠল রানা । বাধ্য হল লোকটাকে ছেড়ে দিতে । ওপরে
উঠে গেল ভিটো ।

এক সেকেণ্ড পর পানির ওপর মাথা তুলল রানা । পর মুহূর্তেই
একটা তীক্ষ্ণধার ছোরা দেখতে পেল ভিটোর হাতে, তারার
আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ইম্পাতের ফলা । সামনের দিকে ঝাঁপ দিল
ভিটো, মুখ দিয়ে বুনো শয়োরের মত ‘ঘোঁৎ ঘোঁৎ’ আওয়াজ
বেরোচ্ছে তার । পানির মধ্যে ইচ্ছেমত নড়াচড়া করতে পারছে না
রানা, তবুও যথাসম্ভব দ্রুত নিজেকে একপাশে সরিয়ে নিল । মাত্র
দু’ইঞ্চির জন্যে ছোরাটা মিস করল ওর গলা ।

একটাই ভয় রানার, ব্যাটা সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে
শুরু না করে । তাহলেই সর্বনাশ । অতএব, চেষ্টা করতে হবে
লোকটা যেন সে সুযোগ না পায় । ভিলার ওদের কিছু টের পেতে
দেয়া যাবে না । ভিটো এগিয়ে এল আবার ছোরা উঁচিয়ে ।

ডুব দিল মাসুদ রানা । এবার দু’হাতে ওর বাঁ পায়ের গোড়ালি
ধরে টেনে নামিয়ে আনল । উন্মত্তের মত লাফঝাঁপ শুরু করল
এবার ভিটো । কিন্তু ছাড়ল না ও, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখল
পা-টা । ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল লোকটার লাফালাফি,
নিঃশব্দ হয়ে আসছে ।

বুকে জমানো বাতাসে যতক্ষণ কুলাল, ততক্ষণ ধরে থাকল
রানা ভিটোকে, তারপর পা ছেড়ে দিয়ে সারফেসের উদ্দেশে
ছুটল । বুকটা বিস্ফোরিত হওয়ার যোগাড় অক্সিজেনের অভাবে ।

‘ভূশ’ করে প্রায় বুক পর্যন্ত পানির ওপরে উঠে এল রানা। নাকমুখ দিয়ে বাতাস টানতে লাগল ঝড়ের বেগে।

ওর চার কি পাঁচ সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল ভিটো। ফুঁপিয়ে উঠে দম নিল সে। দু’চোখের দৃষ্টি চক চক করছে, মনে হল কি যেন এক ঘোরের মধ্যে আছে লোকটা। হঠাৎ করেই যেন রানাকে চিনতে পারল সে। পরক্ষণেই ঘুরে পালাতে চেষ্টা করল, দুর্বল ভাবে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল এলোপাতাড়িভাবে। একবার যেন চেষ্টা করে ওঠার চেষ্টাও করল বলে মনে হল রানার। কিন্তু রানার কান পর্যন্ত পৌঁছল না সে শব্দ।

এরই মধ্যে দেখে নিয়েছে ও, ছোরাটা নেই ভিটোর হাতে। ছুটে গেছে কখন যেন। এবার নির্ভয়ে এগোলো রানা। পেছন থেকে দু’হাতে ভিটোর ঘাড় চেপে ধরে মাথাটা নামিয়ে দিল পানির তলায়। বাধা দেয়ার মত শক্তি ফুরিয়ে গেছে ভিটোর। তলিয়েই যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি কলার ধরে মুখটা ওপরে তুলল রানা।

ঘাড় হেলে পড়েছে তার। দম আছে বলে মনে হল না। মরে গেল নাকি? মুখটা কাছে থেকে দেখার চেষ্টা করল রানা, নাকি জ্ঞান হারিয়েছে? টানতে টানতে ঘাটে বাঁধা নৌকাটার কাছে নিয়ে এল ও তাকে। প্রচুর পরিশ্রম করে ঠেলেঠুলে ভারি দেহটা তুলে দিল নৌকায়। এবার গলুই ধরে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে নিজেও উঠে পড়ল।

ভিটোকে টেনে হিঁচড়ে উপুড় করে শোয়াল রানা যাতে পেট ভর্তি পানি বেরিয়ে যেতে পারে। প্রচুর পানি বেরোল। কম করেও সের পাঁচ-ছয়েক হবে। এরপর জেটির সঙ্গে বেঁধে রাখা নৌকাটার দড়ি ধুলে তার হাত-পা কষে বাঁধল।

ডিউটি আপাতত শেষ । এবার ভাগতে হয় । বৈঠা নিয়ে গলুইয়ে বসে পড়ল রানা । দ্রুত বাইতে লাগল নৌকা । এর ফাঁকে নজর বুলিয়ে নিয়েছে হাতঘড়ির ওপর—সবে বারোটো । ভাড়া করে আনা নৌকাটার দিকে তাকালও না ও পাশ কাটাবার সময় । ঠিক করেছে ফ্রেনজিকে অনুরোধ করবে যেমন ওটা তার মালিককে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে সে ।

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে আসার পর নড়ে উঠল ভিটো । জ্ঞান ফিরেছে । কয়েকবার গোঙালো লোকটা, তারপর পুরো চোখ মেলে তাকাল । মাথার ওপর তারা ভরা আকাশ দেখে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে, হঠাৎ করেই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হল । ধড়মড় করে উঠে বসল ভিটো । বেকুবের মত একবার রানা আরেকবার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হাত-পায়ের দিকে তাকাতে লাগল ।

‘কি হে!’ মৃদু শিস দিয়ে উঠল মাসুদ রানা । ‘ভালই তো ঘুমচ্ছিলে । উঠলে কেন?’

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল লোকটার । ভাঙা, ফ্যাসফেসে গলায় বলল, ‘কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?’

‘লেফটেন্যান্ট ওইডো দেখা করতে চায় তোমার সাথে ।’

কোঁপে উঠল ভিটো । ‘পুলিস?’

মাথা দোলাল রানা । ‘উহঁ! ওঝা ।’

‘কি?’

‘তোমরা যেমন কালসাপ, ওইডো তেমনি বাঘা ওঝা । চল না, দেখবে । কেমন ঝাঁটিয়ে তোমার বিষ নামায় ।’

আরও কিছু জিজ্ঞেস করার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল ভিটো, কড়া এক দাবড়ি দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল রানা । ‘অ্যাই ব্যাটা,

চূপ থাক! নইলে বৈঠা দিয়ে ছাতু করে দেব তোর মাথা। শুয়ে থাক! শোও...!' আঘাত করার ভঙ্গিতে মাথার ওপর তুলল ও বৈঠাটা।

থমকে গেল ভিটো। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। তারপর আস্তে করে শুয়ে পড়ল। দূরে সরেনটো হারবারের আলো দেখা গেল এই সময়।

‘দূর! কোথায় কি?’ ঘড়ি দেখল লেফটেন্যান্ট গুইডো। ‘আজ আর কোন খবর হবে বলে মনে হয় না। শুধু শুধু বসিয়ে রাখল এতক্ষণ।’

তার সাথে একমত হতে পারল না ফ্রেনজি। দ্রুত মাথা নাড়ল সে। বলল, ‘আমার মনে হয় হবে, খবর হবে। লোকটাকে যদি কিছুটাও চিনে থাকি, তাহলে বাজি ধরে বলতে পারি ফালতু কথার লোক সে নয়।’

‘হুম!’ নিজের কড়া পালিশ করা বুটের ডগার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অন্যমনস্কের মত বলল গুইডো। ‘একটা ব্যাপার খেয়াল করেছে, চারদিক থেকে যে-সব প্রমাণ পাচ্ছি, তাতে আর সন্দেহ নেই যে এ-ই সেই রবার্ট হুইটনি। বাকি ছিল আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড, তাতেও তিন তিনজন লোক ওকেই নির্দেশ করে গেল। তারপরও লোকটাকে কেমন ড্যাম কেয়ার, ওভার কনফিডেন্ট মনে হয়েছে আমার।’

‘গুগোলটা তো ওখানেই,’ বলল ফ্রেনজি। ‘এত কিছু জানার পরও কেন যেন লোকটাকে ক্রিমিন্যাল ভাবে বাধছে। মনে হয় কোথাও একটা কিছু রয়ে গেছে, ব্যাপারটা চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে

আমাদের । ভাবছি আজই একবার কথা বলব মাসুদ রানার সাথে ।’

‘কোন ব্যাপারে?’

‘এই... ।’

মুখের কথা শেষ করতে পারল না ফ্রেনজি । বাইরে থেকে সেন্টির তীক্ষ্ণ গলা ভেসে এল, কিন্তু কি বলল লোকটা বোঝা গেল না । করিডরে দু’তিন জোড়া পায়ের শব্দ উঠল । ব্যাপার কি দেখার জন্যে উঠতে যাচ্ছিল গুইডো, এমন সময় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল পিছমোড়া করে হাত বাঁধা এক লোক । পিছনেই রয়েছে মাসুদ রানা এবং সেন্টি ।

হাঁ করে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল দুই অফিসার । পরনে সাঁতারের জাস্টিয়া ছাড়া আর কিছু নেই । চুল ভাল করে শুকোয়নি এখনও, লেপটে আছে মাথার সঙ্গে । ওর পেশীবহুল চওড়া বুকোর ওপর নজর আটকে গেছে গুইডো-ফ্রেনজির । হাঁ করে দেখছে রানাকে । ঘটনার আকস্মিকতায় খতমত খেয়ে গেছে ।

‘হাই, দেয়ার!’ অমায়িক হাসি ফুটল রানার মুখে । ‘দু’জনেই আছেন দেখছি । ভালই হল । এই যে,’ ঠেলা দিয়ে ভিটোকে আরও এক পা এগিয়ে দিল ও, ‘হাজতে পুরতে পারেন একে । ইটোলা গ্র্যানডির চ্যালা এ ব্যাটা, নাম ভিটো ।’

আচমকা বড় রকমের এক ঝাঁকি খেয়ে সিধে হল দুই অফিসার । যেন ভেতরে প্রাণ ছিল না এতক্ষণ, গ্র্যানডির নাম কানে যেতেই জ্যান্ত হয়ে উঠেছে । হুড়বুড় করে একসাথে অসংখ্য প্রশ্ন করতে শুরু করল রানাকে । যার এক বর্ণও বোধগম্য হল না ।

‘থামুন, থামুন,’ হাসিমুখে হাত তুলে থামাল তাদের রানা । ‘এখন প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না । গ্র্যানডিকে বড় এক

ড্রাগের চালান আর দলবলসহ ধরতে হলে আপনাদের এই মুহূর্তে
বেরিয়া পড়া দরকার।’

পাঁচ মিনিটও পেরোল না, হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিল
লেফটেন্যান্ট গুইডো। টেলিফোনে নারকোটিক স্কোয়াডের বড় বড়
কর্তাদের ঘুম ভাঙাল সে, দশ মিনিটের মধ্যে সরেনটো পুলিশ
হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করার অনুরোধ করল তাদের। এরপর
ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল রুম থেকে। কয়েক মুহূর্ত পর পিছনের
রিজার্ভ ফোর্সের ব্যারাক থেকে তার বাজখাঁই গলার নির্দেশের পর
নির্দেশ শোনা গেল।

পনের মিনিটের মধ্যেই অত্যন্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত
ত্রিশ জনের একটি স্কোয়াড সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সামনের
আঙিনায়। পুরো দস্তুর এক কম্যাণ্ডো স্কোয়াড—অ্যাকশনের জন্যে
সম্পূর্ণ প্রস্তুত। লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজিও মহাব্যস্ত। তারমধ্যেও
থেকে থেকে এসে রানার সঙ্গে দুয়েকটা জরুরি আলাপ সেরে
নিচ্ছে, সব-ই গ্র্যান্ডির ভিলা সম্পর্কিত।

মনের মধ্যে অন্য হাজারো প্রশ্ন তার, কিন্তু এখন নষ্ট করার
সময় নেই। ফিরে এসে আলাপ করবে সে রানার সঙ্গে। দুটো
শক্তিশালী পাওয়ার বোটে উঠে পড়েছে কম্যাণ্ডো স্কোয়াড এবং
নারকোটিকসের বড় কর্তারা। রওনা হয়ে যাবে এখনই।

‘ওয়াচ আউট,’ জেটিতে দাঁড়িয়ে গুইডোর উদ্দেশে বলল
মাসুদ রানা। ‘পাঁচজন রয়েছে ওখানে, সম্ভবত সবাই সশস্ত্র। টাফ
অ্যাণ্ড ডেঞ্জারাস পিপল্।’

কঠিন একটুকরো হাসি ফুটল লোকটার মুখে। ‘আমরাও কম
ডেঞ্জারাস নই, সেনর,’ বলল সে।

‘আর একটা অনুরোধ আছে।’

‘শিওর, বলুন?’

পাহাড়ের পাদদেশে রেখে আসা নৌকাটার কথা জানাল ও তাকে। ‘ফেরার পথে ওটা যদি টো-করে নিয়ে আসেন, তো ভাল হয়।’

‘মনে থাকবে। ইনফরমেশনের জন্যে ধন্যবাদ, সেনর রানা।’

‘ও কিছু না।’

‘সেনর,’ বোটের কিনারায় দাঁড়িয়ে ডাকল ওকে ভিটেলা ফ্রেনজি। ‘আপনি যাবেন না এখনই। জরুরি আলাপ আছে আপনার সাথে। ফিরে এসে কথা বলব। ততক্ষণ বিশ্রাম করুন। লোক রেখে গেলাম আপনাকে অ্যাটেও করার জন্য। কিছু প্রয়োজন হলে জানাবেন ওকে। অলরাইট?’

মাথা ঝাঁকাল রানা।

সগর্জনে ছুটল দুই পাওয়ার বোট বে অভ সরেনটোর উদ্দেশে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর ঘুরে দাঁড়াল রানা। ওর পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে এক সেপাই। রানাকে ঘুরতে দেখে হাসল।

‘চলুন, সেনর। রেস্ট নেবেন,’ বলল সে।

ভিজিটিং হাই অফিশিয়ালদের জন্যে নির্দিষ্ট সাজানো-গোছানো রেস্টরুমে নিয়ে এল ওকে লোকটা। বেডরুমের ওয়াল কাবার্ড থেকে একটা ঢোলা টি-শার্ট এবং ফ্রানেলের ট্রাউজার বের করে দিল। লজ্জিত ট্যাগ লাগানো রয়েছে দুটোতেই। ‘গোসল করে এগুলো পরে ফেলুন, সেনর,’ আবার হেসে ফেলল সে। ‘আমি আপনার জন্যে কম্বির ব্যবস্থা করছি।’

দু' ঘন্টা পুরো হওয়ার আগেই অপারেশন সেরে ফিরে এল পুলিশ ফোর্স। একজন সার্জেন্টের হাতে ঝুলছে বড় একটা প্লাস্টিক ব্যাগ। ওর ভেতর টিমের বয়ে আনা সেই বড়সড় প্যাকেটটা দেখা গেল।

‘পাওয়া গেল সবাইকে?’ ফ্রেনজিকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘হ্যাঁ,’ গম্ভীর গলায় বলল সে। ‘ইটোলা গ্র্যান্ডি আর তার মেয়েসহ মোট ছয়জন।’ কেমন অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল লোকটা।

‘বাধা দেবার চেষ্টা করেনি ওরা?’

‘সুযোগ দিলে তো!’

এই সময় ওইডো ঢুকল ভেতরে। হাতে রানার শার্ট-ট্রাউজার। ওগুলো এগিয়ে দিল সে। ‘নিন, সেনর। আপনার নৌকাটা নিয়ে এসেছি।’

‘ধন্যবাদ। এবার আমাকে ফিরতে হয়।’

‘কোথায় যাবেন?’ জানতে চাইল ফ্রেনজি।

‘রোম।’

‘কিন্তু আপনার সাথে কিছু জরুরি আলাপ ছিল যে!’

‘বেশ তো, আজ সন্ধ্যায় আসুন আমার বাংলোয়। তখন কথা বলা যাবে।’

চোখাচোখি হল দুই লেফটেন্যান্টের। ফ্রেনজির উদ্দেশ্যে চোখ টিপল ওইডো; ব্যাপারটা নজর এড়াল না রানা। ‘ঠিক আছে,’ একটু চিন্তা করে বলল ফ্রেনজি। ‘আসব আমি।’

পনের

চারটেয় ভায়া ক্যাভোর পৌছুল মাসুদ রানা। প্রথর রোদে চিড়বিড় করছে গায়ের চামড়া। জ্বালা করছে চোখ। রাত জাগার ফল। সোফিয়ার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের কার পার্কে ভাঁ করে ঢুকে পড়ল ও গেট খোলা পেয়ে।

বাংলো থেকে বেরিয়ে নিউ ইয়র্ক ভিশনে টুঁ মেরেছিল প্রথমে। লিজা ড্যাগেষ্টি নেই অফিসে। ওখান থেকে ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে রানা। এখানে আছে মেয়েটি। সোফিয়ার মালপত্র গোছানো শেষ হয়নি এখনও। খুব স্বাভাবিক। একদিনে এত কাজ কারও একার পক্ষে শেষ করা অসম্ভব একটা ব্যাপার।

ডোর বেল চাপতে ভেতর থেকে লিজার সুরেলা কণ্ঠের 'কামিং,' ভেসে এল। দরজা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল সে। রানাকে দেখামাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। টান দিয়ে অর্ধেকটা মেলে ধরল ভারি এক পাণ্ডুর চকচকে দরজাটা।

'এসো,' মৃদু হাসি ফুটল লিজার মুখে।

পরিশ্রমের ফলে অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে মেয়েটি। সুন্দর মুখটার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। কপালে লেপটে আছে কয়েক গাছি চুল। অপরূপ! মনে মনে আবারও লিজা ড্যাগেষ্টির রূপের প্রশংসা করল

মাসুদ রানা। ভোরের শিশির ভেজা স্নিগ্ধ, নির্মল এক গোলাপ যেন। ওর বিপদের কথা ভেবে স্বল্প-পরিচিত এই বিদেশিনী উদ্বিগ্ন, ভাবতে বেশ ভালই লাগছে।

‘হ্যালো!’ ভেতরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল রানা। ‘কতদূর?’

‘প্রায় শেষ করে এনেছি। আর আধঘন্টার মধ্যে কমপ্লিট করে ফেলব।’

‘যাক, একটা ঝামেলা গেল,’ বাহু ধরে লিজাকে ভেতরের রুমে নিয়ে এল ও। একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, ‘বোসো এখানে। বাকিটুকু আমি করছি।’

ওটার হাতলে ঝোলানো একটা তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছল মেয়েটি। ‘ওসব পরে হবে,’ বলল সে। ‘আগে ওয়াদা রক্ষা কর।’

‘কিসের?’

‘কেন কি ঘটেছে বা ঘটছে, ফিরে এসে সব খুলে বলবে বলে কথা দিয়েছিলে তুমি, রানা।’

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। ‘ঠিক আছে, বলছি।’

লিজার মুখোমুখি বসল ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে কথাগুলো ওহিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল। কিছুই গোপন করল না রানা। গালে হাত রেখে চুপচাপ শুনে গেল লিজা শেষ পর্যন্ত। এক সময় থামল ও। অসহ্য নীরবতা ভারি করে তুলল ঘরের বাতাস।

‘পুলিসের ধারণা তুমিই খুন করেছ লা সেনরিনাকে?’ পুরো দু’মিনিট পর মুখ খুলল লিজা ভ্যালেটি।

‘ধারণা নয়, ওরা প্রায় নিশ্চিত। কাল আইডেন্টিফিকেশন ডিস্ক অবকাশ-২

প্যারেডে মোট তিনজন সনাক্ত করেছে আমাকে, আমি শিওর।’

কথাটা শোনামাত্র চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেয়েটির। কিন্তু লক্ষ্য করল না রানা ব্যাপারটা। বলে চলল, ‘ওদিকে সনি জানে, সেইদিন তিনটের ফ্লাইটে নেপলস গিয়েছিলাম আমি, স্বনামে।’ আরেকটা সিগারেট ধরাল ও।

‘ওহ্, গড!’ প্রায় শিউরে উঠল লিজা।

‘এখন একটাই উপায় আছে নিজেকে বাঁচাবার, এই জেরির ওপর পুলিশের নজর ঘুরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তা করতে হলে আগে মিসিং ফিল্মটা দরকার। ওটা ছাড়া...’

‘ফিল্ম!’ রানাকে বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল লিজা। শিথিল ভঙ্গিতে বসা ছিল, তড়াক করে সিঁধে হল। ‘কিসের ফিল্ম?’

ওর মুখের ভাব দেখে বিস্মিত হল মাসুদ রানা। বলল, ‘সোফিয়ার সিনে ক্যামেরা ছিল একটা বললাম না? ওটার বারো ফুট এক্সপোজড ফিল্মের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। ওটা পেলে হয়ত...’

এবারও মুখের কথা শেষ করতে পারল না রানা। থেমে গেল লিজাকে একলাফে উঠে দাঁড়াতে দেখে। ‘কি হল?’

উত্তেজিত হয়ে পড়েছে মেয়েটি। কাঁপছে রীতিমত। চাপা, ফ্যাসফেসে গলায় বলল, ‘রানা, ফিল্মটা বোধহয় আমার কাছেই আছে।’

‘হোয়াট!’ শুকনো গলায় বিষম খেল রানা। ‘তোমার কাছে আছে মানে?’

‘কাল এখানে কাজ করার সময় সেনরিনার নামে একটা

পার্সেল ডেলিভারি দিয়ে গেছে পোস্টম্যান। পার্সেলের ওপর রোমের এক ফটোল্যাবের স্টিকার সাঁটা আছে।’

স্প্রিঙের মত চেয়ার ছাড়ল রানা। ডাঙায় তোলা মাছের মত তড়পাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা। গলা শুকিয়ে গেছে মুহূর্তে। হৃষ্কার ছাড়ল ও, ‘কোথায় সেটা?’

‘দাঁড়াও, আনছি,’ বলে একছুটে হলরুমে চলে এল লিজা। রানাও এল পিছন পিছন। একটা সোফার ওপর পড়ে ছিল তার হ্যাণ্ডব্যাগটা, থাবা দিয়ে ওটা তুলল সে। যিপার খুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল লিজা, ‘ভুলেই গিয়েছিলাম এটার কথা।’

একটা হলুদ রঙের প্যাকেট বের করল সে। ‘খুলে দেখ। মনে হয় এটাই।’

পা বাড়াল মাসুদ রানা। প্যাকেটটা ধরতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল ভিজিয়ে রাখা ফ্রন্ট ডোর। পাই করে ঘুরল রানা। জেরি কারলোটি দাঁড়িয়ে দোরগোড়ায়। দু’চোখ জ্বলছে স্বাপদের মত, অথচ মুখে হাসি।

ভেতরে এসে দাঁড়াল দানবটা। কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল লিজার উদ্দেশে, ‘আমাকে দাও,’ হাত বাড়াল সে। ‘ওটা আমার। অনেক ভুগিয়েছে...কাম কাম, গিভ ইট হিয়ার!’

লিজার রিফ্লেক্স অবাক করল রানাকে। সম্ভবত প্রথম দৃষ্টিতেই রানার দেয়া বর্ণনার সঙ্গে চেহারা মিলে যাওয়ায় ষাঁড়টাকে চিনে ফেলেছে। চোখের পলকে প্যাকেটটা ব্যাগে ভরে ফেলল সে, টেনে দিল যিপার। ততক্ষণে ওর মনোভাব বুঝে নিয়েছে জেরি, অশ্রীল একটা স্থিতি করে সামনের দিকে লাফ দিল সে, পাশেই রানা দাঁড়িয়ে, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল লিজা, দানবটার বাড়ানো থাবা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে কুঁজো হয়ে তীরবেগে ছুটল বেডরুমের দিকে। বুনো শয়োরের মত বিচ্ছিরি ঘোং ঘোং আওয়াজ বেরোল জেরির গলা দিয়ে, মেয়েটির অবাধ্যতা খেপিয়ে তুলেছে তাকে। আর দুয়েক ইঞ্চি এগোতে পারলেই ধরে ফেলবে সে লিজাকে।

এই সময় পা চালান রানা, লোকটার দু'পায়ের ফাঁকে ভরে দিল ডান পা। নিখুঁত টাইমিং, থর থর করে পুরো ফ্লোর কেঁপে উঠল অতবড় দেহটা আছড়ে পড়ায়। তার এক মুহূর্ত আগেই পিছন থেকে লিজার ব্লাউজ মুঠো করে ধরে ফেলেছিল জেরি, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। পাতলা কাপড়ের ব্লাউজটা পড় পড় করে ছিঁড়ে গেল, ছেঁড়া অংশটুকু নিয়েই পড়ল সে দড়াম করে। মেঝেতে খুতনি ঠুকে গেল ভীষণভাবে—যন্ত্রণায় ওড়িয়ে উঠল জেরি কারলোটি।

নিজের দিকে কোন খেয়াল-ই নেই লিজা ভ্যালিটির। বুকের সাথে ব্যাগটা দু'হাতে সবলে আঁকড়ে ধরে পালাচ্ছে, বাঘে তাড়া করেছে যেন। স্কাট উড়িয়ে সাঁৎ করে বেডরুমে ঢুকে পড়ল সে, সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। সেই একই মুহূর্তে 'ক্লিক' করে লেগে গেল তালাটাও। জেরি পড়ে আছে তখনও, ওঠার সময় পায়নি।

লোকটাকে ডিঙিয়ে ওপাশের দেয়াল সংলগ্ন ফায়ার প্রেসের দিকে ছুটল মাসুদ রানা। এ মুহূর্তে খালি হাতে দানবটাকে মোকাবেলা করতে যাওয়া চরম বোকামি হবে। ফায়ার প্রেসের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল একটা ভারি স্টীলের পোকার; আগেই লক্ষ্য করেছে রানা, এক ঝটকায় ওটা মাথার ওপর তুলে নিয়েই

ঘুরে দাঁড়াল । এই ফাঁকে উঠে পড়েছে লোকটা ।

সামনে দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছে সে । পিঠ কুঁজো করে ঝুঁকে আছে সামনের দিকে । লোকটার চেহারা বিস্মিত করল রানাকে । মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা গরিলা, এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে জঙ্গল থেকে ।

‘ইউ ডার্টি ডাবল-ক্রসার,’ ভয়ঙ্কর রকম শীতল গলায় বলল জেরি । ‘খুন করব তোকে আজ আমি ।’

‘এসো,’ পোকারটা ঝাঁকাল রানা । ‘দেখি তোমার দৌড় কত ।’

ওই অবস্থাতেই ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল জেরি কারলোডি । ধারাল দৃষ্টি স্থির রানার মুখের ওপর । ওর বাঁ দিকে তিন কদম সরল সে । রানাও ঘুরল তাল মিলিয়ে, পোকারটা একই ভাবে ধরা । এটা দিয়ে আঘাত করার একটাই মাত্র সুযোগ পাওয়া যাবে, জানে ও । কাজেই মারটা সঠিক সময়ে হতে হবে । এর একটা আঘাতই যথেষ্ট, যদি ঠিক জায়গামত বসানো যায় ।

কিন্তু হিসেবে সামান্য ভুল ছিল রানার । ও জানত জেরির মুভমেন্ট খুব ফাস্ট, কিন্তু ঠিক কতটা ফাস্ট, তা টের পেল এইবার । লোকটাকে ডাইভ দিতে দেখল ও আচমকা, একই সাথে নিজেও পোকার ঠিকই নামিয়ে আনল সজোরে, কিন্তু জায়গামত লাগল না আঘাতটা । তার আগেই কাঁধ দিয়ে আছড়ে পড়েছে সে রানার বাঁ উরুর ওপর । বাড়িটা মাথার বদলে লাগল গিয়ে জেরির কাঁধে । তাও সেরকম জোরাল হল না ।

গণ্ডারের শক্তি লোকটার গায়ে । রানার মনে হল পুরো বাড়িটাই যেন ধসে পড়েছে ওর ওপর । একটা অস্ফুট কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল গলা দিয়ে । পোকারটা ছেড়ে দিল রানা বাধ্য হয়ে,

পড়ে যাচ্ছে চিৎ হয়ে। বাঁ হাত বাড়িয়ে খপ করে লোকটার চুল ধরে ফেলল শক্ত করে।

মেঝেতে আছড়ে পড়েই সর্বশক্তিতে এক নক আউট পাঞ্চ কমল ও জেরির চোয়ালে। জোর এক ঝাঁকি খেল তার মাথাটা, মট মট করে ফুটল ঘাড়ের হাড়। পরমুহূর্তেই বাঁ হাতে আরেকটা ঘুসি চালাল রানা, কিন্তু লাগাতে পারল না। সময়মত মাথাটা সরিয়ে নিয়েছে সে একপাশে। অন্ধের মত হাত চালাল এবার জেরি। বুঝে গেছে, একে হালকাভাবে নিলে খারাবি আছে কপালে।

তাছাড়া ফিল্মটা হাতে পাওয়ার জন্যে সাংঘাতিক ব্যর্থ হয়ে উঠেছে। ভাবছে দেরি হলে মেয়েটি হয়ত পালিয়ে যাবে অন্য কোন পথে। তার জানা নেই, হলরুমের এই দরজা ছাড়া এ ঘর থেকে বেরুনোর আর কোন রাস্তা নেই। আঘাতটা লাগল রানার বাঁ কানের সামান্য নিচে—ঘুসি বা কিল, কোনটারই পর্যায়ভুক্ত নয়, অনেকটা চড়ের মত হয়ে গেল মারটা। তবুও ওতেই ভিরমি খাওয়ার মত অবস্থা হল রানার।

বাঁ হাতে জেরির থুতনি ধরে পিছনদিকে ঠেলা দিতে লাগল ও, ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় বুকের ওপর থেকে। এভাবে সুবিধে করতে পারছে না। পিছনে সরতে সরতে যেই পায়ের আওতায় এসে গেল জেরির মাথাটা, অমনি চট করে ডান পা তুলল রানা। মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এপাশে নিয়ে এসে ওর থুতনিত বোধিয়ে গায়ের জোরে ওপরদিকে পা ছুঁড়ল।

প্রায় উড়ে গেল জেরি। হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ল একটা চেয়ারের ওপর—‘মড়াং’ শব্দে ওটাকে চুরমার করে দিয়ে পড়ল ফোরে। উঠে পড়ল রানা এই সুযোগে। লোকটার দিকে এগোতে

যাবে, তার আগেই তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেছে সে। বুনো মোষের মত পরস্পরের দিকে ছুটে গেল দু'জনে। সময়মত ডান হাঁটু ভাঁজ করে সামান্য একটু কাৎ হল রানা, এবং পাশ থেকে ঘুসি মারল জেরির অরক্ষিত বাঁ চোয়ালে। আওয়াজ উঠল 'ঠক' করে।

একই সাথে মারল দানবটাও, ঘুসিটা ঠিক স্নেজ হ্যামারের মত আঘাত করল ওর বুকের পাজরে। ছিটকে দু'পা পিছিয়ে গেল মাসুদ রানা। দম বন্ধ হয়ে এল। হাঁ করে বাতাস টানার চেষ্টা করছে। এই সুযোগে ওকে পুরোপুরি কাহিল করা যাবে ভেবে ছুটে এল জেরি, প্রচণ্ড রাগে বিকৃত হয়ে উঠেছে চেহারা, ঠোট সরে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে কুকুরের মত।

বহু কষ্টে নিজেকে সামলাল রানা, স্থির রাখল নিজেকে। জেরি নাগালের মধ্যে আসামাত্র লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল, দু'পা এক করে ভয়ঙ্কর এক ফ্লাইং কিক মেরে বসল তার নাকেমুখে। কংক্রিটের দেয়ালে গুঁতো খেয়েছে যেন দানবটা, সম্মুখগতি রুদ্ধ হয়ে গেল আচমকা। পলকে চেহারা পাল্টে গেল। টকটকে লাল রক্তে ভেসে যেতে শুরু করল তার থুতনি, বুক।

থমকে গেল সে মুহূর্তের জন্যে, তারপর কলজে কাঁপানো এক হাঁক ছেড়েই আবার ছুটে এল। তবে এবার রানার পায়ের ব্যাপারে সতর্ক। মাত্র দুই সেকেন্ডের মধ্যে পর পর চারটে শর্ট-আর্ম জ্যাব হজম করতে হল রানাকে বুকে-পেটে। ফুসফুস খালি হয়ে গেল রানার। কিন্তু হাল ছাড়ল না রানা, ওরই মধ্যে ডান পা ছুঁড়ল জেরির কুঁচকি লক্ষ করে।

লাগল না। চট করে নিজেকে সামান্য ঘুরিয়ে নিল জেরি, লাথিটা লাগল নিতম্বের এক পাশে। পরমুহূর্তে তার মস্ত হাতের

প্রচণ্ড এক খাবড়া খেয়ে দড়াম করে পড়ে গেল রানা, কারণ খাবড়ার সাথে সাথে রানা যাতে পিছিয়ে যেতে না পারে সে জন্যে পায়ে পা বাধিয়ে ল্যাং-ও মেরেছে লোকটা। কিন্তু সে যা আশা করেছিল, তা হল না। পড়ল ঠিকই, তবে আছাড়টার গতি রোধ করার চেষ্টা না করে অ্যাক্রোব্যাটের মত উল্টো ডিগবাজি খেয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা।

দাঁড়াল, কিন্তু সামলে নিতে পারল না। ঠিকমত ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই দৌড়ে এল জেরি, দমাদম দুটো শক্ত পাঞ্চ বসিয়ে দিল ওর থুতনি আর চোয়াল সহ করে। ঘিলু নড়ে গেল রানার। আপনা থেকে দু' হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওর, বসে পড়ল ধপ করে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল সনি, রানা আবার উঠে দাঁড়ায় কি না লক্ষ্য করল।

কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ নেই ওর মধ্যে। তেমনি বসে আছে, থুতনি ঠেকে আছে বুকোর সাথে। অল্প অল্প দুলছে ডানে বাঁয়ে। ঘুরে দাঁড়িয়েই বেডরুমের দিকে ছুটল এবার জেরি। বন্ধ দরজার সাথে পুরো ফ্লোর কেঁপে উঠল তার লাথিতে, কিন্তু সফল হল না। ভারি ওক কাঠের দরজা দাঁড়িয়ে রয়েছে অটল। আবার লাথি হাঁকাল লোকটা।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা কোনমতে। পা কাঁপছে, মনে হচ্ছে ও দুটো যেন রাবারের তৈরি দণ্ড—নিয়ন্ত্রণহীন। জেরির তৃতীয় লাথির আওয়াজের পরপরই ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল লিজা আতঙ্কে। এই চিৎকারটাই সচকিত করে তুলল মাসুদ রানাকে। প্রচণ্ড এক ইলেকট্রিক শক্ খেয়েছে যেন, ভীষণভাবে চমকে উঠল ও।

দরজা ভেঙে ফেলেছে দানবটা, মেরে ফেলছে লিজাকে।
ভাবনাটা ঠেলে তুলে দিল ওকে। এখান থেকেই পরিষ্কার দেখতে
পাচ্ছে রানা, বিছানার ওপর চিৎ হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে মেয়েটি।
বুকের ওপর চেপে বসে দু'হাতে তার গলা টিপে ধরেছে জেরি।
মৃত্যুভয়ে দু' চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে লিজার, কোটর থেকে
বেরিয়ে পড়বে যেন এখনই।

তার গলা ধরে ঘন ঘন ঝাঁকি মারছে জেরি, ষাঁড়ের মত
চেষ্টাচ্ছে, 'কোথায় ওটা? কোথায় ফিল্ম! জলদি বল, নইলে খুন
করে ফেলব, মাগী!'

দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল মাসুদ রানা। পোকাকারটার ওপর
চোখ পড়ল প্রথমেই—ওটা তুলে নিয়েই ছুটল ও বেডরুমের
দিকে। ততক্ষণে জিভ বেরিয়ে পড়েছে মেয়েটির। পিছনে পায়ের
আওয়াজ শুনে ওই অবস্থাতেই ঘুরে চাইল জেরি। সেই মুহূর্তেই
ভারি লোহার ডাণ্ডাটা দড়াম করে আছড়ে পড়ল তার চাঁদিতে।
'ঠং' করে জোরাল শব্দ উঠল খুলির সঙ্গে ওটার প্রচণ্ড সংঘর্ষে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির বসে থাকল জেরি, তারপর চোখ উল্টে
গেল, আশ্চর্য করে দেহটা এলিয়ে পড়ল লিজার পাশে। পোকাকার
ফেলে টেনে হিঁচড়ে আধমরা মেয়েটিকে বের করল রানা
পাহাড়ের নিচ থেকে। উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে থাকল তার মুখের
দিকে।

'লিজা! লিজা, তুমি ঠিক আছ?'

চোখের উদভ্রান্ত দৃষ্টি ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এল। রানার দিকে
অকিয়ে বহুকষ্টে এক চিলতে হাসি ফোটাল লিজা ফ্যাকাসে মুখে।
তারপর হঠাৎ করেই কঁদে ফেলল ঝরঝর করে।

'কি হচ্ছে এখানে?'

পরিচিত কণ্ঠটা কানে যেতে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকান রানা। বেডরুমের ভাঙা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই লেফটেন্যান্ট, ফ্রেনজি এবং গুইডো। ঘরের অবস্থা দেখে খতমত খেয়ে গেছে দু'জনেই।

‘যা হবার হয়ে গেছে, অফিসার,’ বলল রানা।

দ্রুত বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল গুইডো। ঝুঁকে অজ্ঞান জেরির মুখের ওপর নজর বোলাল কয়েক মুহূর্ত। ‘কে এই লোক, সেনর?’ বিস্ময় মাখা কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

‘সনি বাসিলি, ওরফে জেরি কারলোটি,’ লম্বা করে দম নিল রানা। ‘ইটোলা গ্র্যান্ডির ডানহাত। আলবার্তো ফেলিনি এবং সোফিয়া শেরম্যানের হত্যাকারী।’

‘অ্যা!’ আঁতকে উঠল ফ্রেনজি, ‘বলেন কি?’ কাছে এসে জেরির কলার মুঠো করে ধরল সে। টেনে ভারি দেহটা চিৎ করার চেষ্টা করতে লাগল।

চেষ্টায়ে উঠতে গেল রানা বোকা অফিসারটিকে সতর্ক করার জন্যে, কিন্তু সময় পাওয়া গেল না। তার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল দানবটার দেহে। জ্ঞান আগেই ফিরেছিল তার, পড়ে ছিল ঘাপটি মেরে। একেবারে শেষ মুহূর্তে লোকটির চোখের পাতা পিট পিট করতে দেখেই চেষ্টায়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা। দড়াম করে মারল জেরি ফ্রেনজির চোয়ালে।

ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে, ছিটকে গিয়ে পড়ল গুইডোর ওপর। বিপদ টের পেয়ে লাফ দিল রানা লোকটাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু তার আগেই এক গড়ান দিয়ে নেমে পড়েছে সে খাট থেকে। নেমেই দৌড় দিল দরজার দিকে। পালাচ্ছে! রানাও ছুটতে গেল

তাকে ধরার জন্যে, কিন্তু দু'পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল গুইডোর রক্ত
পানি করা গর্জন শুনে।

‘জেরি! ডোন্ট মুভ!’

কিসের কি! চোখের পলকে হলরুমের অর্ধেকটা পেরিয়ে গেল
জেরি দমকা বাতাসের মত। আচমকা গুলির তীক্ষ্ণ আওয়াজে
কেঁপে উঠল ঘরদোর। পিঠ বাঁকা হয়ে গেল জেরির, কিন্তু থামল
না সে। এখনও ছুটছে, তবে মন্তরগতিতে। প্রায় পৌঁছে গেছে
হলরুমের দরজার কাছে।

আবার গুলি করল গুইডো। পড়ে গেল লোকটা এবার।
আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ঘুরে তাকাল। ঘামে ভিজে নেয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড
মুখটা। বিকৃত হয়ে আছে যন্ত্রণা আর আক্রোশে। কয়েক সেকেণ্ড
পড়ে থাকল জেরি একভাবে। তারপর হঠাৎ করেই ধড়মড় করে
উঠে দাঁড়াল। ডান পা টানতে টানতে দরজার দিকে দু'তিন পা
এগিয়ে গেল।

আর পারছে না। দরজার ফ্রেমের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে
হাঁপাচ্ছে। অস্ত্র উঁচিয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে দুই অফিসার। এক
হাতে চোয়াল ডলছে এখনও ফ্রেনজি। ওদের মাথার ওপর দিয়ে
রানার দিকে তাকাল জেরি। ভুল দেখল কি না জানে না রানা,
তবে মনে হল নীরবে কি এক আকুতি জানাচ্ছে যেন লোকটা
ওকে।

এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই চোখের মণি উল্টে গেল জেরি
কারলোটির। সটান সোজা অবস্থাতেই আছড়ে পড়ল প্রকাণ্ড
দেহটা, ফ্লোরের সঙ্গে মাথাটা বাড়ি খেল ‘ঠাশ’ করে।

ষোল

‘প্রশ্নটা সরাসরিই করছি, সেনর মাসুদ রানা,’ বলল ফ্রেনজি।

মুচকে হাসল রানা। ‘আমি জানি কি জিজ্ঞেস করবেন আপনি। আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, হ্যাঁ, আমিই রবার্ট হুইটনি। কাল প্যারেডের সময় যারা আমাকে আইডেন্টিফাই করেছে, তারা ভুল করেনি।’

অবাক হয়ে এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল ওইডো আর ফ্রেনজি। অসপিডাল ডি সান্টোর ওয়েটিং রুমে বসে আছে ওরা তিনজন। ডেতরে মৃত্যুর সাথে লড়াইয়ে সনি ওরফে জেরি। সাক্ষ জবাব দিয়েছে ডাক্তার, বাঁচানো যাবে না লোকটাকে।

লিজা ড্যালেষ্টির কাছ থেকে ফিল্ম কার্টনটা নিয়ে বাংলায় ফিরে গিয়েছিলো মাসুদ রানা। ইচ্ছে ছিল গোসল-লাঞ্ছ সেরে টনি আমাদের বাসায় যাবে। ১৬ এম. এম., প্রজেক্টর মেশিন আছে ওর, ওটায় দিয়ে দেখবে কিসের ছবি তুলেছিল সোফিয়া। টেলিফোনে এ ব্যাপারে আলাপ করেছে ও টনির সাথে। কিন্তু লাঞ্ছ বেরোবার আগেই রানার ওখানে গিয়ে হাজির এরা দু’জন।

‘আপনাকে এখনই একবার হাসপাতালে যেতে হবে আমাদের সাথে, সেনর,’ ও দরজা খুলতেই বলে উঠল লেফটেন্যান্ট

ফ্রেনজি ।

‘কেন?’

‘জেরি কারলোটি কথা বলতে চাইছে ত’
নাকি জরুরি ।’

‘কি অবস্থা ওর?’

‘খুব খারাপ,’ হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলান ওইডো । ‘মারা
যেতে পারে যে-কোন মুহূর্তে ।’

এইমাত্র হাসপাতালে পৌঁছেছে ওরা । খবর পেয়ে ভেতরে
গেছে ডাক্তার রোগীর অবস্থা জানতে ।

ওইডো জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি শিওর, জেরি-ই খুন করেছে
না সেনরিনা সোফিয়াকে?’

‘হ্যাঁ । ও নিজের মুখেই স্বীকার করেছে ।’

‘কিন্তু কেন?’

‘ওদের র্যাকেট থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল সোফিয়া ।
ভাল হয়ে যেতে চেয়েছিল । ইচ্ছে ছিল নেশা ছেড়ে দিয়ে সুস্থ
জীবনে ফিরে আসবে ।’

‘সো?’

‘আপনারা জানেন, চাইলেই যখন-তখন এ ধরনের র্যাকেট
ছাড়া যায় না । তাতে দলের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে,
ভেতরের গোপন সংবাদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে
দলত্যাগকারীর মাধ্যমে । এ জন্যেই সরিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে
পৃথিবী থেকে ।’

‘জেরি বলেছে এসব কথা আপনাকে?’ সামনে ঝুঁকে এল
ওইডো ।

‘হ্যাঁ ।’

‘কখন? কবে?’

‘তিনদিন আগে। ভেইল পাওলো ভেরোনেস-এর ভিলা প্যালেস্টায় বসে।’

এবার বিস্মিত হওয়ার পালা ফ্রেনজির। ‘মানে সারা গ্র্যানডির ওখানে? ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন আপনি?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেন?’

‘সোফিয়ার অ্যাপার্টমেন্টের ওয়ালে লেখা ফোন নাম্বারটা দেখে কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তাই খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে...।’ থেমে গেল রানা কথা শেষ না করেই।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ফ্রেনজি-ওইডো কি বলবে ভেবে না পেয়ে। ওইডো প্রথম ভাষা খুঁজে পেল। ‘আপনি কি করে ইটোলা গ্র্যানডির আস্তানার খোঁজ পেলেন? ওকে হন্যে হয়ে খুঁজেছি আমরা এতদিন, পাইনি। আপনি পেলেন কি করে?’

‘অনুমানে।’ একটা সিগারেট ধরাল রানা।

‘অনুমানটা করলেন কিসের ভিত্তিতে?’

‘যেদিন সোফিয়া খুন হয়, সেদিন ওকে,’ চোখের ইশারায় হাসপাতালের ভেতরদিকটা দেখাল রানা, ‘বেলা ভিস্টায় প্রথম দেখি আমি। হন্যে হয়ে কিছু একটা খুঁজছিল অনেকক্ষণ ধরে। জিনিসটা যা-ই হোক, খুঁজে পায়নি সে। পরে পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ার বদলে বেলা ভিস্টার পিছনে বাগানের দিকে যেতে দেখি ওকে। তখনই সন্দেহ হয়েছিল ওই ভিলাটার সাথে কোন না কোন যোগাযোগ হয়ত আছে জেরি কারলোটির। ভিলা প্যালেস্টায় গিয়ে ওর সাথে কথা বলার পর ওর ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করি। পুরোপুরি শিওর হই

তারপরই।’

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল ফ্রেনজি, ‘আপনি আসলে কে, সেনর রানা?’

‘মানে?’ সিগারেটে টান দিতে গিয়েও থেমে গেল ও।

‘জানতে চাইছি আপনার সত্যিকার পরিচয় কি?’

‘কেন, আমি...’

‘না, সেনর,’ থামিয়ে দিল সে ওকে। ‘আপনার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছি আমরা। আপনি আদৌ সাংবাদিক নন। নিউ ইয়র্ক ডিশনে চাকরি করেন না আপনি। অথচ দায়িত্ব পালন করছেন তার রোম কেরেসপণ্ডেন্টের। ইল সেনর শেরম্যান পর্যন্ত আপনার এ মিথ্যে পরিচয় সমর্থন করে গেছেন। তা-ই শুধু নয়, আপনাকে তাঁকে রিপ্রেজেন্ট করার অধিকারও দিয়ে গেছেন। কিন্তু কেন? কেন মিথ্যে পরিচয় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি?’

‘ঠিক,’ সায় দিল গুইডো মাথা দুলিয়ে। ‘আপনি যে কাজগুলো করেছেন, এতক্ষণ যা যা বললেন, তা কিছুতেই কোন সাংবাদিকের কাজ নয়।’

‘সত্য অনুসন্ধান সাংবাদিকের কাজ নয় বলতে চাইছেন?’

‘প্লীজ, সেনর,’ প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল ফ্রেনজি। ‘নিউ ইয়র্ক ডিশনের নিউজ এডিটরের সাথে এবং আরও অনেক সিনিয়র সাংবাদিকের সাথে আমি নিজে কথা বলেছি টেলিফোনে। কেউ চেনে না আপনাকে, আপনার নাম পর্যন্ত শোনেনি তারা কেউ।’

চুপ করে ধোঁয়া গিলতে লাগল রানা। বোঝা গেছে, ধরা পড়ে গেছে ও। অতএব, এখন সত্য বলা ছাড়া উপায় নেই।

আবার বলল অফিসার, ‘প্লীজ, সেনর। গ্র্যানডিকে ধরিয়ে দিয়ে
তিষ্ঠ অবকাশ-২

যে উপকার করলেন আপনি, সে জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু আমাদের চোখে এখনও আপনি একজন হত্যাকারী। জেরি আপনাকে কি বলেছে, তার ওপর ভিত্তি করে বিচারের রায় নির্ধারিত হবে না, এ কথাটা নিশ্চই জানা আছে আপনার। আমরা আসলে আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি, সেনর। সব কথা খুলে বললে আমাদের দু'পক্ষেরই লাভ। অনেক ঝুট ঝামেলা এড়ানো যাবে।’

‘বেশ, বলছি।’ শুরু করল রানা। লারসেনের অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে কিভাবে এর সাথে জড়িয়ে গেছে ও আষ্টেপৃষ্ঠে, পুরো খুলে বলল। শুনতে শুনতে হাঁ হয়ে গেল ফ্রেনজি-গুইডো।

‘কিন্তু চেনা নেই জানা নেই এরকম একটা কাজের পুরো দায়িত্ব আপনার ওপর কেন ছেড়ে দিলেন ইল সেনর শেরম্যান?’ জিজ্ঞেস করল গুইডো। ‘আপনি সেনর লারসেনের বন্ধু বলেই? তাঁকে রিপ্রেজেন্ট করার আর কেউ কি ছিল না?’

‘উনি আমাকে চিনতেন।’

‘চিনতেন? তবে যে বললেন...’

‘নামে চিনতেন আর কি। আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম জানা ছিল মিস্টার শেরম্যানের।’

‘সেনর রানা,’ চাপা বিরক্তি প্রকাশ পেল ফ্রেনজির কণ্ঠে। ‘এইমাত্র বললেন এক মাসের ছুটিতে ছিলেন আপনি। আবার এখন বলছেন আপনি ব্যবসা করেন?’

‘দুটোই করি আসলে।’

‘কিসের ব্যবসা আপনার, জানতে পারি?’ তিক্ত গলায় বলল সে।

‘অনেকটা আপনাদেরই মত ।’

‘মানে?’

‘গোয়েন্দাগিরি ।’

‘প্রাইভেট আই? কি নাম আপনার অর্গানাইজেশনের?’

‘রানা এজেন্সির নাম শুনেছেন?’

কিছু না ভেবেই বলে উঠল ওইডো, ‘হ্যাঁ, শুনব না কেন? অনেক বড় ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম । সারা পৃথিবীতে শাখা আছে । এখানেও আছে । মোনিকা আলবিনো এখানকার শাখা প্রধান । খুব ভাল পরিচয় আছে ওর সাথে । কিন্তু কেন? এর সাথে কি সম্পর্ক আপনার ফার্মের?’

উত্তরটা তক্ষুণি দিল না রানা । আরেকটা সিগারেট ধরাল ধীরেসুস্থে । আসলে হাসি চাপতে কষ্ট হচ্ছে ওর, তাই মুখটাকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে । ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে ফ্রেনজির মুখের দিকে তাকাল এক পলক । চোখ কুঁচকে ওর দিকেই চেয়ে আছে লোকটা । মনে হল কি এক জরুরি হিসেব মেলাতে ব্যস্ত ।

‘কই, বললেন না?’

উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা । ওপাশের একটা খোলা জানালার সামনে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেণ্ড । তারপর ঘুরে দাঁড়াল । ওর ডরাট, গম্ভীর গলা গম গম করে উঠল ছোট্ট ওয়েটিং রুমটার দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ।

‘মাসুদ রানা,’ বলল ও । ‘এবং রানা এজেন্সি । দুটো নাম কি কিছু মীন করে বলে মনে হয় আপনাদের, অফিসার?’

‘মানে...’ ড্যাভাচ্যাকা খেয়ে গেল দুজনেই । ‘তার মানে,’ কোন রকমে বলল ওইডো । ‘আপনি...মানে...’ দরজায় টোকার আওয়াজ

উঠতে থেমে গেল সে।

অ্যাপ্রন পরা টাক মাথার এক ডাক্তার উঁকি দিল ভেতরে।
'আপনারা এবার আসতে পারেন, অফিসার।' রানার ওপর চোখ
গেল তার। 'আপনিই সেনর মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল ও। সিগারেটটা ফেলে দিল জানালা দিয়ে।

'তাড়াতাড়ি আসুন, প্রীজ।'

ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে পাঁচ কদম যেতেই বাঁ দিকে ডবল
বেডের একটা কেবিন। দরজার বাইরে দু'জন সশস্ত্র পুলিশ গার্ড,
দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। ডাক্তারকে অনুসরণ করে ওটায় ঢুকল
এসে ওরা। সেই থেকে পলকহীন চোখে রানাকে দেখছে কেবল
দুই অফিসার। চোখ সরাচ্ছে না মুহূর্তের জন্যেও।

পুরু গদিওয়ালা একটা বেডে শুয়ে আছে জেরি কারলোটি।
বুক পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। এরই মধ্যে আশ্চর্যরকম ফ্যাকাসে
হয়ে গেছে ওর মুখটা, মনে হয় এক বিন্দু রক্তও নেই শরীরে।
বেডের মাথার দিকের একটা স্ট্যাণ্ডে ঝুলছে ব্লাড ব্যাগ—রক্ত দেয়া
হচ্ছে তাকে।

'হ্যালো, ফ্রেণ্ড,' আধবোজা চোখে রানার দিকে তাকিয়ে একটু
হাসির ভঙ্গি করল জেরি। কথা বলার সময় ঘড় ঘড় করছে বুকের
মধ্যে। খুব সম্ভব রক্ত বা কফ আটকে গেছে ভোকাল কর্ডে।
'তোমার জন্যেই...অপেক্ষা করছি আমি।'

লোকটির মাথার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। মৃত্যুপথযাত্রীর
ওপর কোন রাগ নেই ওর। 'বল,' মৃদু গলায় বলল।

'এই দু'জনকে আগে বিদেয় কর, প্রীজ। তোমার সাথে একা
কথা বলতে চাই আমি।'

‘কিন্তু...,’ আমতা আমতা করতে লাগল ফ্রেনজি। ‘আমরা থাকলে অসুবিধে কি?’

‘আছে, অসুবিধে আছে। যদি জানতে চাও কি ভাবে মৃত্যু হয়েছে সোফিয়ার, তাহলে দয়া করে পাঁচ মিনিট এর সঙ্গে কথা বলতে দাও আমাকে। এরপর তোমাদের ডাকব আমি। যাও যাও, দেরি কোরো না। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে।’ কথা শেষ করে ভীষণভাবে হাঁপাতে লাগল জেরি। মুখের দুই কষা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল খানিকটা গ্যাজলা। হাতে ধরা একটা ফেসিয়াল টিস্যু দিয়ে নিজেই সেটা মুছে নিল জেরি।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল দুই গোয়েন্দা। তারপর পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল। ডাক্তারও গেল তাদের সঙ্গে। বাইরে থেকে টেনে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা।

রানার একটা হাত মুঠো করে ধরল জেরি। ‘তোমার সহ্যশক্তি খুব বেশি, সেনর। প্রায় ভালই বেসে ফেলেছিলাম তোমাকে। শুধু যদি...সে থাক, আমার মৃত্যুর পর সোফিয়াকে হত্যা করার ব্যাপারে পুলিশ যাতে তোমাকে টানাহ্যাঁচড়া করতে না পারে, সে ব্যবস্থা করে যাব আমি। বিনিময়ে তুমি কি আমার একটা উপকার করবে?’

‘সম্ভব হলে করব। বল, কি করতে হবে।’

‘ওই ফিল্মটা পুড়িয়ে ফেলো।’ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল জেরি হঠাৎ করে। কয়েক সেকেন্ড দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে পড়ে থাকল মড়ার মত। তারপর তাকাল। ‘যদি কথা দাও কাজটা করবে, শান্তিতে মরতে পারব, ফ্রেন্ড। আমার নিজের জন্যে নয়, যাকে সারাজীবনের জন্যে কাঁদিয়ে রেখে গেলাম, তার জন্যে এই ভিত্তি অবকাশ-২

ভিক্টরকু আমাকে দাও, সেনর । তুমি ছাড়া আর কেউ যদি ওই ফিল্ম দেখে, মান-সম্মান কিছু থাকবে না তার । আমার মত এক গুণাকে ভালবাসার অপরাধে সবাই ওর মুখে থু থু দেবে । আমি জানি সোফিয়ার মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছ তুমি । কিন্তু তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আরেকটা জীবন নষ্ট করে দিয়ো না জেনেশুনে । তাতে সোফিয়া ফিরে আসবে না ।’

‘বেশ । তবে এখনই কথা দিতে পারছি না । আগে দেখতে হবে ওতে সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে...’

অধৈর্যের মত মাথা নাড়ল জেরি । ‘নেই নেই, ওসব কিছু নেই । তাছাড়া আমি পুলিশকে স্টেটমেন্ট দেব এখনই । জানিয়ে যাব যে আমিই খুন করেছি ওকে । এরপর আর কি থাকে, বল? তুমি একা দেখো ফিল্মটা । তারপর নষ্ট করে ফেলো । পুড়িয়ে ফেলো । আর কারও হাতে যেন না পড়ে ।’

‘ঠিক আছে । যদি দেখি যে ওটা কোন এভিডেন্স নয়, তাহলে তোমার অনুরোধ রাখব আমি ।’

‘ওয়াদা?’

‘ওয়াদা । তবে শর্ত থাকল, এভিডেন্স না হলে, ওকে?’

ফ্যাকাসে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেরির । বহু কষ্টে একটু হাসি ফোটাল সে শুকনো ঠোঁটে । ‘থ্যাঙ্ক ইউ, ফ্রেণ্ড । যাও, এবার ওদের পাঠিয়ে দাও ।’

ওর হাতটায় সামান্য একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল মাসুদ রানা ।
‘ওড বাই, জেরি ।’

‘ওড বাই, ফ্রেণ্ড ।’

রানা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল গিয়ে ওইডো-

ফ্রেনজি। তাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে বসে তিনটে সিগারেট ধ্বংস করল রানা। তিনটে বাজতে চলল, এখনও খাওয়া হয়নি। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট।

চল্লিশ মিনিট পর বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। মাসুদ রানার অপলক চাউনির জবাব দিল ফ্রেনজি মাথা দুলিয়ে। বিষণ্ণ গলায় বলল, 'মারা গেছে। এইমাত্র।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। কার জন্যে এত উদ্বেগ ছিল জেরি কারলোটির? মৃত্যুর আগমুহূর্তেও যার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছে সে, কে সে? কে হতে পারে? পকেটের ফিল্ম কার্টনটা হাত দিয়ে স্পর্শ করল রানা বাইরে থেকে।

ছবি তোমার হাত ভালই ছিল সোফিয়ার, পর্দায় ছবি ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হল মাসুদ রানাকে। মেয়েটি জানত, কিভাবে তুলতে হয় ছবি। প্রথমেই দেখা গেল সাগর—বে অভ সরেনটো। আন্তে আন্তে ঘুরতে লাগল ক্যামেরা, ভেসে উঠল পাহাড়ের গায়ে ঝোলানো প্রকাণ্ড এক ভিলা।

দেখামাত্রই চিনল রানা, ইটোলা গ্র্যান্ডির হাইড-আউট। এবার জুম করল ক্যামেরা—অনেক কাছে নিয়ে আসা হয়েছে ভিলাটা, পেইলারড বোলেক্সের শক্তিশালী টেলিফোটো লেন্সের কল্যাণে দারুণ এসেছে ছবি। সেই রঙ-চঙে ছাতাটার নিচে বসে আছে গ্র্যান্ডি প্রকাণ্ড ভুঁড়ি ভাসিয়ে। সারা শরীর লালচে রোমে ডরা। দেখলেই বমি আসে। তার মুখোমুখি বসে আছে জেরি কারলোটি। আলাপে ব্যস্ত। সামনে ঝুঁকে বসল মাসুদ রানা। সব ভুলে ফিল্ম দেখছে। অতি মনোযোগের ফলে দু'ঠোঁট সামান্য তিক্ত অবকাশ—২

ফাঁক হয়ে আছে। টিপ্ টিপ্ করছে বুকের মধ্যে। শুকিয়ে উঠেছে গলা।

এক সেকেণ্ড পরই ওদের সঙ্গে যোগ দিল এসে সারা গ্র্যানডি। দেখামাত্রই বুঝল রানা। এই ছবি তোলার সময় যেভাবেই হোক দূর থেকে সোফিয়াকে দেখে ফেলেছিল জেরি। এ ধরনের রেকর্ড যাতে না থাকে, সে কারণেই ছুটে এসেছিল, ক্যামেরাটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে সজোরে লাথি মেরে বসে সোফিয়ার তলপেটে, এবং পাহাড় থেকে ছিটকে পড়ে মারা যায় মেয়েটি।

ওকে যাতে গ্র্যানডি র্যাকেট থেকে বেরিয়ে আসতে দিতে বাধ্য হয়, সে-জন্যেই সম্ভবত এ ছবি তোলে সোফিয়া। হয়ত এর ভয় দেখিয়ে নিজের সরে আসার পথ পরিষ্কার করতে চেয়েছিল সে। সোজা কথায় রাজি না হলে এই ছবি ফাঁস করে দেবার ভয় দেখাত, হয়ত। তখন একটা সমঝোতায় আসতে বাধ্য হত ইটোলা গ্র্যানডি।

পরের দৃশ্যটা চোখে পড়ামাত্র জেরি কারলোড্রির উদ্বেগের কারণটা জানা হয়ে গেল মাসুদ রানার। এটাও ওই বাংলোর-ই পিছনদিকের ছবি। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে জেরি, সাগর দেখছে আনমনে। একসময় ঘুরল সে। ক্যামেরার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। হাসি মুখে চেয়ে আছে ক্যামেরার সামান্য বাঁ দিকে।

প্যান করল ক্যামেরা। বাগানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক যুবতী। দূর থেকে হাত নাড়ল সে জেরির উদ্দেশে। হাসি ঝিলিক মেরে উঠল লোকটির মুখে, পাগলের মত মেয়েটির দিকে ছুটে গেল সে। জড়িয়ে ধরল তারা পরস্পরকে, চুমু খাচ্ছে একে অপরকে, ঝামাঝামির লক্ষণ নেই। পুরো ফিল্মের অর্ধেকটাই এই

দুই যুগলের চুমোচুমিতে ভরা ।

মেয়েটিকে চেনামাত্র মাথায় বাজ পড়ল রানার । নিজের দু'চোখকে বিশ্বাস করতে ভরসা হল না । মেয়েটি আর কেউ নয়—
প্যামেলা শেরম্যান, ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের চতুর্থ স্ত্রী । ছবি শেষ হওয়ার দু'সেকেণ্ড আগে ঝট করে এদিকে তাকাল জেরি কারলোডি । সরাসরি ক্যামেরার দিকে । একভাবে চেয়ে আছে সে, এই সময় শেষ হয়ে গেল ছবি ।

তার মানে গ্র্যানডি জেরি এবং সারার ছবি তোলার সময় নয়, শেষের এইটুকু তোলার সময় ধরা পড়ে যায় সোফিয়া । পুরো ছবিটা কি একই দিন তোলা হয়েছিল । হবে হয়ত । পরক্ষণেই আরেকটা জরুরি প্রশ্ন মনে জাগল রানার । ধরাই যদি পড়ে থাকে সোফিয়া, জেরি ছুটে এসে যদি ফিল্মটুকু ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তা রোমের ফটোল্যাবে গেল কি করে?

একটু চিন্তা করতেই উত্তরটা মিলে গেল । জেরি দেখে ফেলেছিল সোফিয়াকে ছবি তুলতে, তা ঠিক । ধাওয়া করে এসেছিল ফিল্ম কেড়ে নিতে, তা-ও ঠিক । কিন্তু আসলে ফিল্মটা পায়নি সে । বিপদ টের পেয়ে সোফিয়া নিজেই সেরেছে কাজটা, ব্যস্তহাতে ছিঁড়ে বের করে নেয় ব্যবহৃত বারো ফুট ফিল্ম ।

এরপর তাড়াহড়োর মধ্যে ওটা খামে পুরে ফরোয়ার্ডিং অ্যাড্রেসসহ মেইল করে দিয়েছিল সেই ল্যাবের নামে । এ জন্যে দূরে যেতে হয়নি সোফিয়াকে । বেলা ভিসটায় ঢোকার মুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ডাক বাক্স, ওটার ভেতর ফেলে দিয়েছে সে খামটা । ওকে হত্যা করার পর ক্যামেরায় এক্সপোজড ফিল্মটুকু না পেয়ে নিশ্চয়ই বোকা বনে গিয়েছিল জেরি ।

ওটার আশায় চষে বেড়িয়েছে পুরো বেলা ভিসটা এবং সোফিয়ার গাড়ির ভেতরটা। অথচ ওই সময় তার মাত্র কয়েক হাত দূরে মেইল বক্সের পেটের মধ্যে নিশ্চিন্তে শুয়ে ছিল প্যাকেটটা। পরদিন পোস্টম্যান এসে নিয়ে গেছে বাক্স খুলে।

প্রজেক্টর থেকে ফিল্মটা বের করে নিল রানা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে আর কাউকে জানাবে না এটার ব্যাপারে। ঠিকই বলেছে জেরি, এটা দেখে কারও কিছু লাভ হবে না। মাঝখান থেকে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে প্যামেলার। সামাজিক মর্যাদা বলে কিছু তো থাকবেই না, শেষ পর্যন্ত হয়ত বিয়েটাই ভেঙে যাবে। হয়ত কেন, অবশ্যই যাবে। নিজের একমাত্র সন্তানের হত্যাকারী মানুষ-টির প্রেমিকা তারই স্ত্রী, এ সহ্য করবে না কেউ।

জেরি কারলোটির মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। অমন এক নির্দয় পশুর অন্তরেও থাকতে পারে কারও জন্যে গভীর প্রেম, মৃত্যুর আগমুহূর্তেও প্রেমাস্পদের ভবিষ্যৎ চিন্তা তার মত কোন দয়ামায়াহীন খুনীর মন জুড়ে থাকতে পারে, ভাবতে বড্ড অবাক লাগছে ওর।

সতের

খবর পেয়ে চার্টার্ড প্লেনে ওইদিনই সন্দের পর রোম পৌঁছুলেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান এবং তাঁর স্ত্রী প্যামেলা শেরম্যান। মুখ শুকিয়ে

আমসি হয়ে গেছে মেয়েটির। রোগা রোগা লাগছে। এ কয়দিনে নির্ধাত ছয়-সাত পাউণ্ড ওজন হারিয়েছে বেচারি দুশ্চিন্তায়।

মাসুদ রানা, লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি এবং গুইডো রিসিভ করল তাদের বিমান বন্দরে। নীরবে ওদের সাথে হাত মেলালেন শেরম্যান, ভীষণ রকম গম্ভীর। প্রায় বিনা বাক্যব্যয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পৌছল ওরা। আগেই সুইট বুক করে রেখেছিল রানা।

হোটেলের লবিতে থা রেখে অফিসার দুজনের উদ্দেশে বললেন ভদ্রলোক, 'রানার সাথে কিছু আলাপ আছে আমার, উড ইউ মাইণ্ড?'

'অফকোর্স নট, সেনর,' বলল ফ্রেনজি।

'গ্রেট।'

প্যামেলা এবং তাদের দুজনকে ড্রাইংরুমে অপেক্ষা করতে বলে রানাকে নিয়ে লিভিং রুমে এসে বসলেন শেরম্যান। একটা চুরুট ধরিয়ে টানতে লাগলেন আনমনে। ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই চেহারায়। 'বল, রানা, প্লীজ। সবটুকু শুনতে চাই আমি।'

কথার মাঝে একবারও ওকে বাধা দিলেন না শেরম্যান, কোন প্রশ্নও করলেন না। চুরুট দাঁতে কামড়ে ধরে একভাবে চেয়ে থাকলেন কেবল। চেহারায় কোন অভিব্যক্তি নেই। বক্তব্য শেষ হতে কোটের ভেতরের পকেট থেকে গুইসেপ ম্যালেট্রির তৈরি করা রিপোর্টটা বের করল রানা। আগেই অবশ্য ওর কয়েক জায়গায় কারিগরি ফলিয়েছে ও।

একসঙ্গে ছবি দেখতে যাওয়া বা লাঞ্চ-ডিনার ছাড়া ওদের মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, তেমন কোন প্রমাণ নেই এখন তিফ অবকাশ-২

এ রিপোর্টে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে রিপোর্টটা পড়লেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। সবশেষে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরিয়ে দিলেন কাগজগুলো রানার হাতে।

‘পুরো ব্যাপারটা এখনও অকল্পনীয় লাগছে আমার, রানা,’ বললেন তিনি। ‘এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না আমার মেয়ে এতসব কাণ্ড ঘটাতে পারে। হয়ত এরকম দুঃখজনক মৃত্যুই পাওনা হয়েছিল ওর, কে জানে।’

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

‘কাল সকালে নেপলস যাচ্ছি আমি, একা,’ আবার বললেন শেরম্যান। ‘তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। অনেক করেছে তুমি। করোনারের সঙ্গে কথা বলব প্রথমে, ওখান থেকে বেরিয়ে পুলিশ চীফের সঙ্গেও কথা বলতে হবে।’

‘আপনার স্ত্রী?’

‘এখানেই থাকবে ও।’

পরদিন দশটার দিকে হোটেল ইন্টারকনে এল মাসুদ রানা। রিসেপশন ডেস্ক থেকে ফোনে প্যামেলা শেরম্যানের সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে উঠে এল ওপরে। নক করতে নিজেই দরজা খুলে দিল মেয়েটি। ‘কাম ইন, প্রীজ,’ ক্লান্ত স্বরে বলল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল রানা। আরও শুকিয়ে গেছে সুন্দর মুখটা। চোখের নিচে হালকা কালির প্রলেপ। খাড়া নাকের ডগাটা লাল হয়ে আছে—কাঁদছিল সস্তবত।

‘ওড মর্নিং,’ ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল প্যামেলা। ‘বসুন। আমার কাছে আপনার কি

বিশেষ কোন কাজ আছে?’

‘জানেন বোধহয়, সোফিয়ার হত্যাকারীকে সনাক্ত করা হয়েছে?’

‘জানি,’ কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল প্যামেলা। ‘পুলিসের গুলিতে মারা গেছে সে। কিন্তু আমাকে কেন এ সব শোনাতে এসেছেন, মিস্টার রানা?’

‘মাফ করবেন। আমি আসলে দুয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে এসেছি। আপনি ছাড়া উত্তরগুলো আর কারও জানা নেই।’

‘বুঝলাম না।’ হাতব্যাগ খুলে সিগারেট বের করল মেয়েটি। ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিতে লাগল।

‘আপনি জানতেন আমিই রবার্ট হুইটনি, অথচ তারপরও আপনার স্বামীকে খবরটা জানাননি। কেন?’

‘উত্তরটা খুব সহজ। তাকে জানাবার কোন আগ্রহ ছিল না আমার।’

‘কিন্তু গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন কেন তাহলে সোফিয়ার পিছনে?’

মুখটা কঠোর হয়ে উঠল প্যামেলার। চট করে উঠে দাঁড়াল সে। খোলা জানালার পাশে গিয়ে নিচের রাজপথ দেখতে লাগল। ‘ওটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, মিস্টার রানা,’ বলল সে। ‘আপনি দুর্ভাগ্যবশত জড়িয়ে গেছেন।’

পকেট থেকে ফিল্ম কার্টনটা বের করল এবার মাসুদ রানা। ‘এটা নিশ্চই নষ্ট করে ফেলতে চাইবেন আপনি।’

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল প্যামেলা। চোখ কুঁচকে চেয়ে থাকল ওর বাড়ানো হাতের দিকে। ‘কি ওটা?’

‘বার ফুট এক্সপোজড ফিল্ম । সোফিয়ার ক্যামেরা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল ওকে যেদিন হত্যা করা হয়, সেদিন ।’

পলকে ধপধপে সাদা হয়ে গেল মেয়েটির চেহারা । এক ফোঁটা রক্তও নেই । নাকের ফুটো ঘন ঘন স্ফীত হতে লাগল । ‘কোথায় পেলেন আপনি ওটা?’

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, ‘ওকে যেদিন হত্যা করা হয়, সেদিন আপনিও ছিলেন ইটোলা গ্র্যান্ডির ভিলায়, ঠিক?’

চুপ করে থাকল প্যামেলা ।

‘আপনিও ড্রাগ অ্যাডিক্ট?’ পলকহীন চোখে চেয়ে আছে রানা ।

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি । ‘না!’

‘আই সী ।’

‘ওটা...ফিল্মটা দেখেছেন আপনি?’ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল প্যামেলা । ঢোক গিলল একটা ।

‘হ্যাঁ ।’

‘ও । ওটা নিশ্চই আমার স্বামীর হাতে তুলে দেবেন?’

হাতটা আরেকটু এগিয়ে দিল মাসুদ রানা । ‘নির্ন । এটা ধ্বংস করতে হলে কিছুটা কষ্ট করতে হবে আপনাকে । সহজে পোড়ে না এ জিনিস । সবচে’ ভাল হয় যদি কুচি কুচি করে কেটে কমোডে ফেলে ফ্লাশ করে দেন ।’

রানার চোখে চোখ রেখে জিনিসটা নিল প্যামেলা । তারপর দম ছাড়ল সশব্দে । ‘ধন্যবাদ । অসংখ্য ধন্যবাদ । আপনার কাছে চিরঋণী থাকব আমি, মিস্টার মাসুদ রানা ।’

‘দ্যাট’স অল রাইট ।’

বসল আবার প্যামেলা । এবার খানিকটা সুস্থির লাগছে তাকে ।

‘আপনি এখন জানেন, জেরি কারলোটিকে ভালবাসতাম আমি, তাই না?’

‘জানি।’

‘জেরি কারলোটি ছিল সাংঘাতিক রকম জেদি, রগচটা মানুষ। ভাল ব্যবহার করতে জানত না. কারও সাথেই। সেদিক থেকে আমিই একমাত্র ব্যতিক্রম। পৃথিবীতে একমাত্র আমিই ভাল ব্যবহার পেয়েছি লোকটার কাছ থেকে। নিউ ইয়র্কের পাম গ্রোভ নাইট ক্লাবের সিঙ্গার ছিলাম আমি, ওখানেই কারলোটির সাথে পরিচয়। যাকে বলে প্রথম দর্শনেই একে অন্যের প্রেমে পড়ে যাই আমরা। শুনে আপনার হাসি আসতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, কারলোটিকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসতাম আমি।’

‘এসব এখন থাক, মিসেস শেরম্যান। আমি...’

‘না, শুনুন। এই সময় আলবার্তো ফেলিনির সাথে গোলমাল বাধে ইটোলা গ্র্যান্ডির, নিশ্চই জানা আছে আপনার। ক’দিন পর পুলিশের ভয়ে আমেরিকা ছেড়ে ইটালিতে পালিয়ে যায় গ্র্যান্ডি। কারলোটি ছিল তার গানম্যান বা লেফটেন্যান্ট, হোয়াট এভার ইউ সে। সে-ও ওর সাথে চলে আসে। কারলোটিকে হারিয়ে চোখে আঁধার দেখছিলাম আমি, এমন সময় শুনলাম ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান আমার প্রেমে পড়েছে। কিছু না ভেবেই তার বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। বিয়ে হয়ে গেল আমাদের। আসলে, সস্তা হোটেলে গান গাইতে গাইতে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল আমার। এত পয়সাওয়ালা লোকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবার কথা একবারও মনে হয়নি। হোক সে বুড়ো। তাছাড়া পাম গ্রোভ নাইট ক্লাব ছাড়তে পারব এটাও ছিল বড় একটা কারণ। কারলোটির সাথে ওখানেই

পরিচয় এবং প্রেম আমার। শেষ বিদেয়টাও ওখান থেকেই নেয়
সে। ওর অভাব ভুলতে পারতাম না কিছুতেই। রোজ স্টেজে উঠে
অভ্যাসবশে দর্শকদের ভেতর ওকে খুঁজতাম আমি। না পেয়ে
কাঁদতাম, গলা বুজে আসত। ঠিকমত গান গাইতে পারতাম না।’

একটু থামল প্যামেলা। স্মৃতি ঘাঁটতে গিয়ে চোখে পানি এসে
গেছে। আলতো করে চোখ মুছল সে।

‘এর কিছুদিন পর গোপনে নিউ ইয়র্ক যায় কারলোটি,
ফেলিনিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। বোধহয় এরমধ্যে জেনে
গেছেন ফেলিনির বান্ধবী ছিল সোফিয়া?’

মাথা দোলাল রানা ইতিবাচক ভঙ্গিতে।

‘কারলোটির জানা ছিল এ খবর, কারণ, ওর সাথেও সোফিয়ার
সম্পর্ক ছিল অনেক আগে থেকে। আরও জানত, সোফিয়া ড্রাগ-
অ্যাডিক্ট। ইটালি থেকেই অন্য লোকের মাধ্যমে সোফিয়াকে হাত
করে কারলোটি। মাত্র দু’হাজার ডলারের বিনিময়ে রাজি হয় সে
ফেলিনিকে হত্যার ব্যাপারে তাকে সহায়তা করতে।’ কাঁধ ঝাঁকাল
প্যামেলা। ‘পরের ঘটনা সারা পৃথিবী জানে।

‘কারলোটি নিউ ইয়র্ক গিয়েই আমার সাথে যোগাযোগ করে।
আগেই বলেছি, আমরা দু’জনেই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম দু’জনের
প্রেমে। যে কয়দিন ওখানে ছিল সে, সে কয়দিন অবাধে
মেলামেশা করি আমরা। ওই সময় কি ভাবে যেন সোফিয়ার
নজরে পড়ে যাই, আমাদের দু’জনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি তুলে
ফেলে মেয়েটা। বাস্, এরপর থেকে নিয়মিত ব্ল্যাকমেইল করতে
শুরু করে সে আমাকে। একদিন, দু’দিন পরপরই দু’শো তিনশো
ডলার করে আদায় করতে থাকে বাপকে ছবি দেখাবার ভয়

দেখিয়ে। সোফিয়াকে অনেক বুঝিয়েছি আমি, মিস্টার রানা। কিছুতেই পথে আনতে পারিনি। রোম আসার পরও তিন দফায় মোট ছয় হাজার ডলার দিতে হয়েছে ওকে আমার। গোপনে ওর দাবি মিটিয়ে গেছি আমি, কাউকে জানতে দিইনি। আমার কাছে না থাকলে ওর বাবার পকেট থেকে চুরি করেছি টাকা।

‘আমি খুব গরীব ঘরের মেয়ে, মিস্টার রানা। সোফিয়া বাপকে ওই ছবি দেখালে শেরম্যান হয়ত আমাকে ডিভোর্স করবে, এই ভয়ে ওর কথা মানতে বাধ্য হয়েছি আমি। আমি জানি দারিদ্র্য কি জিনিস। নিজের এই অভাবিত সৌভাগ্য, শেরম্যানের সঙ্গে আমার বিয়ে, চারদিকে প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি, এসব যে-কোন মুহূর্তে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে ভেবে ভয়ে সারাক্ষণ সিঁটিয়ে থাকতাম।’

‘অত বিস্তারিত বলার দরকার নেই, মিসেস শেরম্যান,’ নরম গলায় বলল মাসুদ রানা। ‘শুধু বলুন, সোফিয়া মারা গেল কি ভাবে?’

‘দুঃখিত। এ ব্যাপারে বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানি না। কারলোটির মুখে শুনেছিলাম, ইটোলা গ্র্যান্ডির ড্রাগ রিঙের সাথে জড়িত ছিল ও। সম্ভবত নিজেদের মধ্যে কোন গোলমাল ছিল... ঠিক জানি না। ক্লিফ হেড থেকে আমাদের ছবি তুলছিল ও, ব্যাপারটা চোখে পড়ে যায় কারলোটির। তক্ষুণি ঘটনাটা গ্র্যানডিকে জানায় সে। এরপর গ্র্যানডিই নির্দেশ দেয় সোফিয়াকে হত্যা করার। ওখানেই ছিলাম আমি তখন, গ্র্যানডিকে অনুরোধ করেছিলাম আদেশটা ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু কাজ হয়নি। গ্র্যানডির জানা ছিল সোফিয়ার চরিত্র। ভেবেছিল এই ছবি দেখিয়ে তাকেও

ব্ল্যাকমেইল করবে সে। কাজেই...।’

‘সোফিয়াকে হত্যা করার পর তার ক্যামেরার ফিল্মটুকু বের করে নিয়েছিল কারলোটি, তাই না?’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল প্যামেলা। ‘ঠিক বলতে পারছি না। আমি তখন ওখানে ছিলাম না।’

‘আই. আই. এ.-কে সোফিয়ার পিছনে কেন লাগিয়েছিলেন?’

‘ভেবেছিলাম ওর অন্ত্র ওর-ই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে নিজেকে বাঁচাব। সোফিয়ার মৃত্যুর পর তার ভিলায় গিয়েছিল কারলোটি। ওর সুটকেসের মধ্যে আমাদের দু’জনের সেই ছবিগুলো ছিল—মোট চারটে ছবি। পুড়িয়ে ফেলেছি আমি সব। বিশ্বাস করুন, মিস্টার রানা, সোফিয়ার এই পরিণতির জন্যে আমি মোটেই দায়ী নই।’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। তারপর বলল, ‘আমি বিশ্বাস করি, মিসেস শেরম্যান।’

‘তবে একটা ব্যাপার, শেষের চার-পাঁচদিন সোফিয়া আমার কাছে কোন টাকা-পয়সা দাবি করেনি। পরে ভেবেছি আমি ব্যাপারটা নিয়ে। আমার কাছে আশ্চর্য-ই মনে হয়েছে। কারণ এক কি দু’দিন পর পরই টাকা চাইত ও। কিন্তু শেষের দিকে কেন যে এতদিন বিরতি দিল, জানি না।’

আমি জানি, মনে মনে বলল মাসুদ রানা, আমি জানি কেন। উঠল ও। ‘সব খুলে বলার জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিসেস শেরম্যান। এখনই ধংস করে ফেলুন ওটা,’ চোখ ইশারায় তার হাতে ধরা কার্টনটা দেখাল রানা। ‘আর...জেরি কারলোটির পরিণতির জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত।’

দেখতে দেখতে পানিতে ঝাপসা হয়ে গেল প্যামেলার সুন্দর দু'চোখ। বিকৃত হয়ে উঠছে ফ্যাকাসে মুখটা। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'ধন্যবাদ,' কান্না জড়ানো গলায় বলল। 'আমার দুর্ভাগ্য, কারলোটি-ই একমাত্র পুরুষ আমার জীবনে, যাকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম। এখন তার প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওর অভাব বয়ে বেড়াবার যন্ত্রণা তাই আমাকেই সহ্যেতে হবে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল মাসুদ রানা। দু'চোখের কোণ শির শির করছে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ও ঘর থেকে। নিঃশব্দে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

ঃশেষঃ